[ইতোবৃত্ত ও দিক্ সমীক্ষা, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ সমীক্ষা]

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর। (অধ্যাপক এশিয়াটিক সোসাইটি)

কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, বেদান্ত, সাংখ্য তীর্থ, প্রাক্তন অধ্যাপক জে. বি, রায় ষ্টেট

আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

প্রাক্তন অধ্যাপক গোবিন্দসুন্দরী ষ্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

কলিকাতা

প্রাচী পাবলিকেশনস্

প্রাচী পাবলিকেশনস্
এইচ. রায়চৌধুরী
৩/৪, হেয়ার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১

Sri Krishna das Kaviraj &
Sri Chaitanya Charitamrita
Sri Nityananda
By
Sri Krishna Chaitanya Thakur

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

মুদ্রাকর—
শ্রীব্রজলাল চক্রবর্ত্তী
মহামায়া প্রেস
৩০।৬।১ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

ভারতবরেণ্য প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষপ্রবর বৈষ্ণবগুরু
শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের করকমলে—

বাবা !

সাড়ে আট বছর বয়সের পর থেকে আপনার কাছেই রেখেছিলেন সুদীর্ঘ দিন, তার সঙ্গে নিয়ে সারা ভারতের কত পবিত্র স্থানে ঘুরিয়েছেন, কত বন্দনীয় পুরুষের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য দান ক'রেছেন। তারপর উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করার পূর্ণ সুযোগ ক'রে দিয়েছেন। তারপর আপনারই বিশাল জীবনকথা (চরিত মাধুরী) সঞ্চয় করিয়েছেন—সবই আজ জাগ্রত স্মৃতি। এ গ্রন্থ রচনারও উপাদান যা, সবই আপনার সঙ্গে সেই নিভৃত আলাপের দিন গুলিতে প্রশ্নোত্তরের স্মৃতিতে লেখা।

পুনশ্চ, আপনি ভাগবতোত্তম পুরুষ, কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা ক'রলে আপনার মৌন বঙ্কিম দৃষ্টিপাত আমাকে সংশয়িত করেও উদ্বুদ্ধ ক'রেছে।

সেই প্রেরণা-উদ্বোধনে লেখা এই সন্দর্ভটীর বক্তব্যগুলি আপনি গ্রহণ করুন। এতে প্রকাশিত আমার বক্তব্য বিষয় নিয়ে বাংলার তথা ভারতের প্রথিতযশা মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে বহু ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্য সহ উৎসাহদীপক ও মন্তব্যপূর্ণ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। তাঁরা জানিয়েছেন ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের অমূল্য অবদান "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থটিতে যেসব মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্যরাজির সমাবেশ, তাদের কয়েকটি দিকের আলোচনা অদ্যাবধি আংশিক মাত্রই হ'য়ে আসছে; বাকী অংশগুলির মধ্যে "রায়-রামানন্দ-সংবাদ" প্রসঙ্গটিও আলোচ্য হওয়ার প্রয়োজন। এই গ্রন্থে সেই তত্ত্বটির মৌলিক উপাদান নিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাছাড়া শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্র নিয়ে আলোচনাটিও আপনার হাতে সমর্পণ করছি।

দু' বছরের মধ্যে এ সন্দর্ভের বক্তব্য নিয়ে বাংলার বহু সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে, কলকাতা এবং নবদ্বীপ, নীলাচল, বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় শিক্ষা দীক্ষার পীঠ ভূমিতে প্রচুর সমালোচনা হ'য়েছে, তাছাড়া বাংলার খ্যাতনামা মাননীয় বহু মনীষী অধ্যাপক এই গ্রন্থের বিদ্বৎসম্ভাষায় তাঁদের অভিমত পাঠিয়ে আরও এগিয়ে যেতেও উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সেইসব নির্দেশ পেয়ে এ গ্রন্থের রচনা ক'রে—এর বক্তব্য বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করেছি, এক্ষেত্রে আপনার মৌন প্রেরণাই এর অন্তঃশক্তি।

বিংশ শতাব্দীর পরাধীন তথা স্বাধীন ভারতের ও বাংলার প্রতি গ্রামে প্রতি নগরের পথে পথে আপনি শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে জনগণকে শুনিয়েছেন—

আরে আমার নিতাই রে !
ও পতিতের বন্ধু !

আপনার ওই আবেদনে কি আকুতির ভাষা ছিল ? এই প্রশ্ন নিয়েই—এই সন্দর্ভে শ্রীনিত্যানন্দ রচনার প্রয়াস।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব থেকেই বাংলা তথা বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের জনবৃন্দের কাছে অচ্ছুৎ। জাতি বর্ণ ও আচারের মাপ কাঠিতে মানুষ মানুষের কাছে অবহেলিত হয়, এটা নাকি ঐশ্বরিক বিধান। এ বিধানের পিছনে কি আছে তাই তুলে ধ'রতে এবং মানুষকে সমগ্র মানবতাবাদের ঐক্য সূত্রে বাঁধতেই কি এই বাংলার ভূমিতে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব ? তাঁর সে আশা কি আজও পূর্ণ হয় নাই ? তাই কি আপনি চোখের জলে বেদনার্ত্ত কণ্ঠে ব'লতেন—

হা নিতাই ! প্রভু নিতাই !
তোমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় নাই,
আজও, পতিত কাঁদে ঘরে ঘরে—

—০—

আপনার করুণাধন্য
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ সাধক-কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের এক অক্ষয় কীর্তি। বাংলা-ভাষার শ্রেষ্ঠতম জীবনীরূপে এবং বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের মঞ্জুষারূপে এ গ্রন্থ অনন্য। ষোড়শ শতকের ভারতীয় অধ্যাত্ম-আকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। চরিতামৃতে তাঁরই পুণ্যময় জীবন কাহিনীটির পরতে পরতে পরিবেশিত হ'য়েছে প্রেমভক্তিধর্মের রসতত্ত্ব।

কবিত্ব, তত্ত্ব ও তথ্যে সুসমৃদ্ধ এই মহান গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা ক'রতে গিয়ে সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় অগ্রসর হ'য়েছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টি, বিচারশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠা নিয়ে। সব দেশের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মকেই এ ধরনের আলোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়, নূতনের আলোকপাত ঘটে তার নূতনতর মূল্যায়নে। এর ফলে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা মনীষী ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার এবং অন্যান্য লেখকেরা আংশিকভাবে এবং প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু ক'রেছেন। কিন্তু তার মৌল তত্ত্বের এ ধরণের সামগ্রিক আলোচনা এ যাবৎ কেউ করেন নি।

লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃতের মূলের কথাটি ধ'রে টান দিয়েছেন এবং তার ওপর ক'রেছেন প্রখর বিশ্লেষাত্মক আলোকসম্পাত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপুর, ভক্তপ্রবর বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দ। এঁদের রচনায় শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ ও লীলার যে ভাবাদর্শ ফুটে উঠেছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের নির্ণীত তত্ত্ব কিন্তু তা থেকে ভিন্নতর। এই কথাটি প্রমাণ ক'রতে গিয়ে লেখক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রেছেন বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, মধ্যযুগীয় সমাজ মানসে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব, সমকালীন উড়িষ্যার সাধকদের পরিবেশ এবং কৃষ্ণদাসের নিজস্ব মানসগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি আরো দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের সিদ্ধান্তিত তত্ত্ববাদের বৌদ্ধ পঞ্চতত্ত্বের সিদ্ধান্ত দূরবিস্তারী ছায়া ফেলেছে। সে সিদ্ধান্ত যে কৃষ্ণদাসের পূর্বগামী চরিতকারদের থেকে পৃথক, তাও তিনি স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন। এ পার্থক্য কি কৃষ্ণদাসের নিজস্ব দৃষ্টি-ভংগীপ্রসূত? না কি পরবর্তীকালের অপর কারুর প্রক্ষেপণ? তা অবশ্য নির্ণয় করা আপাতত সুকঠিন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে নির্ণয়ও প্রতিভাবান লেখক ঠাকুর মহাশয় এনিয়ে অনেকটা এগিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও লীলা রহস্য সম্পর্কে কৃষ্ণদাস গ্রহণ ক'রেছেন স্বরূপ দামোদরের মতবাদ। এ মতবাদটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু রঘুনাথ দাস গোস্বামীর

মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, 'স্বরূপের রঘুনাথ' স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন স্বরূপের প্রচারিত তত্ত্বের সংবাহক এবং তা স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে ('কবিরাজ পরিবেশিত সংবাদে') শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা ও তাঁর ভাবময় আর্তি কিরূপ তা আস্বাদনের লোভ জাগে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের, সেই রস লোলুপতার ফল শ্রীচৈতন্য—যাঁর দেহে রাধা ও কৃষ্ণ দুজনেই—রস আস্বাদিতে ছিলেন এক ঠাঁই। এ তত্ত্বটি মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস বা কবি কর্ণপুরে নেই—নেই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় তত্ত্ববাদী ষড়্‌গোস্বামীদের ভেতরেও।

লেখক তাঁর প্রশ্নটি উপস্থাপিত ক'রে ব'লেছেন, "স্বরূপ দামোদরের অনুভূত ও তত্ত্ববেদ্য সেই রহস্যবাদটি শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের আদিকালে আবৃত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু মধ্য ও অন্তলীলায় তা পরিস্ফুট হ'য়েছে। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সর্বত্র তা ছড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ পরিবারদের মধ্যে এই উপাসনা ঘটেছিল কিনা তা জানা যায় না, আর সেটি যে শ্রীগৌরাঙ্গের হার্দ্য অথবা গৌরাঙ্গ তত্ত্ব জানার পূর্ণতা—এমন কথা কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাই। কারণ, তাতে শ্রীগৌরাঙ্গ হন উপায় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় রহস্য হয় অনুভবগম্য উপেয়। এ কি রকম কথা?

...এই রীতিটি ষড়্‌গোস্বামীদের কেউ জানতেন না, কিন্তু বৃন্দাবনে অবিচ্ছিন্নভাবে চ'লে আসছে এবং ঐ মতবাদ আশ্রয়কারী বৈষ্ণবদের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে অথচ কত প্রাচীন এবং কার দ্বারা ঘটেছে, তা কেউ জানেন না।

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, শ্রীস্বরূপ দামোদরের ঐরূপ অনুভূতিবেদ্য, যা কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারাই যেন আরো প্রচারিত এমন তত্ত্ববাদের মৌলিকতা কোথায়? বেদে পুরাণে অথবা ভাগবতে? যাঁরাই এই তিনস্থানে অনুসন্ধান ক'রেছেন, তাঁরাই বলেন, —না তা পাওয়া যায় না।

"যা পাওয়া যায় তার সূত্র সৌত্রান্তিক যোগাচার ও হঠযোগী, বজ্রযানী বৌদ্ধ-তান্ত্রিক এবং নাথ সম্প্রদায়, আর ঔঘর সম্প্রদায়, কুরুকুল্লা সম্প্রদায় এবং সহজযানী বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে।"

লেখকের মতে, তৎকালীন উড়িষ্যায় প্রচলিত পঞ্চবুদ্ধের উপাসনায় রসতন্ত্রের রহস্য-বাদ ও আত্মরতির রহস্যবাদ নিয়ে যাঁরা রত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁদেরও প্রভাব পড়েছিল কৃষ্ণদাসের প্রচারিত তত্ত্বের উৎস স্বরূপ দামোদরের উপর। আসলে পঞ্চতত্ত্ব মণ্ডিত কৃষ্ণ-তত্ত্বের ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক চৈতন্য উপাসনার ধারাটি প্রবর্তিত হয়েছিল চরিতামৃত পরিবেশিত স্বরূপ দামোদর থেকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনপ্রিয় গ্রন্থে তা বিস্তারিত করা হ'য়েছে। এক্ষেত্রের এই সত্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশই আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, বিদগ্ধ তত্ত্বানুসন্ধানী এবং প্রতিভাবান লেখক। তাঁর এই রচনায় শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব নির্ণয়ে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন এবং সে তত্ত্ব যে পঞ্চতত্ত্বাত্মক তত্ত্ব থেকে পৃথক, তা দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। প্রামাণ্য তথ্য সংকলন, যুক্তিনিষ্ঠা ও মনীষার ছাপ এই রচনায় সর্বত্র বর্তমান।

স্বল্পায়তন হলেও এটি তথ্য ও তত্ত্বের মূল্যবান আকর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বঙ্গ সংস্কৃতির গবেষকরা এ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

কৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্ব আজকাল আমেরিকা, ইউরোপের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সময়ে যাঁরা শ্রীচৈতন্যকে আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের সম্মুখে, আলকোজ্জ্বল-মুক্ত প্রাঙ্গণে, প্রকৃত শ্রদ্ধার বেদীতে স্থাপিত ক'রতে চান, তাঁদের ভেতর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর অন্যতম পথিকৃৎ হ'য়ে থাকবেন। তাঁর এই তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও নবতর আলোকপাত কল্যাণবহ ব'লেও গণ্য হবে।

—শঙ্করনাথ রায়

হিমাদ্রি
১৬, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা

এই সন্দর্ভটি প্রকাশের জন্য যাঁদের সাহায্য পেয়েছি—

১৩৭৬ সালের কার্তিকে এটি লেখা শেষ করি। ক'লকাতার দুটি প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে দু'বারে পাঠাই। দু'বারই ফেরৎ এল। সকলেই চিঠি দিলেন, সব সম্পাদকেরই একটি মন্তব্য "আপনি জানেন আমাদের পত্রিকায় কোনও সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ ছাপা হয় না.........। আর একটির বিশেষ মন্তব্য— যুক্তি ও প্রমাণ ঠিকই দিয়েছেন, কিন্তু প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট বেড়ে যাবে,—।"

এরপর ক'লকাতার প্রখ্যাত সাপ্তাহিক "হিমাদ্রি" পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক ও পুরাতন সুহৃৎ শ্রীপ্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্যের হাতে দিই। ইনি (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'ভারতের সাধক' গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কর নাথ রায়)। তিনি ঐসব প্রত্যাখ্যানের কাহিনী শোনেন এবং চিঠিগুলি প'ড়ে হাসলেন। সাগ্রহে এই সন্দর্ভটি নিলেন এবং ১৩৭৬ সালের ৩রা পৌষ থেকে প্রকাশ ক'রতে ক'রতে এক বৎসরে এটি শেষ ক'রে আদর্শ সাহসিক সম্পাদকের পরিচয় দিলেন। ও গোষ্ঠীর মাননীয় শ্রীঅরবিন্দ রায়, শ্রীরোহিণী অধিকারী ও বিজয় দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ ক'রে আমার দীর্ঘ দিনের সুহৃৎ-সম্পর্কটি আরও গাঢ় ক'রে তুললেন। এখন ও নিয়ে তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব? অথবা বিনীত শ্রদ্ধা জানাব? তার চেয়ে দু'ই-ই জানাই।

এই সন্দর্ভটির বক্তব্য বিষয় নিয়ে বাংলার বহু সংবাদ পত্রে এবং বহু মনীষী তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে অভিমত জানিয়েছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নামে প্রচলিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটির বহুলাংশই যে 'সহজিয়া সম্প্রদায়ের' মতবাদের পোষক, এবং যা ব্রজের ও গৌড়ের বৈষ্ণবাচার্য্যদের অজ্ঞাত ছিল।

আজ লোকান্তরিত সেই বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় এই সন্দর্ভ রচনার জন্য তাঁর মৌখিক ও লিখিত তথ্য দিয়ে আমাকে প্রচুর সাহায্য ক'রেছেন। অনন্তকালের দূরত্বে থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর উদ্দেশে। আমার কৈশোর কালে বৃন্দাবনে থাকার সময় মজুমদার মহাশয়ের মাতামহ শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের কাছে কিছুদিন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়ি। মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে তখনই পরিচিত হই, সেই সুবাদ অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদানের জন্য তিনি যখন বরাহনগর পাঠ বাড়ীর গ্রন্থাগারে ব'সে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন এবং শেষবার চৌষট্টি প্রকার রস সম্বন্ধে লেখাটি পরিস্ফুট ক'রতে পাঠ বাড়ীতে অবস্থান করেন, সেই সময়েই আমার এই নিবন্ধটি লেখার জন্য সাহায্য করেন কিছু আলোচনা ক'রে কিছু তাঁর গ্রন্থ থেকে দাগ দিয়ে। হায়! আজ আর এটি তাঁকে সাক্ষাতে দেখাতে

পেলাম না। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে ব'লেছিলেন, "এটি এত খোলাখুলি প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাতেও হয় নি। তুমি তাই কর।" আজ সেই স্মৃতিময় পুরুষকেও শ্রদ্ধা জানাই—।

অতঃপর, দীর্ঘ দিন কেটে গিয়েছে। প্রাচী পাবলিকেশনের কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় এ সংস্করণ নব প্রকাশনার প্রাক্কালে এই স্মৃতি তর্পণের অনুরেখার অনুস্মরণে হাওড়ার বিখ্যাত মহনীয় পুরুষ **আশুতোষ ঘোষ** (A. Tosh & Co.) মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র **৺প্রফুল্লকুমার ঘোষ** (কচিবাবু) তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী **অমিয়া ঘোষ** মহাশয়া এবং এঁদের সুযোগ্য কৃতিসন্তান **শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ** ও **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ,** আমার শ্রীগুরুদেবের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধা প্রীতি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীগুরুদেবের স্মরণে—তাঁদের নির্মল অন্তরের স্মৃতিপ্রণতি এবং আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশও এ জীবনে অবিস্মরণীয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ

(১ম ভাগ)

আরব্ধ বিষয়

আজকের বাংলায় প্রাচীন ভারতের বহু ধরণের সংস্কৃতিসত্তার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ র'য়েছে। আর,প্রতিটি সংস্কৃতিরই মৌল পটভূমিকায় র'য়েছে জৈন, বৌদ্ধ, নাথ সম্প্রদায় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত বৈষ্ণব সাধকদের অপরিসীম দান এবং তাদের সঙ্গে জড়িয়ে র'য়েছে অন্যান্য দৈবিক ও লৌকিক উপাসকদের প্রতিষ্ঠিত সাধনার পরিস্ফুট ছাপ। সেগুলিকে বাদ দিলে বাঙ্গালীর সমন্বয় সাধনায় কোন জীবন্ত নজীরই থাকে না।

তাঁদের সাধনার ধারাকে অবলম্বন ক'রেই বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যসত্তার ইতিহাসের এক বিশেষ চিহ্নিত অধ্যায়। সে সবের তারিখ ও নিরীখের ক্ষণ ধ'রতে গেলে যদি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করা যায়, তবে অনেকটা ইতিহাসস্পৃষ্ট ধারা পাওয়া যায়।

কারণ ঐ শতাব্দীর পর থেকেই দেব দেবীর সঙ্গে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতিয়ে তার সঙ্গে ভক্তিবাদ স্থাপন করার কৃতিত্বও বাঙালী জাতি ক'রেছে, এ কথাও তো ঐতিহাসিক সত্যের অন্যতম।

তাছাড়াও পুরাণের ভিতর যে সব লোক সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের সঙ্গেও প্রতিটি দেব দেবীকে ব্যক্তি মানবের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তাদের অবতারত্ব, লীলাময়ত্ব এবং আচরণ বৈশিষ্ট্যকেও উপলব্ধি করার সিদ্ধান্তবাদ, এটা বাঙালী জাতির আবিষ্কার বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উদাহরণ হ'য়ে আছে তার বিশাল সাহিত্যমালায়।

ঠিক এমনি দুটি কোণ থেকে দেখলে দেখা যায়—ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমর লেখনী প্রসূত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটিতেও শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তি জীবনকে তত্ত্ব এবং লীলাবাদের দ্বারা—সমন্বিত ক'রে—এক অপরূপ সুন্দর একটি সাহিত্যের মঞ্জুষা করা হ'য়েছে। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সময়ে প্রায় একই ধরণে প্রচলিত সামাজিক অবস্থায় শক্তিশালী সাহিত্য সাধকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় সাধন ক'রে যে সব জীবনীগ্রন্থ ও পদ পদাবলীর উদ্ভব হ'য়েছে—সে-গুলিকে পাশাপাশি রেখে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটি পাঠ ক'রলে এবং অনুশীলন করলে জানা যায়, এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য অন্যপথে এবং কোথায় তার কোন একটি স্বতন্ত্র ভাবও সংস্কৃতির আকরের স্পর্শ লেগে র'য়েছে।

যাঁরা মনস্বী ঐতিহাসিক এবং শক্তিশালী প্রতিভাধর, তাঁরা অকপটে স্বীকার করেন, যে কোনও লেখকের সৃষ্টি তাঁর মনেরই ছায়া। সেই মনের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে অতীতের প্রবাহিত এবং তৎকালে উপসর্পিত সমাজ সংস্কারের বাস্তব রূপ। আর সংস্কার দ্বন্দ্বের মধ্যেও অনুকূল প্রতিবেদন। তেমনি সংস্কার থেকেই শক্তিশালী লেখক তাঁর

অবলম্বিত নায়কের তত্ত্ব ও আচরণ বা লীলাকে আদর্শবাদের প্রতিশ্রুতির ধর্মে রূপায়িত করেন। প্রেরণা জোগায় তাঁর মনের সংস্কার, আর পঠিত গ্রন্থের প্রভাব। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার যে সামাজিক অবস্থায় মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাব, সেটি ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেও যেমনি অঙ্কিত হ'য়ে আছে, তেমনি র'য়েছে বৈষ্ণব সাধকদের রচিত গ্রন্থমালায়।

এ বিষয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলির সারাংশ গ্রহণ ক'রলে যা পাওয়া যায় তা এই—

প্রচলিত সমাজের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আনুমানিক ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে পিতা বিজয় সেন গত হ'লে পর, তাঁর পুত্র বল্লাল সেন তাঁর পৈতৃক ধর্ম ও বিশ্বাসকে সযত্নে পোষণ ক'রেও, বাংলায় পূর্ব থেকে প্রচলিত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের প্রাবল্য উপলব্ধি ক'রলেন, তাকে কিছুতেই রোধ ক'রতে পারেন নাই। গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করার আগে থেকেই নামে মাত্র উচ্চশ্রেণীর প্রজারা তো বটেই, অন্যান্য শ্রেণীর প্রজারাও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মে অনুরক্ত এবং বৈদিক সংস্কার থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্যুত হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

বল্লাল সেন নিজে দীক্ষিত হ'লেন "সারস্বত শ্রেণীর" ব্রাহ্মণ অনিরুদ্ধ ভট্টের কাছে। অনিরুদ্ধ ভট্ট বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী, মহাতেজস্বী তান্ত্রিক পুরুষ। অতএব বল্লাল সেনের মতিগতি অচিরেই তন্ত্র ধর্মের আচারে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল, তাতে নিম্নশ্রেণীর রমণীকে ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানেও সর্বদা উত্তরসাধিকা ক'রে "হঠধর্মে" প্রমত্ত হলেন।

বল্লালের তন্ত্রধর্মের প্রমত্ততায় পূর্ণ সুযোগ এসেছিল মহাতান্ত্রিক অলৌকিক শক্তিধর 'সিংহগিরি' নামে আরও একজন সিদ্ধাচার্যের সংসর্গে! গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ও মহারাজ বল্লাল উভয়েই সিংহগিরির কাছে পূর্ণাভিষেক লাভ করেন।

সিংহগিরি জানালেন মহানির্বাণ তন্ত্রের পাঠই "কলিযুগের প্রত্যক্ষ ধর্ম"। কলির জীবদের একান্ত আশ্রয় এই তন্ত্র ধর্ম। কলিতে বৈদিকমন্ত্র নিবীর্য। সত্য, ত্রেতা দ্বাপরে বৈদিক মন্ত্র হয়তো সফল হোতো, কিন্তু এখন তারা মৃত। দেওয়ালে আঁকা ছবিও যেমনি, বৈদিক মন্ত্রও তেমনি। আর বন্ধ্যা স্ত্রী যেমন জননী হয় না, বৈদিক মন্ত্রও তেমনি কলিতে সৃষ্টিহীন। কলিতে যারা বেদের বিধি পালন ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রতে চায়, তাদের দৃষ্টান্ত তৃষ্ণার্ত পথিকের কূপ খনন যেমন গঙ্গাতীরে, তেমনি—

নির্বীর্য্যা শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা হতাঃ॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিতাঃ।
অমূঃ অশক্তা কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম বন্ধ্যা-স্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্।
কলাবন্যোদিতৈ মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রা সিদ্ধাস্তূর্ণং ফলপ্রদাঃ। (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

বল্লালের মতবাদ 'কুলাচারে পরিণত হোলো এবং তার সঙ্গে কুলাচারী ব্রাহ্মণ প্রজাকে কুলীন বলে সম্মানিত করারও আয়োজন ক'রলেন ; সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ সমাজকেও আহ্বান ক'রলেন। তাঁরাও সানন্দে রাজধর্মকে গ্রহণ ক'রলেন। রাজ্যে কুলাচারিরাই কুলীন বলে গণ্য হ'তে লাগলেন। সমগ্র বঙ্গে কুলাচারের বিধি বিধান ঘোষিত হোলো, কুলাচার বা কৌলিন্য আচার পদ্ধতি রুদ্রযামলতন্ত্র থেকে গ্রহণ ক'রে, কুলীনদের সমাজমান্যতাও প্রতিষ্ঠা করলেন, তন্ত্র মতে নিত্যশ্রাদ্ধ, তান্ত্রিক সন্ধ্যা, বন্দনা, তান্ত্রিক তর্পণ' তান্ত্রিক জপ ও তপ, 'তান্ত্রিক দেবতার পূজা', পীঠদর্শন, 'তীর্থদর্শন' গুরুর আজ্ঞাপালন, তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা' এই হোলো কৌলিন্যের প্রতীক। এই কৌলিন্যের প্রাথমিক অধিকারী 'পশ্বাচারী মানব। কারণ পশুর ভাবই মানবের প্রকৃতি, পশুর প্রবৃত্তিই প্রথম ভাব, আর দ্বিতীয় ভাব বীর ভাব, তৃতীয় ভাব দিব্য ভাব, দিব্য আচার। তিনটি ভাব তিনটি আচার কৌলিন্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অবস্থা। যারা এই তান্ত্রিক আচারে বহির্ম্মুখ, তারা শ্রুতিধর্মী মাত্র, তারা শ্রোত্রিয় ব'লে গণ্য হবে।

শৃণুষ কমলাদেবি কুলাচার বিধিং শৃণু।
নিত্যশ্রাদ্ধঃ তথা সন্ধ্যা, বন্দনং পিতৃতর্পণম্ ॥
দেবতাদর্শনং পীঠদর্শনং, তীর্থদর্শনম্।
গুরোরাজ্ঞা পালনঞ্চ দেবতা নিত্য পূজনম্ ॥
পশুভাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্।
পশূনাং প্রথমঃ ভাবঃ বীরস্য বীর ভাবনম্ ॥
দিব্যানাং দিব্যভাবস্তু তিস্রো ভাবাস্ত্রয়ঃস্মৃতা।
স্বকুলাচার হীনো যঃ সাধকঃ স্থির মানসঃ ॥
নিষ্ফলার্থী ভবেৎ ক্ষিপ্রং কুলাচার প্রভাবতঃ।

রুদ্রযামল ২ পটল ৪—৭ শ্লোক।

বল্লাল সেনের প্রভাবে তৎকালের উচ্চ বর্ণের প্রজারা সহজেই প্রভাবিত হ'লেন, এবং অন্যান্য বর্ণের প্রজারাও অতএব তাঁদের আনুগত্য ক'রলেন। এ ইতিহাস তো আমারা সহজেই পাচ্ছি। উচ্চবর্ণের এবং রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে থাকার মত সংঘ শক্তি কোন্ যুগেই বা হয় ?

তৎকালে এবং তার পরবর্ত্তি কালের যাঁরা কুলীন তাঁরা যে বৌদ্ধাচারেই গ্রস্ত হ'য়েছিলেন তাতো নিঃসন্দেহ। কারণ কুল শব্দটি বেদে থাকলেও (যজ্ঞের ক্ষেত্রে) কুলীন নামে কোন শব্দ নেই এবং বল্লাল সেন ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের প্রবর্ত্তিত যে "নবধা কুললক্ষণং" ইত্যাদি বিধান, তাও বেদে নেই। (মনুর কুল বিধানও আলাদা)

মনুসংহিতায় বিবাহের ক্ষেত্রে রমণীর দশটি কুল আছে বলে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, সে কুলগুলি কিন্তু তান্ত্রিকদের কুল নয়, সেখানে আছে যে বংশে পুত্র কম, বা হয় নি সে মেয়েকে বিয়ে করবে না এমন বংশও একটি কুল। মনুর বিধানে আরও কুলের পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে যে "ষড়্‌গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে যত ভূমি কৃষ্ট হয় তাবদ্ ভূমি একটি কুল, মনু ৭। ১১৯। এই ধরণেরই কুল পরিচয় মনুতে র'য়েছে, কিন্তু মহারাজ বল্লাল সেনের কৌলিন্য বা কুলাচারের প্রবর্ত্তন খাঁটি বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কুলাচার। তারপর এই ধরণের কৌলিন্য-

বিধি ঠিক ঠিক চল্‌ছে কিনা তার বাছনি করার রীতিও চালালেন বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন।

সমগ্র বঙ্গে ও মগধের একাংশে তখন তার সঙ্গে প্রবর্ত্তন করা হোলো উপাসন পদ্ধতিরও একটি নবরূপ, আর নবধারা। পালযুগে যে ধারাটি সুপ্তমাত্র ছিল, সেই ধারাটিরই জাগরণ ক'রালেন বল্লাল সেন, আবার তার সঙ্গে করালেন পশ্বাচারের দিগ্‌বিজয় মাহাত্ম্যকীর্ত্তি। তার ফলে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হ'লেন ত'ারা রাজকীয় ধর্ম গ্রহণ করলেন না, পরোক্ষ ভাবে বল্লাল ও লক্ষ্মণের আচারকে ত'ারা ঘৃণাই ক'রতে লাগলেন। ত'াদের এভাবে ঘৃণা করার দুঃসাহস একটু একটু করেই দানা বেঁধেছিল, যে সময় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তার পিতার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ক'রেছিলেন। মহারাজ বল্লাল সেন ত'ার জীবনের দিনচর্য্যায় কুলাচারকেই বেশী করে দেখেছিলেন, সেটা বাড়াবাড়িও করে ফেলেছিলেন, যার ফলে ত'ার কুলাচারে কৌলিন্যটি ক্রমশ প্রবল কামাচারেই পরিণত হ'য়ে যায়। ওতে রাজকোষও যেমন নিঃশেষিত হতে থাকে, তেমনি প্রজাকুলও মাতালের দলে পরিণত হ'তে থাকে। তখন কুলীন সম্প্রদায়ই ছিলেন রাজকীয় সম্মান ভাজন। এই সময়ে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেখলেন, অমন কুলীন প্রজাদিগকে হঠাৎ সায়েস্তা করা সম্ভব নয়; কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতেই হবে এবং পিতার সাক্ষাৎ সম্পর্ক থেকে নিজেকেও রক্ষা ক'রতে হবে। বল্লাল সেন তখন কুলীনের দলকে 'তাম্র শাসন' দিয়ে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ছেন—

তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্যং শাসনানি বহুনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান পূর্বং কলৌ বল্লাল সেনকঃ॥

(হরিমিশ্র কারিকা)

তা ছাড়া কুলীনের দলকে আর এক ধরণেও প্রতিষ্ঠিত ক'রতে লাগলেন বল্লাল সেন বাংলার য'ারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর, ত'াদের মধ্যে কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় কুলীন এবং এই তিন আখ্যায় ভূষিত ক'রলেন। য'ারা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক দিব্য ভাবে এবং দিব্য আচারে—চ'লছিলেন, তাদিকে 'মুখ্য কুলীন' য'ারা বীরভাব, বীর আচারে চ'লছিলেন, ত'াদিকে 'গৌণ কুলীন' এবং কিছু দরিদ্র ও লু... ব্রাহ্মণকে ত'াদের অসহায় অবস্থার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়ে পশু ভাবে বা পশ্বাচারে চালিয়ে ত'াদিকে 'শ্রোত্রিয় কুলীন ব'লে ঘোষিত ক'রলেন এবং তাঁদিকে সেই ভাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিতও ক'রলেন। এঁদের স্বতন্ত্র মর্য্যাদাও দিলেন। "বল্লাল সেন ঘোষণা করলেন— য'ারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুলাচারের কুলীন, ত'ারাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ে কন্যাদান, কন্যা গ্রহণ ক'রবেন, এবং তাঁরাই রাজ সম্মানিত সমধর্ম্মী বলে গণ্য হবেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ভেবে কুলীনগণ নিরত থাকবেন।"

কন্যাদান প্রদানেভ্যঃ স্বধর্মপরিবর্ত্তিতঃ।
অন্যোন্য সমধর্মী চ ভাবতা সমধর্মতঃ॥
অয়মেব বৃহদ্ধর্মঃ কুলীনঃ তেন সম্মতঃ।
কর্ত্তব্য মিতি নিশ্চিত্য নৃপবল্লাল সেনকঃ।
(বাচস্পতি মিশ্রের কুলারাম।)

তাছাড়া আরও ঘোষণা ক'রলেন কুলীনরা শ্রোত্রিয়ের কন্যা নিতে পারবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দিলে কুলীনের কুলক্ষয় হবে, আর কুলীনকে যিনি স্বেচ্ছায় কন্যা দান ক'রবেন না বা যিনি কুলীন কন্যার স্বেচ্ছায় পাণিগ্রহণ ক'রবেন না, তাঁদের কুল থাকবে না, রাজ্য শাসনেও তাঁদের কুল মানা হবে না। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড) ১ম অংশ (১৪৬ পৃষ্ঠা)

তারপর ১১৭৯ থেকে ১২০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের যখন রাজ্যকাল, তখন লক্ষ্মণ সেন তাঁর পিতার প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত কুলীন পদ্ধতির সংস্কার আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী তখন বৈদিক ধর্মনিষ্ঠ "পশুপতি"। তিনি রাজ পরামর্শে বিচারালয়ের শ্রেষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কুলীন ব্রাহ্মণদিকে (১) সমান (২) আত্তি (৩) ক্ষেম এই তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন।

পিতার কৌলীন্যকে রদও ক'রলেন না, আর প্রচলিত ধারাকেও চ'লতে দিলেন না, 'পরিবর্ত্ত কুলীন' আর 'অংশ কুলীন' এবং 'সমীকরণ করা কুলীন' এই ভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদিকে সমাজে বিন্যস্ত ক'রলেন।

এই বাছনীটি তিনি দু'বার করেছিলেন, কারণ তাঁর পিতার প্রবর্ত্তিত "কৌলীন্য প্রদানটি" বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীকে এবং দুর্ব্বল প্রজা-শ্রেণীকে তখন এমন ভাবে নিয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছিল যে, তাতে যে কোনও সময় এই বাস্তব জ্ঞান বর্জিত বাংলার কুলীন সম্প্রদায়কে অল্পমাত্র শক্তিশালী বিদেশী শক্তি সহজেই জয় করে নেবে, যার ফলে বাংলা পরাধীন হবেই। তাই তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী স্থির ধীর বৈদিক পণ্ডিত 'পশুপতি' ও অন্য একজন বিরাট শক্তিধর পণ্ডিত 'হলায়ুধের' সঙ্গে পরামর্শ করে খুব প্রচ্ছন্নভাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হ'লেন।

তখন বাংলার কুলীন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রকে প্রামাণ্য ব'লে মনেই ক'রতেন না। তাই লক্ষ্মণসেন, তাঁর প্রধান ধর্মাধিকারী (চীফ জাষ্টিস্) হলায়ুধকে দিয়ে, এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করালেন, যা বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা ক'রতে সাহায্য করে; যার ফলে 'সমাজ সংস্কারক মহারাজ লক্ষ্মণ সেন" ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইলো। হলায়ুধ শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থের বহু স্থানের সার সংগ্রহ ক'রে মৎস্যসূক্ত" নামে এক মহাতন্ত্র' রচনা ক'রলেন, ওতে না রইলো কঠিন বৈদিক ব্রত আচার, না রইলো প্রকৃত তন্ত্রাচার। কুলীন ব্রাহ্মণগণ সেইভাবেই সময়োচিত 'সহজিয়া আচার' গ্রহণ করলেন। গ্রন্থটিতে এমন রীতি অবলম্বন করলেন, যাতে প্রচলিত আচারও রক্ষিত হয়, অথচ, বৈদিক আচারেরও কিছু সংস্কার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বীরাচারী কুলীন ব্রাহ্মণেরা যাতে বিরোধীও না হয়, আবার কিছুটা সংযতও হয়। কারণ "কৌলিন্য গর্ব্বী' বৌদ্ধ তান্ত্রিক কুলাচারীর দল, অবৈদিক তন্ত্রাচারের ভোগবিলাস-ময় জঘন্য আচার এবং বৌদ্ধাচারের মত্ততায় সমগ্র বাংলার সামাজিক শক্তিটি তখন কঙ্কালসার হ'য়ে এসেছে। বাহ্যত, তাঁরা নামে মাত্র বর্ণাশ্রমী; কিন্তু মানসিকতায় তাঁরা বৌদ্ধতান্ত্রিক। তাঁরা বৌদ্ধদের দেব দেবীগুলির পদতলে বৈদিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা দিকে যে প্রণত নম্র শির হ'য়ে উপনীত করার নানান্ উপাখ্যান রচনা করে, ওগুলিকে পুরাণ উপাখ্যান বলে চালাচ্ছেন, সমগ্র বৈদিক সংস্কৃতির

সঙ্গে তার কোন মিল হয় না। বৈদিক সংস্কৃতিতে কোন দেবতা নিশাভাগে পূজা নেন না, ফুল, পাতা ও মদ্য মাংসও গ্রহণ করেন না।

লক্ষ্মণ সেন দেখলেন খুব সূক্ষ্ম, খুব প্রচ্ছন্ন ভাবে কুলীন কৌলাচারের সংস্কারকে মার্জিত করতেই হবে, তাই কুশাগ্রবুদ্ধি পশুপতি ও হলায়ুধের সাহায্যে মহারাজা লক্ষ্মণ সেন সে কাজটির ভার দিলেন হলায়ুধকে, তিনি বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই "মৎস্যসূক্ত" রচনা ক'রলেন।

'তারা', 'একজটা', 'উগ্রতারা' এবং 'ত্রিপুরা' ও 'মাতঙ্গী' এই পাঁচটি দেবীর পূজার ক্রম, তাঁদের মন্ত্রোদ্ধার, এসবও রইলো তাতে, আর তার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রম তারার বীরভাবে পূজা ইত্যাদিও—জুড়ে দেওয়া হোলো।

এই ধরণে এই রীতিটি কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রের। অর্থাৎ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মতে "তারা" হলেন লোকেশ্বর বুদ্ধের কন্যা, তাঁর প্রধান নাম 'প্রজ্ঞা পারমিতা', অর্থাৎ বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রযান-উপাসনার প্রবর্ত্তনের পূর্বে যেটি 'মন্ত্রযান' উপাসনা ব'লে প্রচলিত ছিল সেইটির ধারা এবং বজ্রযান তার সঙ্গে জুড়ে, এই দুটি সাধনার তত্ত্ব—মিলিয়ে বজ্রযানী 'পঞ্চতত্ত্বাত্মক' একটি নূতন তত্ত্ব ও তথ্যময় কুলাচারের প্রবর্ত্তনও করলেন।

সেই পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত ধারাটি—স্বয়ম্ভূ বা আদিবুদ্ধ থেকেই উদ্ভূত এবং তা বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চতত্ত্বেরই পূজা পদ্ধতি; ওটিতে আছে—(১) বৈরোচন ২) অক্ষোভ্য (৩) রত্ন সম্ভব (৪) অমিতাভ এবং (৫) অমোঘ সিদ্ধ। এরাই পঞ্চতত্ত্ব এবং এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের আছে পাঁচটি শক্তি (১) বৈরোচনী (২) লোচনা (৩) মামুখী, (৪) পাণ্ডরা (৫) তারা।

পাঁচটি বুদ্ধের এই পাঁচটি শক্তির সম্মেলনেই উদ্ভূত [১] সমন্তপাণি [২] ভদ্রপাণি [৩] বজ্রপাণি [৪] পদ্মপাণি এবং [৫] বিশ্বপাণি।

এই তত্ত্বগুলি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে গূঢ় ভাবে প্রচলিত ছিল তাঁরা 'পঞ্চধ্যানী' বজ্রযানী সম্প্রদায়ী ব'লে বহুদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের আচার পদ্ধতি এবং রীতিনীতি অতিগুহ্যতান্ত্রিক মত বলেই প্রখ্যাত। এঁদের সিদ্ধান্ত হোলো প্রবৃত্তি মার্গের মাধ্যমেই নিবৃত্তি আসে। তাঁরা আরও বলেন জীবের স্বাভাবিক ভোগলিপ্সার পশু প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তির মাধ্যমেই ক্ষয় করতে হবে। নেতি নেতি ক'রে ত্যাগ বৈরাগ্যের পথে নয়। এদের—পঞ্চতত্ত্বেরছাপ বাংলায় ভূরি ভূরি। সমাজআচারে (বাংলায় পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চোপসনা, পঞ্চরসিক, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চমকার, পঞ্চপুষ্প, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন, পঞ্চগ্রাস, পঞ্চপল্লবের প্রাধান্য। তাই এদের এই পঞ্চতত্ত্বের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিল হ'য়ে আছে। এগুলি খুব স্পষ্ট ক'রে আজও বাঙালীর সদাচারে গৃহীত হয়ে আছে।

হলায়ুধ তাই সেই "পঞ্চতত্ত্বের" অন্যতম শক্তি তারার স্তবই প্রথমে ক'রেছেন মৎস্য সূক্তের ৭ম পটলে 'লোকেশস্য সুতাপ্যথ মতা বালাবৃদ্ধা, কালী, শ্বেতা' স্বাহা বিধেয়া" তারপর ঐ পটলেই—'জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে। প্রজ্ঞা পারমিতা মতাচরিতে প্রণত জনানাং দুরিত ক্ষরিতে!"

মৎস্য সূক্তের এই অংশ পাঠ ক'রলেই বীরাচারীর প্রিয়বস্তু মনে হবে; তাছাড়া, শুধু

। হলায়ুধের অভিমতেই এটির রচনা তাই নয়, এটির দ্বারা বীরাচারীকে সমর্থন করারও কটা ঝোঁক তাঁর ছিল। তারপর স্মৃতি ও পুরাণে যেসব আচারের বিধান আছে, সে-লিও সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেগুলিকে বিন্যস্ত করে সেগুলির সমর্থন ও প্রচার রাও তাঁর অভিপ্রায় ছিল।

মৎস্য সূক্তের ৩১ পটল থেকে ৪১ পটল পর্যন্ত বৈদিক আচারের কিছু কিছু বিধি ধানও লিপিবদ্ধ ক'রলেন। প্রথমে ক'রলেন তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীগুলির পূজা মাহাত্ম্য প্রচার। ওখানে তারাকে সর্বশক্তিময়ী এমন একটি তত্ত্বময়ী রূপে দেখিয়েছেন । তাঁদের স্তবটিই সাক্ষ্য দেয়—

"তারা ত্বং সুগতাগমে ভগবতী গৌরীতি শৈবাগমে
বজ্রা কৌলিকশাসনে জিনমতে পদ্মাবতী বিশ্রুতা।
গায়ত্রী শ্রুতি শালিনাং প্রকৃতিরিত্যুক্তাসি সাংখ্যাগমে
মাত র্ভারতি! কিং প্রভূত ভণিতে ব্যাপ্তং সমস্তং ত্বয়া॥

তারপর বীরাচারীদিকে হাতে আনার ব্যবস্থা, তারপরে মদ্য মাংসাদির নিন্দা, এবং সে রের অযৌক্তিকতা, এবং প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধাচারের এবং তন্ত্রাদিরও যথেষ্ট নিন্দা করলেন।

একটু নমুনা দিই=প্রথমে নারিকেল খেজুর থেকে ১২ প্রকার তৈরী মদের নাম ক'রেছেন, তারপর ব'লেছেন, এই যে দ্বাদশ প্রকার মদ্য এসব মদ্য, ব্রাহ্মণ কিছুতেই পান করবেন না। যদি লোভ বশতঃ পান করে ফেলেন, তবে মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

এতদ্দ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ।
কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিক মাচরেৎ॥
(মৎস্যসূক্ত ৩৬ পটল)

ঠিক এই ভাবেই ৩৭ পটলে মাংস ও মাছ খাওয়ার নিন্দা ক'রেছেন হলায়ুধ। তার-পরই আরম্ভ করেছেন বৌদ্ধদের নিন্দা।

বৌদ্ধান্ পাশুপতাংশ্চৈব, লোকায়তিক নাস্তিকান্।
বিকর্মস্থং দ্বিজা স্পৃষ্ট্বা, সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥
(মৎস্য সূক্ত ৩৮ পটল ১ম শ্লোক)

এ শ্লোকটি বিষ্ণু পুরাণেও আছে। (তাছাড়া সমস্ত পুরাণেই কিছু না কিছু বৌদ্ধ নিন্দা থাকার জন্য পণ্ডিতরা কোন পুরাণকেই বৈদিক ঋষির রচনা বলে গণ্য করেন না।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একদিকে যেমন মৎস্যসূক্ত তন্ত্র রচনা করালেন, ঠিক সেই ভাবেই আবার প্রধানমন্ত্রী পশুপতিকে দিয়ে "সংস্কার পদ্ধতি"ও রচনা করিয়ে প্রচলিত আচারের ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংস্কার সাধন ক'রলেন। কারণ তখন বিশেষভাবে দূষিত হ'য়েছিলেন রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণগণ। তাঁদেরই সংস্কার সাধনের জন্য হলায়ুধকে দিয়ে আর একখানি ভাল গ্রন্থও রচনা করালেন। সেটির নাম দিলেন "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব"। তাছাড়া হলায়ুধের আর এক ভাই 'ঈশান" তিনিও ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে "আহ্নিক পদ্ধতি"

নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে ব্রাহ্মণদের দিনচর্য্যারও সংস্কার সাধন করার প্রয়াস পেলেন।

এই চারখানি গ্রন্থের রচনা পদ্ধতির গুণে তখনকার সমগ্র বাংলায় সমাজ ব্যবস্থার একটা মোড়ই ফিরে গেল। কিছুটা মোড়ফেরান সেই সমাজেরই অনেক ভেঙ্গে চুরে গেলেও আজও "লক্ষ্মীপদ্ধতি" ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতির আবিষ্কারও হয়নি। যদিও রঘুনন্দন পদ্ধতির যোজনা আরও তাতে রয়েছে।

কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁর সভার অন্যতম পণ্ডিত মহাকবি জয়দেবের কোমল পদাবলী "গীত গোবিন্দের" কাব্য রসে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং পরিণত বয়সে তিনি সেই বৈষ্ণব ধর্মেই চিত্ত নিবেশ ক'রেছিলেন, ঐতিহাসিকরা এসংবাদও লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঐতিহাসিকরা আরও বলেন যে, লক্ষ্মণ সেন শেষ বয়সে তাঁর সভায় "ভাগবত" গ্রন্থের দশম স্কন্ধের পাঠ নিত্য শ্রবণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়েই হলায়ুধ "শৈব সর্ব্বস্ব" নামে আর একটি গ্রন্থ লেখেন। লক্ষ্মণ সেনও সেই আদর্শেই আবার "বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব" নাম দিয়ে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করারও আদেশ দেন। হলায়ুধ তা নিষ্ঠার সহিত পালনও করেন। তাতে ভাগবত ধর্মের গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সে রহস্য সাধারণ ব্যক্তিরা সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। তাই সাধারণ প্রজারা রাজকীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পেরেই নূতন ভাবে জয়দেবেরই সহজভাবের বৈষ্ণবতার একটা স্রোত প্রবাহিত ক'রতে লাগলেন।

তার প্রভাব সমাজে—ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচার এবং সহজিয়া বৈষ্ণবের—বিলাসিতার কদর্য গহ্বরে প্রবেশ করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল, এবং যার ফলে বৈষ্ণব ধর্মের শুদ্ধ রহস্যটি দেহভোগবাদে পরিণত হ'তে লাগলো। এ তথ্যের সন্ধান লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর রচিত পবনদূতে তা পরিস্ফুট হ'য়ে আছে।

দ্বিতীয় পর্ব—

কৌলিন্যের দুর্দৈবের পর আবার বিকৃত বৈষ্ণব ধর্মের রহস্যের প্রভাবে নতুন করে দুর্দৈব এসে বাংলার সমাজ জীবনকে গ্রাস ক'রতে লাগলো। ফলে বাংলার সমাজ আরও দুর্বল হোলো এবং তার ক্রমপরিণতিতে বাংলার সমগ্র সমাজটার সঙ্গে গৌড় রাজধানীটিও মুসলমানের কবলিত হবার পথ প্রশস্ত হ'য়ে গেল, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে অবশেষে পূর্ববঙ্গে পলায়ন ক'রলেন।

লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম পুত্র বিক্রমপুরের মহারাজা 'বিশ্বরূপের' আশ্রয়ে এসে আশ্রিত হলেন। 'বিশ্বরূপ' সমাজ সংস্কার অপেক্ষা তাঁর রাজ্য রক্ষা করাটাই অধিক শ্রেয় মনে ক'রতেন, তাই পিতার আরব্ধ কাজে তিনি এতটুকুও মনোনিবেশ করেন নাই। দুই বঙ্গের সমাজই তখন অনেক বিপর্য্যয়ের সম্মুখে এসে হাজির হ'য়েছে।

কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি দুর্বলতার দ্বারে এসে ধীরে ধীরে মুসলমানদেরই শক্তিসংহতির মধ্যে পুষ্ট হতে লাগলো, আর হিন্দুর সমাজনীতিটিও তখন তন্ত্রমিশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রাধান্য লাভ ক'রতে লাগলো। মুসলমানরা কিন্তু হিন্দু সমাজের

এ দিকটায় নজরই দিলেন না। তাতে ত াঁদের প্রয়োজনই বা কি থাকতে পারে ?

ধীরে ধীরে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গেও মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হোয়ে গেল, কিন্তু দ্বন্দ্ব বাধলো হিন্দু মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাংলার মুসলমানরা যখন দিল্লীর কেন্দ্রিক শাসনকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেলেন; তখনই হিন্দূ মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনের প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব ক'রলেন। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি রাজনৈতিক মিলন ঘটতে লাগলো, সেটা ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

এর ফলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজের অনেক উচ্চবর্ণের লোক নানান্ কারণেই মুসলমান ধর্মে গ্রস্ত হতে লাগলেন। এ বিষয়ে ইতিহাসই প্রমাণ দেয় যে, সেটি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীরই একটি চিহ্নিত সময় এবং এই সময়েই ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা 'গণেশ'।

রাজা গণেশ নিজে গোঁড়া হিন্দু হলেও ত াঁর মুদ্রাগুলিতে "বয়াজিদ্ শাহ" এই নামই পরিদৃষ্ট হয়। আর ত াঁর পুত্রও "জালাল উদ্দীন" নামেই পরিচিত হ'য়েছিলেন।

তবে রাজা গণেশ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তন্ত্রাচার মিশ্রিত সংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বই সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতো। কিন্তু গণেশের পর সেটিও প্রতিদিনই একটু একটু করে ক্ষীণ হ'তে থাকে।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর হিন্দু সমাজের যেটি মিশ্র ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব ছিল, সেটি পরিপূর্ণ-ভাবে ক্ষয় হ'য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বিদ্বেষী "ইলিয়াস্ শাহী" বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশটির প্রধান কাজ ছিল রাজকীয় শাসন ক্ষমতায় যে সব হিন্দু নিযুক্ত ছিলেন, তাদিকে হয় ধর্মান্তরিত করা, না হয় তাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়ে, সেই সব জায়গায় দূরদেশ থেকে মুসলমান আনিয়ে উচ্চ পর্য্যায়ে রাজ্যশাসন কায়েম করা। তবে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনা ক'রে দুচার জন হিন্দুকেও তিনি শাসক পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চতুর্দ্ধশ শতাব্দীরও অন্তিম কাল এসে প'ড়লো। হিন্দুদ্বেষী মুসল-মান সমাজও বলশালী হ'য়ে পড়লেন। হিন্দু সমাজের সমাজ জীবনও তখন তান্ত্রিক ও বিকৃত বৈষ্ণব ধর্মের সন্ধিক্ষণে পড়ে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে, এবং তার বহু পূর্ব থেকেই তো হিন্দুদের খাঁটি বৈদিক আচার গিয়েই ছিল, আর সামান্য যা কিছু পড়েছিল, তা মাত্র কুলীন বা কৌলাচারী ব্রাহ্মণ্যপ্রভুত্ব। আর বাকী অন্যান্য বর্ণের মধ্যে তন্ত্রধর্মের সঙ্গে বিকৃত বৈষ্ণব ধর্মের এক কিম্ভূত কিমাকার সংমিশ্রণ সংস্কার চ'লছিল।

এই দুই ধরণের হিন্দুধর্মই কিন্তু রাজশক্তির কাছে উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং অত্যাচারিত হতে থাকে। বিধর্মী মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুদের দুটি সমাজকেই কিন্তু সমান ভাবে ঘৃণা ক'রতো এবং উৎপীড়িত ক'রতো। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ও তৎপরবর্তী কালে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সাহায্যে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শোনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোঠে তারে লৌহপাশে বাঁন্ধে।
দেউল দেহড়া ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী ॥
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাটি যত।
অশ্বত্থ পনসবৃক্ষ কাটে শত শত ॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। (১)
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছেঁ।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে।
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা!
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।

(চৈতন্য মঙ্গল, নদীয়া খণ্ড)

তখনকার এই সমাজ চিত্রটি জয়ানন্দ মিশ্রের রচিত বাস্তব অবস্থার। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব থেকেই এর সূচনা হ'লেও ঐ শতকের বাংলার সামাজিক উচ্চ বর্ণের লোকজনের পারিবারিক জীবন মুসলমান রাজশক্তির কাছে সর্বদা ভীতি ভাজন ছিল।

তার ফলে বাংলার উচ্চ বর্ণের বহুলোক স্বদেশ ত্যাগ ক'রে বাংলার বাইরে যেতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। ঐ সময় থেকেই গৌড়ের ব্রাহ্মণ জাতি নিজেদের মান রক্ষার জন্য রাজস্থানে উপনীত হ'য়ে সেখানকার সমাজে 'গৌড় ব্রাহ্মণ' নামে একটি সংহত ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। রাজস্থানে গিয়ে সেখানের আচারে তাঁরা অভ্যস্ত হ'য়ে যান, এবং বাংলার কুলাচার কৌলিন্য তাঁরা বর্জন করেন। সেখানে তাঁদের একমাত্র পরিচয় হয় 'গৌড়ব্রাহ্মণ'। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ইত্যাদি শ্রেণী দ্বন্দ্বের কোন কলহই তাঁরা রাখেন নাই। তাছাড়া কোন কোন ব্রাহ্মণ পরিবার আবার নিকটবর্তী উড়িষ্যা প্রদেশেও পলায়ন ক'রে জাতি মান রক্ষা করেন। (২) জয়ানন্দ তেমন ইঙ্গিতও করেছেন,—তখনকার অন্যতম মাননীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—

বিশারদ সুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য
সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য।

(১) এই গ্রামের বাসিন্দা ব্রাহ্মণগণই পরে "পিরালী ব্রাহ্মণ" ব'লে খ্যাত হন। (২) বিংশ শতাব্দীর ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে "উদ্বাস্তু" সংজ্ঞা যাঁরা পেয়েছেন, এ চিত্র তাদের কাছে জীবন্ত।

উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা
রত্ন সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা।
তাঁর ভ্রাতা বিদ্যা বাচস্পতি গৌড়ে বসি॥
বিশারদ, নিবাস করিল বারাণসী।

এমন চিত্রের ইঙ্গিতই ভাল। কারণ জয়ানন্দ তো সমাজ ইতিহাস লিখতে বসেন নাই। তিনি তখনকার সমাজের সাময়িক চরিত্র কেমন রূপ নিয়েছিল, আর সেই সমাজেই যে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল, তারই পটভূমিকা মাত্র দেখিয়েছেন।

তারপর যাঁরা বাংলা বা গৌড় ভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারেন নি, তাঁরা বাহতঃ কৌলিন্যের বড়াই ক'রেছেন কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থায় তাঁরা মুসলমানের অত্যাচার, এবং অতি গর্হিত ও বিরুদ্ধ কুল যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছেন। তাঁরা তাতে না পেরেছেন জাতি কুলের মান রক্ষা করতে; আর না পেরেছেন মুসলমানদের সঙ্গে মিশে যেতে, এদিকে অবহেলিত হিন্দু সমাজের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে সংস্কৃতিতে তাদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও নৈকট্য স্থাপন ক'রতে পারেন নাই। যার ফলে হয়েছিল কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে নানান্ দোষের উদ্ভব। কেশরকোনী দোষ, যবন দোষ, দুর্ব্বার খাঁ দোষ, পিরিলী দোষ, কোচ, পোচ, পোদ হেড়া, হালান্ত, রজক, কালুহাড়ী, বেড়ুয়া, পণ্ডিতরত্নী, শৌণ্ডীদোষ প্রভৃতি।

এই সব দোষ যখন বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজকে জীর্ণ ঝর্ ঝরে পাঁজরা সারে পরিণত করে দেয়, তখন এক মহান উদার ব্রাহ্মণ পুরুষের উদয় হয়, তাঁর নাম "দেবীবর ঘটক"। তিনি ব্রাহ্মণ সমাজকে ৩৬টি মেলে (মিলনাৎ মেল) বেঁধে দেন। মেলের অপর অর্থ হোলো যা ঘটেছে তাকে মেনে নাও, আর তার সঙ্গে উদ্ভূত নূতন সংকর সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির ব্রাহ্মণ্যকেও স্বীকার কর। এও এক ধরণের সহজিয়া সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নেওয়া। যুগে যুগে বাস্তবকে অস্বীকার করাই যায় না। নইলে বাংলার তথাকথিত সমাজের অস্তিত্বও যেমন থাকতো না, তেমনি নৈকষ্য কুলীনের গন্ধমাত্র সংকর ব্রাহ্মণ্যও থাক্‌তো না।

১৪০২ শকাব্দে বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই মেল বন্ধন সৃষ্টি করেন মহাত্মা দেবীবর ঘটক। তাহলে একটা কথা স্পষ্ট গলায় ব'লতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের আবির্ভাবের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই, তাঁর মনে যে সামাজিক সংস্কার সঞ্চিত হয়েছিল, সেইটাই তো সাহিত্য চনার অঙ্গ, উপাঙ্গ; প্রত্যঙ্গ এবং তার সঙ্গে সাহিত্য গঠনের শরীরগুলিও গঠিত হয়েছিল; এবং তা সমাজের যে স্তরে গঠিত হ'য়েছিল, সেগুলি ঐতিহাসিক নিরীখেও সুস্পষ্ট, এবং তাদের প্রভাব পড়াটাও যে খুব স্বাভাবিক সেটাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

সেইজন্য তাঁর আগে ও পরে যাঁদের জন্ম ও তিরোভাব, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে অল্প কিছুদিনের তফাৎ থাকলেও, তাঁদের রচনায় সমাজ বিবর্তনের ছাপ তো থেকেই যাবে।

তাছাড়া দেবীবরের মেল বন্ধনের ঘটনার সঙ্গে কার্য্য কারণ সম্বন্ধের যে ছাপ তাও তো থাকতে বাধ্য; এবং মুসলমানদের রাজশক্তির সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রভাব; এবং কুলীনদের সামাজিক প্রভাব, এবং তার পূর্ব্ব প্রভাবিত তান্ত্রিকদের প্রভাব, এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব, এ সবের অল্পবিস্তর ছাপ পড়বেই তো।

(১) ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রায় রামানন্দের জন্ম এবং আনুমানিক ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লোকান্তর।

(২) মতান্তরে ১৫৪০-১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্রের লোকান্তর।

(৩) ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅদ্বৈতের আবিভাব এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ অথবা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অন্তর্ধান।

(৪) ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব এবং ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনের সমাপ্তি।

(৫) ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এবং ১৫৪৫ অথবা ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অন্তর্ধান।

(৬) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অন্তর্ধান।

(৭) ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব এবং ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লোকান্তর।

(৮) ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরূপের আবির্ভাব এবং ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ।

(৯) ১৫১৭ বা ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম এবং ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃন্দাবন গমন।

(১০) ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীলোচন দাসের জন্ম এবং ১৫৬০ থেকে ১৫৬৬ অব্দে চৈতন্য মঙ্গল রচনা।

(১১) আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম অথবা ১৫১৯, কারও মতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লোকান্তর।

(১২) আনুমানিক ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবন দাসের জন্ম।

(১৩) আনুমানিক ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের সমাপ্তি।

(১৪) ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিত মহাকাব্যের রচনার সমাপ্তি।

এই সব সাল তারিখের হিসাব, বিভিন্ন গবেষকদের আনুমানিক হিসাব থেকে বিভিন্ন প্রকারে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে

অতএব এই সব প্রখ্যাত গ্রন্থকারদের লেখায় তৎকালের অহিন্দু-রাজ শাসনের আওতায় থাকা সামাজিক মানুষের মনের ছাপ প'ড়বেই প'ড়বে। তাছাড়া তন্ত্রোপাসক ব্রাহ্মণদেরও অন্যবর্ণের প্রতি যে উপেক্ষা অবহেলার প্রতিক্রিয়া, তাও নিশ্চয় ফুটে উঠবে, এটাও তো স্বাভাবিক। তাছাড়া তৎকালের তন্ত্রোপাসনার আভ্যন্তরিক সিদ্ধান্তও যে তাঁদের লেখায় অল্পবিস্তর ফুটে উঠবে তাও স্বাভাবিক। আর প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যার প্রচলিত বৌদ্ধতন্ত্রের আচার ও উপাসনা মূলক সিদ্ধান্তগুলিরও যে নমুনা

পাওয়া যেতে পারে, এমন সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক নয়। কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবনকালের মধ্যে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় উড়িষ্যায় অবস্থানের সময়, তাঁকে উড়িষ্যাবাসীরা তাঁদের অভ্যস্ত তত্ত্ববোধের মাধ্যমেই যে শ্রীচৈতন্যকে দেখবেন, তাও স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিকতার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর মনও যদি কিছুটা আক্রান্ত হয়ে যায়, এমন ছায়াও যদি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়, তাও খুব স্বাভাবিক। আর যে সব সিদ্ধান্ত বাংলার অধিবাসী লেখকদের মধ্যে একটুও দেখা দেয় নি, সে সব সিদ্ধান্তে আকর জানার কৌতূহল তো থাকবেই।

পদ পদাবলীতে কুল ও সমাজের চিত্র।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই অথবা তারও পূর্ব থেকেই কৌলিন্যগর্বী ব্রাহ্মণ সমাজের অন্য বর্ণের প্রতি উপেক্ষা বা অবহেলায় যে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হ'য়ে ফুটতো, তার ছায়া বৈষ্ণব পদ পদাবলীতে পাওয়া যায়।

এ মন! কি করে বরণ কুল
যেই কুলে কেন জনম হউক না কেবলই ভকতি মূল
কপিকুলে ধন্য বীর হনুমান শ্রীরাম ভকত মাঝ।
রাক্ষস হইয়া বিভীষণ বৈসে ঈশ্বর সভার মাঝ
দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমি ভুবনে রাখিল যশ।
বলনা কি কুল বিদুরের ছিল খাইল যাহার ঘরে॥
দেখনা কেমন সাধনা করিল গোকুলে গোপের নারী॥
জাতি কুলাচারে তবে কি করিল সে হরি যে ভজে তারি।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ যে করে গরব নিতান্ত মূরখ ভাই॥

* * *

মুরারি গুপ্ত কয়, পীরিতি সহজ নয়, বিশেষ গৌরাঙ্গ প্রেমে জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবে শচীর বালা॥

* * *

চলরে স্বরূপ চল যাই, সুরধনী জল এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক্ কুলমান আর না রাখিব প্রাণ তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া॥

* * *

তরুণ নয়ানের কোণে চাঞা ছিল-আমাপানে
পরাণে ব'ড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারে খারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি যাইনু ঘরের বাহির হৈনু
শুনি খোল করতালের নাদ॥

লক্ষীকান্ত দাস কয় মরমে যার লাগয়
ইহা কি করিবে কুল পরিবাদ ॥

—•—

আন সনে কথা কয় আন জনে মুরুছায়
ইহা কি শুনেছ সখি কানে ?

(১) এই পদটি অপ্রামাণ্য, কারণ নবদ্বীপে 'স্বরূপ' নামে কোন বন্ধু ছিলেন না শ্রীগৌরাঙ্গের।

একুল ওকুল মোরা দুকুল খাঞ ছি গো
হয় নয় বংশীদাস জানে ॥

এই সব পদাবলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, উপাস্যের লীলা প্রসঙ্গের মধ্যে, সর্বত্রই কুলের প্রতি জাতির প্রতি পূর্ণ অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জাতি কুলের মধ্যে উপাসনা রহস্যটিকে টেনে আনার ভিতর নিশ্চয় কোনও এক বিশেষ সংস্কার সম্পন্ন সামাজিক মনের ছাপ ফুটে ওঠে।

জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞান দাস কহে দৃঢ় করি যান বুক ॥

—•—

মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিনু হরি
তিলাঞ্জলি দিনু কুল লাজে ॥
(অনন্ত দাস)

সে জন পড়ে তোর মনে,
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলে চাহিয়া তাহার পানে।
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে কালিয়া প্রেমের মধু।

—•—

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ *

† বাংলায় তখন 'সহজিয়া'দের পরকীয়া রতির আস্বাদ পাওয়ার ভাব বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই পদ পদাবলীর বাণীই তার সাক্ষ্য দেয়।

—•—

তারপর বহু বিতর্কিত চণ্ডীদাস নামটির সঙ্গেও জাতি কুল, শব্দগুলি তাঁর পদ পদাবলীতে বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমাজের বাস্তব ছবিটিই প্রকটিত হ'য়েছে।

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।

শিব-বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন
যাচিয়া বিলায় জগজনে।
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন ক্ষীণ জাতি
গুণ শুনি কাঁদে জগজন
অগেয়ান পশুপাখী তারা কান্দে ঝরে আঁখি
কি দিয়া বান্ধিল সবার মন ॥
রাজা ছাড়ে রাজ্য ভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান রস,
কিবা বলরাম হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
হেন রস না কৈল পরশ ॥

—•—

পরমাকিঞ্চন নরগণ করুণা বিতরণ শীলম্
যোঽতি দুর্মতি রাধামোহন নামক নিরুপম লীলম্।

—o—

দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুখ জানে
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে।
পাপী পাষণ্ডী মত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ ॥
(বৃন্দাবন দাস)

একদিকে মুসলমানদের রাজনীতি ও হিন্দুদের সঙ্কর ব্রাহ্মণ্যের তান্ত্রিক শাসন, আর অপরদিকে কুলীনদের মধ্যে নিজের কৌলিন্য গর্বিতা এবং তার সঙ্গে হিন্দু সমাজের অবহেলিত সমাজের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ। এই চিত্রটিই তো এই সব পদাবলীতে ছড়িয়ে আছে।

এই অবস্থাটি যে বাংলার হিন্দু সমাজকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তার পরিণাম যে কি হতে পারে, তেমন দূরদৃষ্টি তৎকালে কারোর মধ্যেই বিকাশ পায়নি। অথচ সমাজ তো নিষ্ক্রিয় থাকে না কখনও, সকলের সমন্বয় না হলেই তাতে ভিন্ন পথেরই সৃষ্টি হয়।

একটি ঐতিহাসিক ধর্ম ও জাতির উৎপত্তি

এমনই হয়েছিলো স্মরণাতীত কালে দাক্ষিণাত্যে এবং গুজরাটে। আর তারই পরিণামে সেখানে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল; যেটি পরে বংশগত হয়েছিল এবং জাতির পরিচয়ে তা প্রকটিত হয়েছিল; তাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকৃত সেই ধর্মের নাম সাত্বতধর্ম।"

সেই সাত্বত ধর্মটি পরে আবার "ভাগবত ধর্মে" রূপান্তরিত হয়। সাত্বত ধর্ম এবং ভাগবত ধর্মকে একীকৃত করেছিল পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়েরই নামে প্রচলিত "পাঞ্চরাত্র সংহিতা।" সে সংহিতার যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়, তাতে 'ভক্তিরই' প্রাধান্য।

পাঞ্চরাত্র সংহিতায় অভিমতটি গ্রহণ করেই সম্বত জাতি ও যদুবংশেরও যেমন অস্তিত্ব, তেমনি তাঁরা ভাগবত বাদী সম্প্রদায় বলেও খ্যাত হয়েছিলেন। এই ভাগবত-ধর্ম ব্যক্তি পূজাকেও সমর্থন করে, আবার বিশ্বমানবতা, বিশ্বপ্রকৃতির পূজাকেও সমর্থন করে, তাছাড়া সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী, এবং জাতি ও বর্ণের মধ্যে থেকেও ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করা যায়, আবার না থেকেও গ্রহণ করা হয়। এক কথায় বলা যায় 'ভগবানের ধর্মই ভাগবত ধর্ম।' বিষ্ণু, শিব, রুদ্র, ব্রহ্মা, সূর্য, গণপতি প্রভৃতির ব্যক্তি পূজায় থেকেও ভাগবত ধর্মের আশ্রয় করা যায় : কারণ যাঁর 'বিশ্বরূপ' নাম, তাঁর তো সবই অঙ্গীকার করা রয়েছে, এ কথা মেনে নিয়ে ভগবানের রূপ স্বীকার ক'রেও ভাগবত, ধর্মে ডুবে যাওয়া যায়।'

এই ভাগবত ধর্ম্মের বঙ্গীয় সংস্করণ

এমনি ভাগবত ধর্মই পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার হিন্দু সমাজেও কিছু কিছু দেখা দেয়। এটির প্রামাণ্য নজীর দেখা যায় কবি কর্ণপুরের রচিত শ্রীচৈতন্য 'চন্দ্রোদয়' নাটকের ২য় অঙ্কে। এই নাটকখানি ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত।

নাটকটির ঐ অঙ্কে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের প্রশ্নের ভূমিকায়, 'বিরাগ' জিজ্ঞাসা করেছেন ভক্তিকে, আর তার উত্তরে ভক্তি ব'লেছেন—"বিরাঅ! এতস্মিন্ কলিকালে কণিঅ লেশমেত্তং বির্মাত্তরং নত্থি, নত্থিরদরং কিম্পিহোই, কে অলং অলং করেদি এদং কলিং ভ অবদ্ধমো বন্ধং মোহং বি পন্নাকরে দিত্তি সাহণ সদ্ধসদ্ধম্ম সুদ্ধ ভত্তিজো এণ এসাং অবহার এবং কলিমল সলন আরিণা আচানতালং চণতালং ঘাণ দুর্বাসনা সেন সঙ্গোপাঙ্গও মাদিদীও ভক্তি দেঈও সঙ্গে কদুঅ ভ অবদা-অ অদারো কিদো ভত্তবেসেন।"

"ওহে বিরাগ! এখন এই কলিকালে কোনও ধর্মই জীবিত নাই। কারণ প্রত্যেক ধর্মের ধার্মিকরাই অপরের ধর্মকে গালাগালি ক'রছেন, প্রত্যেকেই অনৈক্যের সৃষ্টি ক'রেছেন। কেউ ধর্ম আশ্রয় ক'রে স্থির থাকতে পারছে না, এ ক্ষেত্রে একমাত্র ভাগবত ধর্মই জীবিত আছেন। ভাগবত ধর্ম সকলের সংসার বন্ধন আর মোহ বন্ধন ছিন্ন ক'রতে পারে। কলির তাপ ও পাপের সংহত ক'রতে পারেন ভাগবৎ ধর্ম। যে কোনও সাধনাতেই ভাগবত ধর্মের উদয় হয়। আর বিশুদ্ধ ভক্তি যোগেই তাঁর অবস্থান হয়। চণ্ডাল প্রভৃতি সব জাতিরই দুর্বাসনা জনিত দুঃখ তাঁরা নষ্ট করেন।'

এই হোলো ভাগবতী সাধনা, এর অপই নাম "ভাগবত ধর্ম", সেই ভক্তিধর্মকে বা ভাগবতধর্মকে সঙ্গে নিয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। অথবা সময়োচিত সমাজে সেই ভাগবত ধর্মের 'উজ্জীবন' ক'রতেই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব :

তারপর কর্ণপুর আরও দেখিয়েছেন ভাগবত প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত হোলো শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব। তিনি তাঁর প্রকট বিহারের সময় "অন্ত্যজবর্ণ" হিন্দু অপেক্ষাও অস্পৃশ্য যবন দরজীটিকে মাত্র দর্শন দান ক'রেই, তাকে নির্মুক্ত সংস্কার ও ভগবদ্ভাব প্রেমে মত্ত ক'রেছিলেন। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনই হোলো ঐ জন্য।

বিরাগ : —

কথময়ং নীচ যোনিঃ এতাদৃশসৌভাগ্য ভাজন মাসীৎ ?

ভক্তি : = (সংস্কৃতেন—)

(ন জাতি-শীলাশ্রম-ধর্ম-বিদ্যা-কুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদঃ।
যাদৃচ্ছিকোঽসৌ বত নাস্য পাত্রাপাত্র-ব্যবস্থা-প্রতিপত্তি রাস্তে।)

(চৈঃ চন্দ্রোদয় নাটক ২ অঃ ২৬ শ্লোক) বিরাগের প্রশ্ন=

এই দরজী যবন অতি নীচ জাতি হ'য়েও এমন সৌভাগ্য ধনের অধিকারী হ'লো কমন করে?

ভক্তির উত্তর = কেন হবে না? করুণাময় ভগবান যে কারও জাতি কুল ধর্ম দ্যা প্রভৃতির অপেক্ষা না ক'রে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না ক'রে, সকলের প্রতিই অব-লাক্রমে প্রসন্ন হন।

এ প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রে কর্ণপূর তাৎকালিক সমাজের মানুষগুলির সঙ্গে ভগবানের ক্ষাৎ সম্বন্ধের চিত্র অঙ্কন ক'রেছেন। যে সম্বন্ধটি এতদিন মানুষের তৈরি জাতি ও র্ণ-ধর্মের বাধা নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে পারে নি।

পঞ্চদশ শতকের বাংলার পণ্ডিত সমাজ

তারপর কর্ণপূর আরও দেখিয়েছেন যে, বাংলার মানুষগুলির মধ্যে যে প্রাচীন বর্ণা-মের ধারা অনুসৃত হোতো, তা এক ধরণের প্রহসনে প্রচলিত, সে এক বিচিত্র রূপ রণ ক'রে আছে এবং যা বর্তমানেও র'য়েছে।

"যাঁরা ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত, তাঁদের আশ্রমোচিত গুণগুলি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে য়েছে, আর তাঁদের আকার ও আচরণে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তা তাঁদের একটি ত্র চিহ্ন পৈতাটুকু. আর আচরণের চিহ্ন ষষ্ঠ কর্মটি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আচরণ, যজন, জন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ করা।

সেই ছয়টির মধ্যে শেষের আচরণটি হোলো প্রতিগ্রহ করা অর্থাৎ পরের কাছে দান ওয়া, এই টুকুতেই তাঁদের আগ্রহ বেশী দেখা যাচ্ছে। তারপর ক্ষত্রিয়ের প্রধান জ ধরণীর পালন, তা তাঁদের তা গিয়েছে অনেক দিন, এখন ওই ক্ষত্রিয় নামটুকু ত্রই তাঁরা ধারণ করে আছেন। আর বৈশ্যরা তো পুরো বৌদ্ধই হ'য়ে গিয়েছেন, কী থাকে শূদ্র। তাঁরাই হয়েছেন এখন পণ্ডিত অভিমানী এবং তাঁরাই এখন ধর্ম-স্ত্রের উপদেশক।

আরও বিচিত্র হয়েছে আশ্রম ব্যবস্থায়। যাঁরা বিবাহে অসমর্থ তাঁরা হয়েছেন হ্মচারী। যাঁরা বৌ, ছেলে, মেয়ে, নিয়ে উদর পোষণ ক'রতে পারছেন তাঁরা হয়েছেন হী। আর বানপ্রস্থ আশ্রম? সে তো শোনা কথামাত্র, কেউ সে আশ্রমে নেই, কী থাকে সন্ন্যাস আশ্রম? তা সে আশ্রমে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পরিচয় এখন চাঁদের বেশভূষায়।

"ষষ্ঠে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ, সূত্রৈক চিহ্না দ্বিজাঃ
সংজ্ঞা মাত্র বিশেষতো ভুজভুবো, বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধাইব।
শূদ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো, গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব, কলিনা হা হন্ত। সম্পাদিতা॥

বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ, কতিচিদাত্মাশ্রমো যুষো
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদর ভরণ মাত্র ব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থা শ্রবণপথ মাত্র প্রণয়িনঃ
পরিব্রাজো বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্‌॥

তারপর কর্ণপুর দেখিয়েছেন 'পণ্ডিত' নামক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিরা তখনকার সমাজে পরম মাননীয় ব'লে খ্যাত হ'তেন; কিন্তু তাঁরা দেশের এবং সমাজ, ইতিহাস, ভূবার্তা, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, রসায়ণ বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শিল্পকলা, দেশের স্বাধীনতা, পরাধীনতা ইত্যাদি কোন কিছুরই সংবাদ রাখেন না। (আজও সংস্কৃত ভাষা ব্যবসায়ী টৌলিক পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রায় এই রকম।) তাঁরা জন্মাবধি জানেন জাতি, (ন্যায় শাস্ত্রের পরিভাষা) অনুমিতি, উপাধি, ব্যাপ্তি ইত্যাদি তার্কিক আলাপ এবং কল্পনা শক্তির সাহায্যে সাহিত্য চর্চা।

সভ্যা স্থ্যঃয উপাধি জাত্যনুমিতি ব্যাপ্ত্যাদি শব্দাবলেঃ
জন্ম্যারভ্য সুদূর দূর ভগবদ্‌ বার্তা প্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিক কল্পনাকুশলিন স্তে তত্র বিদ্বত্তমা
স্বীয়ংকল্পনমেষ শাস্ত্রমিতি যে, জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ।

তখনকার বাংলার সমাজের এই মনস্তত্বটি, প্রতিটি মানুষের মনকে যে ভাবে আক্রান্ত করেছিল, তার প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপিত ক'রে বলা যায় যে, রাজনীতি বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা সহজেই যে বাংলার রাষ্ট্র শক্তিকে আয়ত্ত ক'রবেন এ তো সহজেই অনুমেয়। শুধু অনুমান গম্য নয়, বরং বলা যায় এটি ঐতিহাসিক। যে কারণে অ-হিন্দু রাজশক্তি বাংলাকে অল্প আয়াসেই গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।

তেমন রাজশক্তি এবং ছন্নমতি সমাজের অভ্যন্তরে যাঁরা বাস ক'রতেন, তাঁদের মন যে একটি নূতন বর্ণ, নূতন আশ্রম, নূতন ধর্মকে আশ্রয় করার জন্য আঁকুপাঁকু ক'রবে, সে কথা কি আর বিস্তৃত ক'রে বলতে হবে ?

এমনি অবস্থা ঘটেছিল অতি প্রাচীন ভারতেও। যে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয় ধর্মের উগ্র সংগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ক্ষত্রিয়, দরিদ্র বৈশ্য ও উপেক্ষিত অবহেলিত শূদ্রের সমাজ পঙ্গু, অন্ধ, বধির হ'য়ে এক মহাবল মহাকারুণিক এবং মহান জনসেবকের উদার আশ্রয় ও নির্দ্বন্দ্ব ধর্মের আশ্রয় খুঁজেছিল। তারই জন্য তারা পেয়েছিল সেদিনের বুদ্ধকে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধের অহিংস সংগ্রামে ছিল না বর্ণ আশ্রমের প্রাধান্য এবং সে প্রাধান্য প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল, ফলে ভারতবাসী এক নূতন জীবনের আস্বাদ লাভ ক'রে দিকে দিকে মহাবলশালী গণরাষ্ট্র স্থাপন করার প্রয়াস পায়।

কালে তাঁরা এক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থেকে পুরাতন সমাজের একনায়কত্বও বিলুপ্ত করে দেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ আশ্রম অনুরাগী পুরাতন সমাজের চিহ্নগুলিও সবেগে মুছে দিতে থাকেন। কিন্তু ভারতের দিকে দিকে গূঢ়ভাবে যে অন্ধকার গাঁট বেঁধে লুকিয়ে ছিল, সেগুলি আবার অনুকূল বাতাসের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা ক'রছিল। সে অপেক্ষা সুদীর্ঘ আটশত বৎসরেরও বেশী।

এরই ধীর পরিণতিতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর ভারতে ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধ ও তন্ত্রাচারে মিলিত হয়ে, আর একটি নূতন শ্রমণ ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। যারই প্রতিচ্ছবি পরবর্তী ভারতের ঐতিহাসিক চিত্রে সুস্পষ্ট এবং আজও তা আমাদের কাছে সমুজ্জ্বল। প্রতিটি প্রদেশের সমাজেও তার চিহ্ন আজও দেখতে পাচ্ছি। সেই ভারতে এমনই একটি সমাজ পরিবেশ এবং এমন একটি নূতন ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল, যেটির বৈশিষ্ট্য পুরাতন হলেও নূতন, সেইটিই ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্ম, কোন ব্যক্তি পূজকেরও নয়, কোন সাম্প্রদায়িকেরও নয়, সেটি বর্ণাশ্রম ধর্মের ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যবর্তী ধর্ম। ভাগবত ধর্মে বর্ণাশ্রম ধর্মকে এড়িয়ে যাওয়ারও তথ্য আছে, আবার বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের মৌলিক তথ্যকে স্বীকার ক'রে, তাদের বাহ্য আচারগুলিকে পরিহার করারও তথ্য আছে, তা-ছাড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান উপজীব্য যে যাগযজ্ঞ, তাকে অবহেলা করারও যেমন সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, তেমনি যাগযজ্ঞের শাব্দিক বোধমাত্রকে জীবিত রেখে বিষ্ণু, হরি, শিব প্রভৃতির নামের কীর্ত্তন করাও যে যাগযজ্ঞের একটি দিক, এ তথ্যও সন্নিহিত করা আছে। অর্থাৎ সময়োপযোগী জনধর্ম বা গণধর্ম।

সেই ভাগবত ধর্মের সব তথ্যই যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি আবার বর্ণাশ্রমিক স্বীকৃতি দেওয়ারও রীতিও তাতে আছে। এই জন্য বর্ণাশ্রম প্রধান বৈদিক বিষ্ণু ধর্মাশ্রয়ী বৈষ্ণব শ্রীরামানুজ ভাগবত ও ভাগবত ধর্মের কোন নামই উল্লেখ না করে, ঠিক যাতে বৈদিক ধর্মের চিন্তা আছে ভাগবতে তেমন কথাও বলেন নাই। তিনি ছিলেন ১১ দশ শতাব্দীর অন্যতম মহাপুরুষ। তাঁর পন্থা অনুশীলন ক'রলে দেখা যায়—বর্ণাশ্রম ও ভাগবত ধর্মের মিলিত তথ্য দিয়েই শ্রীরামানুজের বৈষ্ণব ধর্ম গঠিত হয়। যাতে বৈদিক বিষ্ণুর উপাসনার প্রাধান্য এবং সেই ভাবেই যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা, তাই করেন।

কিন্তু মৌলিক তথ্য হিসাবে দেখা যায়, তখনকার বর্ণাশ্রমে যেমন কিছু তন্ত্রাচার ও বৈদিক আচারের সমন্বয়ে একটি মিশ্রধর্ম গঠিত হয়েছিল, তেমনি আরও কিছু হয়েছিল সেই বর্ণাশ্রমের সার সংগ্রহ করেও নৈর্ব্যক্তিক ভাববাদ, আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক পূজাবাদের সমন্বয়ে ভাগবতবাদ। এরই সাম্প্রদায়িক রূপ শ্রীরামানুজের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম (যেটিতে মন্ত্র, পূজা, গুরু, অবতার চক্র বা সাম্প্রদায়িক আচারের প্রাধান্য আছে, যা তন্ত্রাচারেরই পরিণত রূপ) তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুর উপাসনা বাদেরও সমন্বয়। এতেই তিনি বৈষ্ণব ধর্মের সমুৎপত্তি দর্শনের একটি মতও স্থাপন করেন। তিনি ভাগবত সম্প্রদায়কে উপেক্ষাও করেন নি, আর অপেক্ষাও করেন নি। এই ভাবেই ভারতে ধর্মীয় অভিযান বহুমুখী হ'য়ে প্রচলিত হয়েছিল, ৯ম শতাব্দীর পর থেকে।

তৎকালে যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য রেখে, ভারতের হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ক'রতে চাইতেন, তাঁদের অভীপ্সাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে যে সব সংহিতা গ্রন্থের প্রচলন হয়, তাদের মধ্যে "ভাগবৎ" বাদ ছিল নিন্দনীয়।

অত্রি সংহিতার বচন দেখলেই একথার প্রমাণ মেলে।—

বেদৈ বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ।

পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥
(অত্রি সংহিতা ৩৮২ শ্লোক)

অর্থাৎ—যারা বেদপাঠের যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পারে না, তারা শাস্ত্র '
করে। (শাস্ত্র মানে পুরোহিতের পাঠ্য স্মৃতিশাস্ত্র) আবার যারা শাস্ত্র পাঠের যোগ্যতা '
না, তারা করে পুরাণ পাঠ। (এরা কথক ঠাকুর) আর যারা পুরাণ পাঠেরও যোগ্য
অর্জ্জন ক'রতে পারে না, তারা করে কৃষকের কাজ। তারা বৈশ্য ব্রাহ্মণ।—

এই কৃষক ব্রাহ্মণের লক্ষণ ঐ অত্রি সংহিতার ৪১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে—

কৃষিকর্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে।

তারপর কৃষকের কাজের যোগ্যতাও যাদের থাকে না, তারা হয় "ভাগবত ব্যক্তি
এঁরা সর্বত্র ভ্রষ্ট চরিত্রের, তাই তারা তখন ভাগবত।

এদিকে ভাগবত বাদিরাও যে সব সময় বর্ণাশ্রম ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে এবং বি
কোন ব্যক্তি পূজার ধর্মকে, যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ধর্মকেই ভাগ
ধর্ম বলেছেন তাও নয়; এর প্রমাণ তো দেখা যায় সমগ্র ভাগবত পুরাণেই। ভাগব
বাদীরা সকল ধর্মকেই মেনে নিয়ে, তার থেকে স্বতন্ত্র একটি ভাগবত ধর্মের যেমন প্রব
ক'রেছেন, তেমনই ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে সমন্বয় ধর্মকে সমগ্র ভাগ
পুরাণে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন।

শ্রীরামানুজের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অবলম্বনীয় গ্রন্থ 'বিষ্ণুপুরাণ' ও
বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা যেমন আছে, তেমনি ভক্তের আচরিত লোক ধর্মেরও সম
পুরোপুরি আছে। ধর্মের এটিই একটি নয়, এর সঙ্গে পুরোহিতদের যাবতীয় স্মৃতি
তাদেরও সমর্থন র'য়েছে এমনি ভাবে প্রায় সবই তাঁদের ধর্মগ্রন্থের মঞ্জুষা। পুরাতন
যা ছিল একদিন তন্ত্রাচার, পরের নাম হোলো হিন্দু আচার।

অপরপক্ষে ভাগবত ধর্মের অবলম্বনীয় গ্রন্থটির নাম ভাগবত পুরাণ এবং তৎচি
সমর্থক অন্যান্য। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, বিষ্ণু পুরাণে যেমন
অর্হৎ প্রভৃতির নাম ও বন্দনাকে উপেক্ষা ও বিদ্বেষকরার কথা রয়েছে, ভাগবত
তেমনটি নাই, বরং তাঁদের নামাবলীকে ক্রম প্রাপ্ত হিসাবে নিবদ্ধ করে, তাঁদি
অবতারের পদে বসিয়ে পূজা করা হয়েছে।

অতএব নিঃসঙ্কোচে এবং প্রামাণ্যের তথ্য উপস্থাপিত করে ইতিহাস দিয়ে বলা
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের ষোড়শ শতাব্দীর কালটিই
ভারতে ত্রিমুখী ধর্মের প্রবহন কাল। তবে অপেক্ষাকৃত লঘুবল ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাগ
ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসরণ।

কিন্তু সেই যে ত্রয়োদশ থেকে শুরু হ'য়েছিল বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব
মুসলমান শাসনের ফল, সেটা মোছেনি এবং তার ফল যে ভাল হয়নি, তা পরি
বোঝা যায়।

বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যেও উন্নত, অবনত, পংক্তি, পাংক্তেয়, মান্য ও

লিত ইত্যাদি নানা প্রকার ভেদের দ্বারা মানুষের ভেদতান্ত্রিকতা থাকায়, সে গুলিকে াবার ঈশ্বর প্রণীত ব'লে যাঁরা প্রচার ক'রতেন, তেমন সমাজে যদি মানবের কল্যাণ ধিত হোতো, তা হ'লে সে কল্যাণকে উপেক্ষা ক'রে এবং কুলমানকে বিসর্জন য়ে, গৌরাঙ্গ নিতাইয়ের নির্বাধ প্রেমকে পাবার জন্য সে সমাজ কেন আকুলি বিকুলি 'রেছিল ?

আসল কথা, বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের আওতায় থাকা মানুষের দল বুঝেছিলেন যে, এই রণের বর্ণাশ্রম ধর্ম ঈশ্বর প্রণোদিত নয়। এটা কায়েমী স্বার্থবাদী পুরোহিত গোষ্ঠির বর্তিত ধর্ম, তাঁদের এই ধরণের অনুভব কিন্তু তখনও কোন প্রাত্যক্ষিক বিদ্রোহের রূপ য়নি। অর্থাৎ সমাজের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিতে ারতেন তোমরা নির্ভয় হও, আমাকে অনুসরণ কর।

তবে কেউ কেউ কোথাও কোথাও উচ্চবর্ণের পণ্ডিতদের মুখে গীতাগ্রন্থের প্রবক্তা লে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর চারটি ছত্র শুনতে পেতেন। "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং জ। অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।" কিন্তু এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা চলতো, তা আজও সেই বিকৃত বর্ণাশ্রমেরই ব্যাখ্যা করে থাকেন। এতে তাঁরা এমন টা জাল বিস্তার ক'রে লোককে বোঝাতেন এবং বোঝান, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে ক দুর্বোধ্য ব্যাপার। কেউ সাহস ক'রে বলেন না, এবং ব'লতেনও না যে, সব ড়ে কৃষ্ণনাম গেয়ে কৃষ্ণ ধর্মের আশ্রয় কর, আর কৃষ্ণধর্ম ও কৃষ্ণ এবং মানব প্রেম অভিন্ন, াকেই আশ্রয় কর।

—নূতন ধর্ম প্রচারক—

এই জীবপ্রেম ও কৃষ্ণপ্রেমের অভিন্নতা জ্ঞাপনের প্রথম উদ্গাতা বাংলার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর অভিন্ন হৃদয় শ্রীনিত্যানন্দ।

কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরবর্তীকালে (শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের) াদের জীবন চর্য্যায় যাঁরা একাত্ম চিত্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের জীবন ধুর্য্যের সৌরভ বহন করা ছাড়া, নবোদ্ভূত উপাস্য তত্ত্বের বিচারণাকে একমুখী করাবার ং প্রকৃত তথ্যের দিক থেকে তাঁদিকে একীভূত করার, কোনও বিশেষ সংবাদই উপন্যস্ত য়েন নি, তবে কেউ কেউ যেটুকু করেছিলেন, তা যেন নিতান্ত পৌরাণিক রীতির সঙ্গে লৌকিক কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন করার তাগিদে। তবে, এরকম করার কারণও ছিল, তো পৌরাণিক প্রতিভাকে অতিক্রম করে, স্বতন্ত্র প্রতিভার এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিকে অবলম্বন ার পন্থা না পাওয়া, এবং সমাজের সঙ্গে যুগধুরন্ধর নেতাকে অভিন্ন ক'রে দেখানোর তিভার অভাবেও।

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রসঙ্গে—

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সময় বৃন্দাবনে অবস্থান ক'রছেন ন তিনি একখানি "গোবিন্দ লীলামৃত" মহাকাব্যের রচনা শেষ করে, তত্রস্থ বহু াত্মার অনুরোধে শ্রীচৈতন্যের জীবনচর্য্যা ও তাঁর প্রচারিত ভাবধারাকে অবলম্বন রে বাংলা ভাষায় একখানি নূতন গ্রন্থ রচনা ক'রলেন (এমনি উক্তি চরিতামৃতেই য়েছে)। কিন্তু তাতে তাঁর মানস আধার যে ভাবে গঠিত ছিল, তাতে বাংলার তৎ-

কালীন সমাজে বিধর্মীর শাসন এবং পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের প্রভাব ছিল এটা স্পষ্ট। তাছাড়া, ইতিহাসের পারম্পর্য্যের দিক থেকে, কিংবা বাস্তবের দিক থেকে বিচার ক'রেও আমরা পরিষ্কার জানতে পারি, তঁার মন প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে নি, এবং তিনি পুরাণের সংকর তথ্যগুলিকে খঁাটি ঐশ্বরিক বিকাশ ব'লেই মনে ক'রতেন। অর্থাৎ যা প্রক্ষিপ্ত, তাও শাস্ত্র বলে মনে ক'রতেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ব'লেছেন, আর ব্যাসও তা লিখেছেন, কিংবা স্মৃতিতে ধারণ ক'রে রেখেছিলেন, পরে তাই লিপিবদ্ধ ক'রেছেন এই ধারণাই তখনকার লোকের বেশী ছিল। (অবশ্য এখনও সে সম্বন্ধে অনেকের মন যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। তবে এখন অনেকটা সতর্ক হ'তে পেরেছেন। কারণ বিশ্বের বস্তু বিজ্ঞানের বোধ মানুষকে সত্য নিরুপণের পথে অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছে) এর অন্য একটা কারণও ছিল, সেটা নিরক্ষরতা। মধ্য যুগটাই ছিল অতি লৌকিক সত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রবণতার যুগ। তাঁরা ভাবতে পারতেন না, কোনও মহানের জীবন ও জীবনীর চর্চা অতি লৌকিক সত্বায় গঠিত হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের প্রামাণ্য-তথ্যগুলির সাক্ষ্য দিতে, বহু পুরাণের বচন তোলার গুরুত্ব দিতে হ'য়েছে, অথচ সেগুলির সবই যে খাঁটি নয়, বহুলাংশেই কল্পিত তেমন বিচার করেন নি।

তাছাড়া মন্ত্র, অবতার, রহস্য, আত্মিক ভেদ ও ঈশ্বর মূর্তির মধ্যে ছোটো বড় ভেদ, এবং নিজের ধ্যেয় মূর্তির পায়ের তলায়, অন্যান্য দেব দেবীরা দেহগত অবস্থায় এসে প্রণাম বন্দনা ও নিজের অযোগ্যতাগত দোষ খ্যাপন ক'রেন, নিজের ন্যূনতা স্বীকার করার যেসব কাহিনীর উপন্যাস সে সব স্থাপন করার জন্য যে জাতীয় মনের সংস্কার থাকে, তেমনি মন তিনি তৎকালের সমাজে থেকেই পেয়েছিলেন, লেখাতেও তঁার সেই সংস্কারের ছাপ প্রতিচ্ছত্রে।

তারপর যে সমাজে আমার উপাস্যকে আমার মত অন্য যদি কেউ না দেখে, কিংবা তঁাকে উপেক্ষা করে, তবে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিশপ্ত হয়, অপরাধী হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনি ধরণের ভাব সাধনার স্তরেই যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন আবদ্ধ ছিল চরিতামৃতের বহু পংক্তিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেই জন্যেই পূর্বে বলেছি যে, কোনও লেখকের সৃষ্টি যে তার মনেরই ছায়া এ তো স্বাভাবিক। সেই মনের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে অতীতের প্রবাহিত ও তৎকালের সমাগত সমাজের বাস্তব সংস্কার।

পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জবানীতেই পাওয়া যায়, শেষ জীবনেই তিনি শ্রীচৈতন্য শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের শ্রীচৈতন্য আর তঁার পূর্ববর্ত্তী লেখকদের গ্রন্থাবলীর শ্রীচৈতন্য এবং তঁার ভক্ত পরিবার যে এক আধারে এক ভাবেই বিদ্যমান, তা কিন্তু চেনা যায় না। শ্রীকবিরাজের শ্রীচৈতন্য আরও স্বতন্ত্র অতি লৌকিক ও স্বতন্ত্র ধরণের এবং তঁার শ্রীনিত্যানন্দ এবং সমগ্র ভক্তমণ্ডলী এবং তঁাদের উপাস্য ও উপাসনার পন্থাও যে ভিন্ন ধরণের সে পরিচয় তো প্রতি ছত্রে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গৌরাঙ্গ ও তাঁর সম্প্রদায়ের বক্তব্য এবং তাঁদের আচরণ, পৌরাণিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও ভিন্নরূপে এবং তত্ত্বময় আধারে প্রতিষ্ঠিত। এটিকে প্রামাণ্য ক'রতে প্রধান ভাবে রামায়ণ, মহাভারত থেকে আর

করে ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণগুলির উক্তিকে, কবিরাজ গোস্বামী অবিচলিত মানসে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার ক'রেছেন। কিন্তু তাঁর এমন ধারণা আসার কোন প্রসঙ্গই ঘটে নি যে, সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে, প্রত্যেকটিই যে বেদব্যাসের রচিত নয়, ব্যাসের নামে আরোপ মাত্র এবং সেগুলি যে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর পর থেকে রচিত হ'তে হ'তে চতুর্দশে এসে থেমে গিয়েছে, তেমন চিন্তাও তিনি করেন নি। অথচ সেগুলির আভ্যন্তরিক বিকৃত তথ্যের ছাপে এবং অনেক বিকৃত তথ্যের দ্বারা পূর্ণ হয়ে, হিন্দুর পবিত্র সংস্কৃতিটিই বিপন্ন হ'য়ে আছে।

অর্থাৎ বেদব্যাসের নামে আরোপিত গ্রন্থগুলির সিদ্ধান্ত ও কাহিনীগুলির মধ্যে, আবিষ্ট শক্তির প্রাধান্যই যে বেশী করে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে যে অতিসত্তার চিন্তায় প্রভাবিত ক'রে রাখা হয়েছে, এ বিচার পূজনীয় কবিরাজ মহাশয় করেন নি বরং তাঁদের কর্মকে ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন ঈশ্বরই, এ সিদ্ধান্তে কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন অটল। এ ধরণের বিশ্বাস উপস্থিত হবার কারণ ছিল সুদীর্ঘ কালের বিকৃত ব্রাহ্মণ্য-বাদ ও বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বাদের পরস্পর সম্মেলন ও সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের কৃতি কার্য্যে'র আসল বক্তব্যকে স্থান না দেওয়ায়। প্রাচীন বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে, কৃতি চরিত্রের কার্য্যই যে আদর্শ সৃষ্টি করে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তটি চাপা পড়ে গিয়েছিল পুরোহিত ও বজ্রযানীদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের অঢেল প্রচারে, ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদেই আমদানি করা হয়েছিল আবিষ্ট দেব দেবীর প্রভাব এবং তাঁদের শক্তিই আদর্শ স্থাপন করে এবং তা দেবশক্তির স্বেচ্ছাময় আবির্ভাবে।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। যেহেতু তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণু ব'লেই তাঁকে ধরে নিতে হয়, তেমনি রামেও তাই, আবার গৌরাঙ্গেরও প্রাধান্য সেইজন্য। যেহেতু তিনি নারায়ণ বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণই, এই তত্ত্ববাদের পুনর্ভূ'রূপে ঈশ্বর এসেছেন। এমনি ধারণা মনুষ্যকুলেও, যদি কারও মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ হয়, তবে তাঁর ব্যক্তি প্রাধান্য তখনই হয়, যখন তাঁকে রুদ্র, শিব, ব্রহ্মা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির শক্তি বা অবতার বলে খ্যাপিত করা হয়, এটি পুরোহিত তন্ত্রের ও বজ্রযানীদের মিলিত অভিমত। তাঁরা আরও বলেন, যে কোনও মানব যদি বহু গুণের অধিকারীও হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ঔরসে যদি তার জন্ম না হয়, তবে তিনি প্রণম্য হন না। আবার যিনি নির্গুণ হলেও যদি ব্রাহ্মণ ঔরস্য হন, তবে তিনি সর্বদাই মান্য এবং প্রণম্য।

এই জন্য ভাগবত সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষগত ব্যক্তি প্রাধান্য স্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু পুরোহিত তন্ত্রের ওই মতটি ঢুকিয়ে বলা হয়েছে এটি "বেদবাদ।" ওই বাদটি পুরোহিত ও ভাগবত বাদের মধ্যে বৌদ্ধ বাদ, যা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর থেকে ব্যক্তি চেষ্টার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক এবং সেটি দেবতা বা অলৌকিক শক্তি, জীবের ক্ষেত্রে তিনিই ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ; এ বিষয়ে সুপ্রাচীন বৌদ্ধরা ব্যক্তির আচার, ব্যক্তির চেষ্টাকেই প্রধান বল্লেও, তাঁরা অন্য কোন আরোপিত শক্তির এতটুকু সম্পর্ক রাখেন না। তাঁরা এই জগতের সৃষ্টির কার্য্য-কারণকে অপ্রত্যক্ষ দৈবতাক কারণ ব'লেও মানেন না। এটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধমত এবং তা মহাযানীদের।

পরবর্তিকালে সেই বৌদ্ধবাদে ঢুকে গিয়েছে আদি বুদ্ধ ও ধ্যানীবুদ্ধ এই দুটি সিদ্ধান্তের

মধ্যে, সেই ধ্যানীবুদ্ধ স্বেচ্ছায় পাঁচটি বা ততোধিক বুদ্ধের স্রষ্টা হন। তাঁরা বোধিসত্ব। এবং বোধি সত্বরাই পর্য্যায় ক্রমে জগৎ স্রষ্টা হ'য়ে আবির্ভূত হন। এ মতবাদ সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদের নয়। এটি কাশ্মীর, নেপাল, ভূটান ও চীনের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, এ'রাই পরবর্তিকালে ভারতে জন্মান্তরবাদ স্থাপন ক'রেছেন। এবং এটি মহাযানীদের এ'রা হীনযানী বৌদ্ধ বলেও উল্লেখিত হয়েছেন। আবার বজ্রযানেও গভীর রহস্যবাদ এবং মূর্ত্তিবাদকেও উপসর্পিত করে এনেছেন তাঁরা। তবে উভয় সম্প্রদায়ে এক জায়গায় একমত সেটা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং ধ্যানযোগের অনুষ্ঠানের অন্তর্গত "ভাবনা" বিধান। তাঁদের ভাবনা পথটি এই রকম—আদি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধকে ভাবনা ক'রলে তাঁরা প্রতিটি জীবের হৃদয় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, আর মানুষীয় বুদ্ধদের ভাবনা ক'রলে, বোধিসত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ জীবকোটী থেকে উন্নত পর্যায়ে উপনীত হন।

এই "ভাবনা" পথের যতগুলি সংযোজক সিদ্ধান্তগ্রন্থ সবই বজ্রযানী ও হীনযানী বৌদ্ধ বাদের। এই বাদ প্রবেশ ক'রেছে গীতা ও অন্যান্য পুরাণে। ভাবনা বা ভাবতে ভাবতে, তদ্রূপত্ব প্রাপ্তি ও রীতি পরবর্ত্তি বৌদ্ধ উপাসকদের দ্বারা আবিষ্কৃত। এটি বৈদিক সিদ্ধান্তে নেই। প্রাচীন ভাগবত বাদেও নাই, তবে নব ভাগবতে আছে। যেখানে এটি দেখা যায় তা হোলো পরবর্ত্তী কালের যোজনা।

কবিরাজের লেখায় শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিজীবনটিতে ভাবনা রীতির একটি অত্যুজ্জ্বল মূর্তি' এ চিত্রটির পরিস্ফুটন দেখে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ধ্যান ও ভাবনা রীতির বৌদ্ধ প্রভাবটি কবিরাজ গোস্বামীর মনের সর্বত্র ছেয়ে ছিল। যদিও—এটি শঙ্করের আগে থেকে অর্থাৎ অষ্টম খৃষ্টাব্দের বহু আগে থেকে এবং যেটি সেই প্রচ্ছন্ন বজ্রযানী বৌদ্ধদের অভিমত। তা ছাড়া শ্রীকবিরাজের মন যে প্রভাবে প্রভাবিত ছিল, সেটি বহুদিনের প্রবাহিত প্রবাহের ফল। দ্বিতীয় নজীর হোলো বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে যাগ যজ্ঞের এবং তৎসংক্রান্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। তার জায়গায় দান, দয়া, ন্যায়, ত্যাগ এবং সত্যাদি হিত-কার্য্যের প্রাধান্য স্থাপন করা হ'য়েছে, এই গুলিকেই বৌদ্ধশাস্ত্রে এক কথায় 'ধর্ম' নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। এই ধর্ম শব্দটি প্রাক্ আর্য্যদের মধ্যেও ছিল।

ব্যক্তি গুণের মধ্যে এই ধর্মাচরণের বিকাশ ও প্রবাহ, সারা ভারতে বহু পূর্ব থেকেই প্রবর্তিত হয়, ভারতের মানুষ বহুদিন থেকে 'ধর্মাচরণ ব'ললে' এই আচরণকেই বোঝেন ও বোঝান, কিন্তু আর তলিয়ে বুঝতে অবসর পান না, যে এই ধর্মাচরণের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্যের সঙ্গে মানবের নীতিধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং সকলের আচরণের সঙ্গে সকলের সমান অধিকার থাকাটা কাদের দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হয়? এই অধিকার প্রদান কি বুদ্ধ ও বৌদ্ধদেরই প্রথম অবদান নয়?

সেই মানবতাবাদের ছাপও কবিরাজ গোস্বামীর মনে স্বাভাবিক ছিল ব'লেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও তিনি তাই দেখতে চেয়েছেন এবং তৎকালের সমাজে প্রবাহিত ধর্মচারণকে শুদ্ধ ব'লে মনে ক'রেছেন, সেটা তো শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রয়েইছে, তাছাড়া স্বয়ং যে আচরণ ক'রে জীবকে শিক্ষাদান করার কথা, এই উদার মতবাদটি গৌরাঙ্গের চরিত্রে ও আচরণে পরিস্ফুট কিন্তু এই ঔদার্যের পথিকৃৎ স্বয়ং বুদ্ধ ও বৌদ্ধবৃন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ নন।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যের ক্রমোত্তর জীবনের চরিত্রের মধ্যে কীর্ত্তন প্রসঙ্গের প্রাধান্যই বেশী দেখেছেন, তাতে সম্প্রদায় ভেদে, পাঁচটি সাতটি, ইত্যাদি ভাগের কথাও মাঝে মাঝে উল্লেখিত হ'য়েছে।) এই রীতিটি ভারতের পরিবর্ত্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমোত্তর সাধক বা উপাসকের এবং প্রবর্ত্তকদের সম্প্রদায় ভেদে হয়েছিল, এ প্রসঙ্গ বসুমিত্র রচিত গ্রন্থাবলিতেও স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা সবাই ছিলেন সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়ের, তবুও তাঁরা সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিমা পূজা, মৃত সাধুর দন্ত, অস্থি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মাটিতে সমাহিত ক'রে, তার পূজা করার রীতির প্রবর্ত্তনও ত'ারা করেন। এই রীতি শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কেন, যে কোন সাধুর মৃত্যুর পরেও এ ব্যবস্থা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে।

. এই সৌত্রান্ত্রিক বৌদ্ধরাই একদিন অবতারবাদকে স্মরণীয় ক্ষেত্রে অবলম্বনীয় করে মূর্ত্তিবাদ, ও অর্চ্চনাবাদের প্রবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা করেন। সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়ই বুদ্ধগয়ায় তারা দেবী, বাগীশ্বরী দেবী, এবং বৈশালীতে অর্থাৎ বেসার গ্রামে অমিতাভ বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং ত'াদের ধ্যানমুদ্রায় এবং বরদান মুদ্রায়, রক্ষকের মুদ্রায় করুণা বর্ষণের মুদ্রায় অবস্থিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাও করেন, কালে ওঁরাই আবার হিন্দুর আরাধ্য দেবদেবী হয়ে যান। এমনি এক ধরণের মূর্ত্তিপূজা ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা তো হয়েছিলো, সে সব নজির ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শন তো আজও রয়েছে।

সেই মূর্ত্তি পূজার ধর্ম প্রবাহ থেকেই তো শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন গঠিত হয়েছিল, তাই তো ত'ার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভক্তজীবনটি তদ্রূপায়িত হয়ে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। এমন চিত্র সঙ্কলন করার মধ্যে দোষগুণের কোন প্রসঙ্গ নেই। তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ভারতে তা সুপ্রাচীন কাল থেকেই আগত।

আরও বলা যায়, প্রাক্ বুদ্ধযুগে তীর্থ ও ভিক্ষা এবং ভিক্ষু শব্দের উল্লেখ ক'রে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে, গৃহী ও সন্ন্যাসীর ভেতর কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠির পার্থক্য করা হয় নাই। তীর্থ শব্দের দ্বারা গৃহী ও বৈরাগীদের সমান পবিত্র ভূমি, এমন বোধ করারও নমুনা পাওয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে পাওয়া যায়, য'ারা উদাসী বা ভিক্ষু ত'ারা একত্র দলবদ্ধ হ'য়ে থাকবেন, স্বহস্তে নির্মিত বস্ত্রখণ্ড ধারণ করবেন অথবা পথে কুড়িয়ে পাওয়া বস্ত্রের টুকরোও পরতে পারবেন এবং গৃহীর দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা ক'রে ভিক্ষা করে উদরপূরণ করবেন, গোঁফ, দাড়ি, মাথা কামাবেন, রমণীর সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক পরিত্যাগ করবেন ইত্যাদি প্রথার প্রবর্তন; এই ছিল ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী বা বৈরাগী বা উদাসীদের জীবনচর্য্যা। এ রীতির প্রবর্তক বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বৈরাগী বা ভিক্ষুর সেই আচরণ বা সংস্কার শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস জীবনে ও ত'ার ভক্তবৃন্দের জীবনে যে, তেমনি একটি চিত্র অঙ্কিত হবে এতো স্বাভাবিক, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কোনও কোনও জীবনীকার ত'ার এ জীবনের চিত্রকে জন সমাজে বড় করে অ'াকেন নাই।

আরও বলা যায়, বৌদ্ধ বা ভিক্ষু সম্প্রদায়ের য'ারা প্রবর্তক, ত'াদের মধ্যে আনন্দ ছিলেন অন্যতম, তিনি মহারাজ অজাতশত্রু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে বলেছিলেন—"আমাদের মঠাধ্যক্ষ বলে কেউ নেই, বুদ্ধের উপদেশই আমাদের সঙ্ঘ গুরু। ত'ারই আদেশ ও বিধি বিধান আমরা পালন করি,' এই রীতিটি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত

শ্রীচৈতন্যের জীবনে ও তাঁর অনুগতবৃন্দের মধ্যে অবিকল ফুটে উঠেছে। এ রীতিটি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বৈরাগীদের সাধনায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও দোষ-গুণের প্রসঙ্গ ওঠে না, কারণ তা স্বাভাবিক ছিল।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে যে নিয়মের প্রবর্তন হয়েছিল, তেমনটি যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও হয়েছিল এবং তারই ফলে যে মঠাধ্যক্ষ নামে একটি পদের সৃষ্টি হয়েছিল, এমন চিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়।

বৈশালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সভা আহুত হয়েছিল, তারপর মঠাধ্যক্ষের একটি পদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুভূত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, সেটি যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত ধারা থেকে খুব বেশী তফাৎ, তাতো ধরা যায় না।

তারপর বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধবৃন্দ, ভারতের জাতিভেদ প্রথাকে উচ্ছেদ ক'রে আর্য্য সমাজকে ভেঙ্গে ফেলার চিহ্নও রাখেন নি, কিন্তু একথা তো ঠিক, যে বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণবিচার ক'রে সমাজ পত্তন করা, এরকম নমুনাও পাওয়া যায় না। বরং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে, যে কেউই সংঘে প্রবেশ ক'রতে পারে এবং প্রবেশ করার অধিকারীও হতে পারে। বুদ্ধের বাণীর মধ্যে এ উক্তি পাওয়া যায়।

"হে ভিক্ষুগণ ; যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগুলি নামধাম হারিয়ে একই সাগর নাম ধারণ করে, তেমনি সব বর্ণের মানুষই পূর্ব নাম ও মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে শাক্য পুত্রীয়, ভিক্ষু নামে অভিহিত হয়। হয়তো এই বাণী থেকেই "মহিম্ন" স্তোত্রের নৃণামেকাগম্য ইত্যাদির উদ্ভব।

(যাঁরা এ সম্বন্ধে আরও বিশদ তথ্য জানতে চাইবেন, তাঁরা উপালী, অজাতশত্রু, সুনীত চণ্ডালের কাহিনী, থেরা, গাথা, সুত্তনিপাতা প্রভৃতি পাঠ ক'রলে উপকৃত হবেন।)

এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, বুদ্ধদেব কোথাও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলিত ক'রে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন নি। সমাজের মধ্যে যারা পিছিয়ে প'ড়েছে, তাদিকে এগিয়ে দেবার অত্যুগ্র তাগিদও তাঁর চেষ্টায় লক্ষিত হয় নাই, হীন বর্ণকে উন্নীত বর্ণে পরিণত করার উদ্যমও তাঁতে লক্ষিত হয় নাই অথবা সামাজিক কু-রীতি, কু সংস্কারকে সংশোধন করার চেষ্টাও তাঁতে প্রকাশ পায়নি। আর সমাজ সংস্কারকর ধর্ম ও তাঁর কৃত্য প্রচারের প্রধান বলেও অঙ্গীভূত ছিল না, রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকে থাক্, যিনি ভিক্ষু ধর্মকে মেনে নিয়েছেন, তিনি গৃহেই থাকুন বেরিয়েই পড়ুন, তাতে বুদ্ধদেবের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না, সংঘের নিয়ম রক্ষা ক'রে চ'ললেই ঠিক পথে চলা হলো। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং চতুর্বর্ণের অন্যান্য আচার নিয়ম রক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রতে দেননি, তবে যাঁরা বৈদিক আচার ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ না করতেন, তাঁরা ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ ক'রতে পারতেন না। বেদ অলৌকিক, অপৌরুষেয়, মহাসত্য, বিদ্যার আকর প্রভৃতি বাণী দিয়ে কোনও মাহাত্ম্যও স্বীকৃত হয়নি। নিজে যে সত্য উপলব্ধি ক'রেছিলেন, সেই সত্যই বিশ্বজনীন সত্য, সেটা দেশ বা জাতির দ্বারা আবদ্ধ নয়, এইটিই জ্ঞাপন ক'রেছিলেন। এমনি ধরণেই এক চিত্রকল্পের সন্নিপাত করা হয়েছে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনে।

বুদ্ধের যে আদর্শ নীতিটি বর্ণাশ্রম ধর্মীয়দের পক্ষে ক্ষতিকর, অর্থাৎ যাঁরা জানেন যে দেশ যায়, যাক্, কিন্তু জাতি বর্ণের ক্রমস্তর থাকলেই হিন্দুধর্ম বজায় থাকবে, এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁরা চান, তাঁরাই তো একদিন জাতি বর্ণের সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরের বলা "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং ইত্যাদি শ্লোক লিখেছেন, অথচ তাতে যে ফাঁকির সূত্র আছে সেটি তো সবাই ধ'রতে পারে না, তেমনি এক এক গোষ্ঠীগত, এবং জাতি বর্ণের হিতৈষীদের সমাজে থেকে, বাংলায় যে সব অবহেলিত মানুষ পুরাতন বৌদ্ধ সমাজকেই খুঁজছিল, আর জাতি বর্ণের শাসনের চাবুকে পীড়িত হয়ে এবং বিধর্মী যবনদেরও শোষণে পীড়িত হ'য়ে দিকহারা অসহায় বাঙালী সমাজ, কি যেন পেলে ভাল হয়, কার করুণার ছায়াতলে ঠাঁই পেলে শান্তি হয়, এমনি এক অবস্থাতেই যে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আদর্শ লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল, সে চিত্র কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ফোটে নাই ?

অথবা বৌদ্ধদেরই পক্ষে প্রবর্তিত সামাজিক রীতি নীতির যে চিত্রটি ফুটে ওঠে বা যেমন চিত্রটি মনে ভাসে, তেমনটি যে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনেও অবিকল ঘটেছে এবং তা যে বাংলার তথা বৃন্দাবনের বৈরাগী বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারেও দেখা যায় বা বা যাচ্ছে, আর যা প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিক্ষু সংঘের রীতি-নীতির সঙ্গে মেলালে মিলে যায়, তারই ছায়া শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসোত্তর জীবনে, আচারে এবং তাঁর বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ও তাঁদের অনুসরণকারী বৈষ্ণবদের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে, এমন চিত্রটিই যদি পাওয়া যায় ,তাহলে কি মনে করা যায় না শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে, শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে তো ঐ ভাবেই অঙ্কিত করেছেন এবং তার মূল সূত্র কোথায় ?

এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলনা করা যাক।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের—

(১) বর্ষা থেকে চার মাস সংঘে অবশ্য থাকার ব্রত। (এটা জৈনদেরও অর্থাৎ বৌদ্ধপূর্ব্ব)

(২) মস্তক মুণ্ডন ও বসনত্রয় পরিধান।

(৩) ভিক্ষুব্রত ধারণের সময় কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠি, কুমণ্ডল এবং

(৪) পরে ভিক্ষা করা।

(৫) ভিক্ষুক দশশীল ব্রত অবশ্য ক'রবে, জীবহত্যায় বিরত থাকবে, অপহরণ, ব্যভিচার, মিথ্যাবলা ও মদ্যপান ক'রবে না।

(৬) অকাল-ভোজন নিষেধ।

(৭) ভাবালুতার সঙ্গে নাচ-গান ক'রবে না। পরে অবশ্য এ ব্রতের সংশোধন করে সংঘের ও বুদ্ধের স্তুতি গানের ব্যবস্থা করা হয়।

(৮) গন্ধমাল্য ধারণ ও কোন প্রকার নেশা ক'রবে না।

(৯) আরাম শয্যা গ্রহণ ক'রবে না।

(১০) কোনও ধাতু ও ধাতুপাত্র ব্যবহার করবে না।

(১১) ঐ গুলি সমাপ্ত হলে "উপসম্পদ দীক্ষা"। তখন ভিক্ষু বা শ্রমণ ধর্মের অধিকারী, তখনই এঁদের পূর্বর্নাম পরিত্যাগ করান হয়।

(১২) ভিক্ষা করে মেগে যেচে আহার ক'রবেন। সম্ভব হলে স্বহস্তস্যূত বস্ত্র ধারণ ক'রবেন। অরণ্যের বৃক্ষতলে বাসস্থান করবেন। ব্যথিত হ'লে সে ব্যক্তি গোমূত্র সেবনেই মুক্ত হবেন, নিজেতে কোন প্রকার সম দৈবশক্তির আরোপ ক'রবে না।

(১৩) দারিদ্র ব্রত অবশ্য পালন করবে, সংযম করবে।

(১৪) নিয়ত ভাবনায় থাকতে হবে। সেই ভাবনা হবে পাঁচ প্রকার—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা।

—ঃ—

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আদর্শ রক্ষক যে সব বৈরাগী বৈষ্ণব তাঁদের জন্যও দেখা যায়? ঐ ঐ রীতিগুলি—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় পরিস্ফুট এবং পরবর্ত্তি কালে বৈরাগীদের আচরণে অবশ্য কৃত্য হয়ে আছে।

(১) ঐ সময়টিতে চাতুর্মাস্য ব্রত অবশ্য পালনীয়। (যদিও এটি আদিতে জৈন-দেরই প্রবর্ত্তিত।)

(২) মাথা ন্যাড়া ও ডোর কৌপীন, বহির্বাস ও গাঁতি চাদর ধারণ, দশনামী সম্প্রদায়েও ওই ধরণে মুণ্ডন, বসনত্রয় ধারণ এগুলি বৌদ্ধদেরই প্রবর্ত্তিত।

(৩) ভেক নেওয়ার সময় কাঁধে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষা করা, হাতে লাঠি, জলপাত্র। (ভিক্ষু শব্দটিও বৌদ্ধদের)

(৪) এগুলি অবিকল পালন করা হয়, তবে বিশেষ পরিবর্তন যে, ভেক ধারণের জন্য শুভ্র-বসন। কিন্তু অন্য কয়েকটি আধুনিক দলে গৈরিক পরিধান।

(৫) বৈষ্ণব বৈরাগীরাও অবিকল এই আচরণ করেন।

(৬) এ ধারাটিতে ত্যাগী বৈরাগী ও গৃহী বৈষ্ণবের মধ্যে আখড়া বা আশ্রমে ঈশ্বরের ত্রি-সন্ধ্যা স্তুতি গান করা হয়।

(৭) এটাও ভাগবতীয় ভাবনা, এগুলিও বৈষ্ণবদের স্মরণীয়, বাকী সবই এক।

(৮) বৈরাগীরা যথাযথ পালন করেন।

তাছাড়া ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত ধারাগুলি আজও অবিকল পালিত হয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণোত্তর কালে, সেই যে পাঁচ প্রকার ভাবনার বিধান, তাদের মধ্যে অর্হৎ বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, অমোঘ সিদ্ধ, অক্ষোভ্য, অথবা বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পাঁচ প্রকার বুদ্ধদেবের যে ভাবনা বিধির প্রচলন হয়, এঁদের কাছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট এই মূর্তি পঞ্চকের কাছে জগতের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা (শত্রু মিত্র যেই থাক্) সকলের জন্য তাদের আশীর্বাদ বণ্টন, এবং সাধকদের স্বতন্ত্র নামকরণ এইগুলি প্রথম ভাবনার রীতি প্রচলিত হয় (নামকরণের ব্যাপারে বক্তব্য হোলো—গুরুদত্ত একটি নাম) স্মরণ করবেন সাধক। সেটি জন্মসূত্রে পাওয়া নয়। ও নামটি সংঘ গুরু দত্ত।

পরে সারা ভারতের সব সম্প্রদায়ই এই রীতিটি গ্রহণ করেন।

এগুলি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মনে এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এসবের একটি ছায়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি প্রসঙ্গে—

মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার,
বস্তু নির্দ্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার।

বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ভাবনার নাম করুণা। সকলের দুঃখ সমবেদনার সঙ্গে অনুভব করা, জীবের কিসে সুখের বর্দ্ধন হয়। অহরহ এইরূপ চিন্তা করা।

শ্রীকবিরাজের অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য ও ত াঁর পরিকরদের মধ্যে জীবের দুঃখ দূর করার যত উপদেশ, সবই বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল হ'য়ে যায়।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তৃতীয় ভাবনা মুদিত। ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাদের সুখ স্থায়ী হোক, এই তৃতীয় ভাবনা। (এটি পাতঞ্জলের উপদেশ, ভাগবত গ্রন্থ ও ভাগবত সম্প্রদায়েরও উপদেশ। দুটি গ্রন্থই বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত নয়) কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে এই ধরণের ধারণাটি বেশ সুদৃঢ় হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে এতো স্বাভাবিক।

বৌদ্ধদের চতুর্থ ভাবনার নাম "অশুভ"। এই দেহ ব্যাধি মন্দির, জগৎটা মরীচিকার মত অসত্য, দেহ সর্বদা অমেধ্য বস্তুতে পূর্ণ। মানব জীবন, জন্ম ও মৃত্যুর অধীন ও স্বতঃসিদ্ধ ও ক্ষণভঙ্গুর, এই রকম ভাবনার নাম অশুভ ভাবনা।"

বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনে এ ধারণা তো অহরহ থাকবেই, গৃহীর জীবনেও যাতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি উপদেশ পূর্ণ আচরণ শ্রীচৈতন্যের ও তাঁর পরিকরদের মধ্যে সর্বদাই জাগরুক; এমন চিত্রসন্দেশ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বাদ পড়েনি একটুকুও।

এখানে এসবের তুলনা করার উদ্দেশ্যই এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থের ছাঁচে ঢেলেই, তাঁর গ্রন্থখানি নির্মাণ ক'রেছেন, অথবা বাংলার বৈরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গঠন করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও তার পরিকরবৃন্দের আচরণের মাধ্যমে, কিংবা উক্তি প্রত্যুক্তির প্রক্ষেপ দিয়ে, বৈষ্ণবীয় আচরণের বিধি বিধান নির্মাণ ক'রেছেন, কিম্বা বৌদ্ধাচারকেই নতুন বেশে সাজিয়ে বৈষ্ণব আচারের আদর্শ পথ দেখিয়েছেন।

আমার বক্তব্য, কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক এবং তার পূর্বে প্রচলিত বৈরাগীদের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে অনুসৃত আচারবাদকে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অতিক্রম ক'রতে পারেন নাই।

শ্রীকবিরাজের পূর্বে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের রচিত ভক্তি উজ্জীবক গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নয়। তাঁরাও ত াঁদের পূর্বের প্রচলিত বৌদ্ধবাদ ও ভাগবত বাদের গ্রন্থাবলী থেকে বহু অমূল্য তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন। যা পারম্পর্য্যক্রমে হ'য়েই থাকে এবং কবিরাজের মনেও সে সব গ্রন্থের প্রভাব অক্ষুন্ন হয়েই পরিস্ফুট হয়েছিল। পুরাণ গ্রন্থ এবং পৌরাণিক উপাখ্যানের বচন উদ্ধৃত করাই তার প্রমাণ।

ঠিক এই ভাবেই বলা যায়, বৌদ্ধদের তন্ত্র মার্গের আচার ও নির্বাচনীয় নীতিও উপদেশগুলি যে কবিরাজ গোস্বামীর মনকে প্রভাবিত ক'রবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? যেমন বৌদ্ধদের "প্রতিমোক্ষ" গ্রন্থে ভিক্ষু বা উপাসক অথবা শ্রমণ উপাসকার জন্য সেবাপরাধের বা তজ্জনিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল, সেগুলির বহু চিহ্ন গোস্বামীদের ভক্তিবোধক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যেমন "পরাজিক" "সংখ্যাদি শেষ" "খুল্লচয়" "পচিত্তিয়" "শেখীয়" "প্রতিদেশনীয়, দুস্কৃত, দুর্ভাষিত", অশীল ভাব, উপবেশনীয়," "আভিবাদিক"

"প্রদর্শ" "অচ্চকীয় ইত্যাদি শত অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেসব অপরাধ থাকলে ভাবনা সিদ্ধ হয় না, গোস্বামীদের ভক্তি গ্রন্থেও সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ প্রভৃতির সংখ্যা ও রূপগুলি জানানর সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে, এসব অপরাধ থাকলে চিত্ত নির্মল হয় না। (বরাহ পুরাণ ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণে অপরাধের সংখ্যা কত, তা বলা হয়েছে। পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি শারীরিক মানসিক অবজ্ঞা ব্যঞ্জনাই অপরাধ।)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব'লেছেন কৃষ্ণনাম গ্রহণের সঙ্গে নয়নে অশ্রু দেখা না দিলে বুঝতে হবে, সে চিত্তে প্রচুর অপরাধের সঞ্চার রয়েছে। তবে নিতাই চৈতন্য নাম এসব অপরাধের বিচারের অপেক্ষা থাকে না, বা গ্রহণ করেন না, নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়।

এই সব অপরাধের সংখ্যা "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুবিন্দু গ্রন্থে ধরা হ'য়েছে। পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্যক্তি আচরণের মধ্যে সাধকদের সর্বাগ্রে সাবধান হ'তে হবে অপরাধ থেকে। এমনি একটি স্থায়ী উপদেশও দান করা হ'য়েছে। ভাবনা রীতির বাধক অপরাধ। এটি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবীয়োপাসনা।

তারপর শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরিতামৃতগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র বা লীলার এমন সব তথ্যের সঙ্গে তাঁকে চিত্রিত করা হ'য়েছে, যা অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর উপন্যস্ত চরিত্র চিত্রণের প্রসঙ্গ থেকে, স্বতন্ত্র ধরণের এবং অন্যাপেক্ষা মুক্ত একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বেরই উপন্যাস এতে করা হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ ও তত্ত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে, এটি কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বে যাঁরা গৌরাঙ্গের সমসাময়িক, অথবা প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, অথবা প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের অল্প ব্যবধানে থেকে, কিংবা সাক্ষাৎ দ্রষ্টার মুখে শুনে, তাঁর চরিত্র রচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীনিতাইর অথবা তাঁদের প্রধান ভক্তদের জীবনের প্রতি ব্যক্তি প্রাধান্যকে যেমন গুরুত্ব দেন নাই, কিন্তু তার বদলে কৃষ্ণ, নারায়ণ, বলরাম, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি অতিসত্তার ব্যক্তিপ্রাধান্য দিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী সে সবের অনুসরণ তো অবিকল করেইছেন, অতিরিক্ত ক'রেছেন "দেহ সত্তায় অনুভূত অতিসত্তাময় প্রেমের প্রাধান্য" যাঁরা কবিরাজের পূর্বগামী,) তাঁদের ধারাটাই আগে বলি—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর
বসুদেব প্রায় তেঁহো স্বধর্মে তৎপর।
তাঁর পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
দ্বিতীয় দেবকী হেন সে জগন্মাতা॥
তার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার ভূষণ॥

চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস)

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তিপ্রাধান্য না দিয়ে পূর্ব্বের পৌরাণিক ধারায় নারায়ণই যে কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন এবং গীতার সেই "যদা যদাহি ধর্মস্য ইত্যাদি বাণীর দ্বারা আপনাকে খ্যাত করেছিলেন, পরে সেই কৃষ্ণই আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়ে-

ছিলেন, এ সিদ্ধান্তটি স্থাপন ক'রতেই তাঁর চিত্ত দৃঢ় ছিল। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যতই শ্রেয়ঃ প্রেয় হন না কেন, তাঁতে অলৌকিক সত্বার প্রবেশ প্রকাশ না থাকলে, তাঁর দ্বারা শ্রেষ্ঠ কাজ করা যায় না, শ্রীবৃন্দাবন দাস এই সিদ্ধান্তটি আরও পরিস্ফুট ক'রেছেন তাঁর চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

প্রশ্ন তুলেছেন—

কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার? কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার।

উত্তর—

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে ॥
অধর্মের প্রভাবতা বাড়ে দিনে দিনে।
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে
ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে ॥
তবে প্রভু যুগ ধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥
কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সংকীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।

কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সংকীর্তন। সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।

শ্রীবৃন্দাবনদাস যে, সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন এই তাতে বোঝা যায়, তাঁর পূর্বে যেসব পুরাণে বলা হ'য়েছে—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ"

বিষ্ণু আরাধনাটি এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ধ্যান (২) যজ্ঞ (৩) পরিচর্য্যা (৪) হরিকীর্তন। ভক্তি ধর্মের অস্তিত্ব ও তার একমাত্র নিয়ন্ত্রক বিষ্ণু বা নারায়ণ। তিনিই যুগে যুগে বিভিন্ন আকৃতিতে অবতীর্ণ হন। এ ছাড়া কোন যুগেই অন্য কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা অর্জনে প্রাধান্য নেই।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দেরও ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রাধান্য রাম ও কৃষ্ণের অনুরূপ, এবার তাঁরও স্বাতন্ত্র্য নাই, যিনি আদিতে ছিলেন সংকর্ষণ ও বলরাম, তিনিই এবার নিত্যানন্দ রাম—

শ্রীবৃন্দাবন দাসের উক্তি—

ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়
চৈতন্য কীর্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্তন ॥
দেবে জানে এক তত্ত্ব কৃষ্ণ হলধরে।

চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥
মূর্ত্তি ভেদে আপনি হয়েন প্রভু, দাস
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ।
কহিলা এই কিছু অনন্ত প্রভাব
হেন দেব নিত্যানন্দ কর অনুরাগ॥
দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ
এই মত নিত্যানন্দ, অনন্ত, বলদেব॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে ছিলেন এমন কথা বলেন নাই। তবুও তিনি তাকে নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ ব'লেই দৃঢ় বিশ্বাস ক'রেছেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তি জীবনের বিপুল শক্তির কথা শুনেও, সেই ব্যক্তিরই যে অসমোর্দ্ধ শক্তি আছে, এবং তাঁরই অসাধারণ জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে, সে ধারণা ক'রতে পারেন নাই, এমন কি শ্রীনিত্যানন্দের মুখে তিনি যে গৌরাঙ্গ চরিত্র শুনেছিলেন, তাতেও তিনি ধারণা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন "গৌরাঙ্গ নারায়ণ এবং কৃষ্ণঅভিন্ন। অতএব নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ ও বলরাম। এছাড়া নিত্যানন্দেরও স্বাতন্ত্র্য নাই; এসব ধারণা এসেছে প্রবাহিত সংস্কার থেকে।

শ্রীনিত্যানন্দের মুখেই যে তিনি গৌরাঙ্গতত্ত্ব এবং চরিতকথা শুনেছিলেন এবং তাঁর চরিতকথা লেখার আদেশ পেয়েছিলেন সেকথাও বলেছেন—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

তাছাড়া অন্যান্য ভক্তের মুখেও চৈতন্যের চরিত্র কথা তিনি শুনেছিলেন—

বেদ গুহ্য চৈতন্য চরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥

এছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মুরারি গুপ্তও শ্রীচৈতন্যের জীবনী সঙ্কলন করার কাজে হাত দিয়েছিলেন এবং সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে বন্দনা করেছেন প্রাচীন পৌরাণিক ধারায়—

নমামি চৈতন্য মজং পুরাতনং
চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাব্জ চক্রিণম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্ম্যাঙ্কিত বক্ষসং হরিং
সম্ভাল সংলগ্ন মণিং সুবাসসম্। (মুরারি কড়চা)

যিনি "অজ" (জন্মরহিত) পুরাণ পুরুষ ও যিনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, গদা, পদ্ম, চক্রধারী, যাঁর বক্ষোদেশে শ্রীবৎস লক্ষ চিহ্নাকৃতি বিদ্যমান, যাঁর সুন্দর ললাটে মণি সংলগ্ন, অথবা কণ্ঠে মহাতেজস্কর মণি বিরাজমান, এবং যাঁর পরিধানে অতি উত্তম বসন, সেই চৈতন্য হরিকে প্রণাম করি।

শ্রীমুরারি গুপ্ত তাঁর মহাকাব্যটিতে ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত) শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবকে পুরাণ বর্ণিত রীতিতেই অঙ্কিত করেছেন। অর্থাৎ সেই পুরাণ কথিত পুরুষ-

বর নারদ যেমন, বৈকুণ্ঠ নামক অতিলোকের ভূমিতে উপনীত হ'য়ে; আবার থিবীর মানুষগুলির অপরিসীম দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে লক্ষ্মী নামক অপ্রাকৃত রমণীর সহিত প্রাকৃত পুরুষ বিষ্ণুর কাছে, অনেক কিছু নিবেদন ক'রে, এই পৃথিবীতে আবার তাঁর বির্ভাবের জন্য অনুরোধ করেন, এবং তাঁর অনুরোধে অনুরুদ্ধ হ'য়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে সার আগে, নিজের পার্ষদবৃন্দকে পূর্ব্বেই অবতীর্ণ করালেন, এবং নিজে এলেন সকলের যে। (ওখানে অন্য গ্রন্থের মত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কার বা আহ্বানে গৌরাঙ্গের বির্ভাবের বর্ণনা নেই।)

বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা আবৃত হয়ে যে সব পার্ষদ অবতীর্ণ হ'লেন তাঁরা দেবের অংশ নিয়ে, এবং বলদেব এলেন শ্রীনিত্যানন্দ রূপে।—

অবধূতো মহাতেজা নিত্যানন্দঃ মহত্তমঃ।
বলদেবাংশতো জাতো মহাযোগী স্বয়ং প্রভুঃ॥
বক্তুং নেশেঽপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয় শ্চাপি গৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভঃ॥

এখানেও শ্রীনিত্যানন্দের ব্যক্তি প্রাধান্যটি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি বলদেবের অতি লৌকিক সত্ত্বার জন্যই।

এর পর শ্রীমুরারি শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁর সমগ্র সহযোগীদের যে প্রত্যেকেই দেবতা মুনি হ'য়ে পূর্বে অবস্থান ক'রতেন, তাঁরাও এক একজন অবতার হ'য়ে এলেন অর্থাৎ উ যুগাবতার, কেউ কার্য্যাবতার ইত্যাদি। এ সব তথ্য শ্রীমুরারির মত বিচক্ষণ ণ্ডতেরও ধারণা, তাই তিনি পরিষ্কার ব'ল্লেন

"অন্যেচ শতশো জাতা দেবাশ্চ মুনি পুঙ্গবাঃ।
পৃথিব্যাং অংশভাবেন তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে॥

তারপর শ্রীমুরারি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির ধর্ম যে চার প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, ই তথ্যটি নিরূপণ করেছেন। ঐহিক জগতের যাবতীয় ধর্ম অর্থাৎ লোকধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্ম, কালধর্ম প্রভৃতি নানা ধর্মের অস্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হ'লেও, সে সম্বন্ধে ধর্মটির প্রকৃত তথ্যের স্বরূপ কি, তা নির্দ্ধারণ না ক'রে অতিলৌকিক কোনও একটি র্মর অস্তিত্বই যে সনাতন স্থিতিশীল, এবং সেইটি যে সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে জা এবং কলিতে কীর্ত্তন রূপে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ পুরাণ ও বেদের সেই ঈশ্বর ও র কাজকে ব্যক্ত করেন সেই তথ্যই শ্রীমুরারি প্রচার ক'রেছেন।

এর জন্য পূর্ব্বের লেখকবৃন্দের অনুসৃত "দশাবতার" স্তুতিকেও তিনি নূতন ভাষায় দান ক'রেছেন। প্রতি যুগের জন্যই সেই ধর্মটি বহু কর্মের মধ্যে 'শ্রীহরির' কর্মকেও নি জগতে প্রকটিত করেন।

আজকের সভ্যতা গর্বী ভারতে, এই অতি সত্তার পুনরাবির্ভাবের কল্পনা পুরোদস্তুর য় রয়েছে, এতটুকুও সরে নাই, নইলে অমুক পরমহংস, অমুক স্বামীজী, অমুক বাজী, অমুক মাতা, অমুক বাবা, অমুক ক্ষেপা, অমুক আনন্দজীকে নারায়ণ, বিষ্ণু, , রাম, শিব, অর্জুন, লক্ষ্মী, তারা, দুর্গা ইত্যাদির অবতার বলে, মন্দির, আশ্রম, ঘ, তীর্থ ভূমিতে তাঁদের প্রতিকৃতি কেন পূজা করা হয়? সেই পুরাণ বর্ণিত অতি

সত্তার কোন দাস দাসীকে এই সব পুরুষ রমণীদের সাহচর্য্য ক'রেছেন? নইলে তুলন করেন কোন যুক্তিতে ত'ারা? কোন ব্যক্তিসত্তার বাস্তব প্রতিষ্ঠায় কেন এত সঙ্কোচ এত ভয়? মানবের বহু কালের সঞ্চিত ধর্ম সংস্কারের অন্ধ ভীতির দুর্বলতার সুযো নিয়েই কি?

শ্রীগৌরাঙ্গের কার্য্য এবং জীবনের আচরণের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মুরারিগুপ্তও পৌরাণি তন্ত্রের রীতি অনুসরণ ক'রেছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বকে খু প্রাধান্য দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণেরই সে সব কাজ ব'লেছেন।

তারপর আরও অন্যতম প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মহাকবি কর্ণপুর। এঁর পিতা শিবান সেন। তিবি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ গৃহী পরিকর বৃন্দের মধ্যে অন্যতম। এ'রই কনি পুত্র মহাকবি কর্ণপুর। আশৈশব শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অন্যতম দ্রষ্টা, শ্রোতা অনুধ্যাতা জীবনী লেখক।

পিতৃ আলয়ে থেকে বিদ্যালাভের সময় পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ও ত'ার পরিকরবৃন্দে সহানুগ হন নাই ঠিকই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের য'ারা সান্নিধ্যে সর্বদা থাকতেন, তাঁদের মু গৌরাঙ্গ চরিত শুনতে পেতেন। ত'াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুরারিগুপ্ত ও পিত শিবানন্দ সেন। একথা তিনি নিজেও স্বীকার ক'রেছেন তাঁর রচিত মহাকাব্যে—

যদ্‌যদ্‌ দৃষ্টং শ্রুতমপিচ যৎ তস্য লীলা বিলাসৈঃ
তৎ তৎ প্রাণৈ রতিশয় মহামূঢ় চিত্তায় যন্মে"

কর্ণপুর শুধু কবি নন মহাকবি, তাঁর চরিতামৃতগ্রন্থটি মহাকাব্যের লক্ষণে ভূষিত কিন্তু মহাকবি যে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ নিরূপণ ক'রে লীলা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর মনের সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত তথ্যবাদই তাঁর মনকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। অর্থা তথ্যের প্রাধান্য তখনই হয় যখন তত্ত্ববাদটিকে মুখ্য বলে স্বীকার না করা হয়, সেই তত্ত্ব হলো অতি লৌকিক। কর্ণপুর ছিলেন অনেকটা তথ্যপ্রধান ব্যক্তিবাদী।

শ্রীকর্ণপুর এইজন্য ত'ার মহাকাব্যের আদি শ্লোকটিতে গৌরাঙ্গের স্বরূপের প্রাধা নিরূপণ করেই ব'লেছেন "নবদ্বীপে বিরাজমান।" তবে এই শ্রীগৌরাঙ্গ আসলে মনে হ বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর কৃষ্ণ কান্তি এখন গৌরকান্তি, হয়তো এর কারণও র'য়েছে কারণটি হোল, "পূর্ব্বে ব্রজে যে সব গৌরাঙ্গীকে নিয়ে সেই শ্যামসুন্দর রাসাদিতে নৃত ক'রতেন, সেইসব গৌরাঙ্গীদের গাঢ় আলিঙ্গন ও আবেষ্টনস্পর্শেই কি শ্যামলকান্তি গৌ কান্তিতে পরিণত হয়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন?

এই শ্লোকটি কেবল চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেই নিবদ্ধ নেই', তাঁর না আরোপিত আর একখানি তত্ত্ব নির্দ্ধারক গ্রন্থ ব'লে প্রচারিত "গৌরগণোদ্দেশ" দীপিক গ্রন্থের প্রথমেও আ-ন্যস্ত করা আছে। এ সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ এই "গৌরগণোদ্দেশ" দীপিক গ্রন্থটির কথা বলি, ওটি জাল। কারণ কবি কর্ণপুরের আমলে গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদা যে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাতো ঐতিহাসিক সত্য, কারণ কর্ণপুর ১ ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের ব্যক্তি, আর মাধ্বমতই যে গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভিমত, একথ ঘোষণা করার কাহিনী সৃষ্টি করা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর বলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ে।

১। গৌর গণোদ্দেশ গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে—

"শাকে বসু গ্রহ-মিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোহ'য় মাবি রভবদ্ কতমস্য ঘস্রাৎ।

অর্থাৎ—১৪৯৮ শকাব্দে এই গ্রন্থের প্রকাশ। তার মানে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত হয়েছে। তা হলে বলা যায় শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পর এটির রচনা শেষ। ঐতিহাসিকদের অনুমান ১৫৪২ অথবা ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধান।

আবার তিনি নাকি বিবাহও করেছিলেন, নাকি বলছি এই জন্য যে শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎ-লীলা দ্রষ্টা ও তাঁর জীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্য (১৫৫৫-৬০ খ্রীঃ) ভাগবতে এতটুকু অক্ষর পাতও ক'রেও বলেন নাই যে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অথচ আজও গোস্বামী উপাধি-ধারী বলে খ্যাত এবং শ্রীনিত্যানন্দ বংশজাত বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে আসছেন যাঁরা, তাঁদের আদি পুরুষ নাকি বীরচন্দ্র এবং তাঁর বিমাতার কন্যা গঙ্গা নাম্নী কোন নারী কন্যাটি যখন বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন তখন কবিকর্ণপুর বর্ত্তমান ছিলেন ব'লেই তাঁর গৌরগণোদ্দেশ গ্রন্থে লিখেছেন—

১। বীরচন্দ্র—সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
এ সব বীরচন্দ্রোহভূৎ চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।

২। কন্যা গঙ্গা—বিষ্ণু পাঁদোদ্ভবা গঙ্গা, যাসীৎসানিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজো জাতা, মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ॥

এঁদের পরিচয়—

শ্রীবারুণী রেবত বংশ সম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।
শ্রীসূর্য-দাসস্য মহাত্মন সুতে
ককুদ্মি রূপস্য চ সূর্য তেজসঃ॥

যদি তাই হয়, তা হলে তার সার সংগ্রহ এই হচ্ছে—

কবি কর্ণপুরের জন্ম আনুমানিক ১৫১৪ খ্রীঃ
" " গৌরগণোদ্দেশ রচনা ১৫৭৬ খ্রীঃ
শ্রীচৈতন্যের—অন্তর্ধান ১৫৩৩ খ্রীঃ—
শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব—১৪৭৮ খ্রীঃ—
" " অন্তর্ধান—১৫৪২ অথবা ১৫৪৫

তা হ'লে তাঁর বংশধরগণই এবার প্রমাণ করে দিন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌর বিরহের কত দিন পরে এবং তা কত খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ঘ'টলে—তাঁর সাত আটটি পুত্র কন্যার জন্ম হবে? এবং তাদের মধ্যে দুটি পুত্র কন্যার পরিচয় দিতে পারেন? ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের লেখা গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়? পূর্বের গ্রন্থে তিনি তা দেন নাই, তা ছাড়া কোন্ প্রমাণে তাঁরা জানতে পারলেন গঙ্গার মায়ের নাম না জানলেও তিনি নিত্যানন্দের কন্যা, তাছাড়া বীরভদ্রের মা কে? গঙ্গা নামের নদীই মৃত্যুর পর মানবী? তাহ'লে অন্য কয়েকটি জাল গ্রন্থই কি এমন কাণ্ড ক'রেছে? এ সম্বন্ধে আমার এরই পরবর্তি গ্রন্থ শ্রীনিত্যানন্দে" এনিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রছি।

দ্বিতীয় কথা

জালিয়াতির আর এক নজীর, কবি কর্ণপুর লিখেছেন—

তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে। গৌ. গঃ।

এতে কি বোঝাতে চান? গৌড়ের শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণ মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্ত? কি কারণে? ওই যে পদ্ম পুরাণের শ্লোকটি দেখে? "সম্প্রদায় বিহীনা যে তে মন্ত্রা নিস্ফলা মতাঃ। অর্থাৎ সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র নাকি নিস্ফল? তারই জন্য এই সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায় বলতে হবে?

কিন্তু তাতে যে দুটি কারণে দুটি পুরাণের নবীনত্ব হ'য়ে যায়। প্রথম, স্কন্দপুরাণ, —ও পুরাণের বিষ্ণু খণ্ডের বেঙ্কটাচল মহাত্ম্যের ২১ অধ্যায়ে শ্রীরামানুজের জীবন চরিত দেওয়া আছে, শ্রীরামানুজ তো ১১ দশ শতাব্দীর পুরুষ। এ তো ইতিহাসের সংবাদ। তাহলে স্কন্দপুরাণ কত খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থ?

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামানুজের ঢের পরে যখন শ্রীমধ্বাচার্য্য, তা হ'লে পদ্ম পুরাণটিই বা কত খৃষ্টাব্দের? তাহ'লে শ্রীরামানুজের পরে ব্যাস এসে মাধ্বাচার্য্যকে শিষ্য ক'রছেন? নইলে কর্ণপুর লিখলেন কি করে—

ব্যাসাৎলব্ধকৃষ্ণদীক্ষো
মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ॥
চক্রে বেদান্ বিভাজ্যাসৌ
সংহিতা শত দূষণীম্॥
গৌর। গঃ— ।২৪

আর ব্যাসের কাছে দীক্ষা লাভ ক'রে, মধ্বাচার্য্য অমনি চট্‌পট্ ভাগবত তাৎপর্য গ্রন্থে লিখে দিলেন—কৃষ্ণকান্তা ব্রজগোপী-গণ অপ্‌সরাস্ত্রী, এবং এঁরা জীব। এঁরা দেহ-ভোগ সুখ পরায়ণা। এঁরা নিজের দেহভোগের দ্বারা অপরের প্রীতিবিধানে নিঃসঙ্কোচ—

"বিমুক্তাবীশ কামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ॥
স্নেহভক্তা সদা দেব্যঃ কামিন্যোপ্‌সর স্ত্রিযঃ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিং ন কামেন—ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু।
ভক্ত্যা বা কাম ভক্ত্যা বা মোংনান্যেন কেনচিৎ।
কাম ভক্ত্যাপ্‌সরঃস্ত্রীণাং অন্যেষাং নৈব কামতঃ।
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেব স্ত্রীণাং জনার্দনঃ।
জারত্বেনাপ্‌সরঃ স্ত্রীণাং কাসাংচিৎ ইতি যোগ্যতা॥
ইত্যাদি—

আর থাক্। তারপর, মধ্বাচার্য্য হ'লেন মুক্তিকামী ও বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের উপাসক এবং ভেদবাদী। আর গৌড়ের বৈষ্ণবগণ হ'লেন অচিন্ত্যভেদ-অভেদ বাদী এবং জ্ঞান-কর্ম লেশ শূন্য শ্রীকৃষ্ণ সেবাময় প্রেম ভক্তির উপাসক? একথা তো প্রামাণ্য। উভয়ের মতবাদ যে একেবারে বিপরীত। তবুও যাঁরা গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে

মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে সর্বভারতীয় বৈষ্ণবগণের কাছে কুলীন হতে চান তাঁরাই যে এই গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থখানিকে আসল ব'লে ঘোষণা ক'রতে চান, তাঁরা কি বিশেষ মতলববাজ নন ? এমন উৎকট সিদ্ধান্ত কাদের স্বার্থে ?

মোট কথা, এই বিংশ শতাব্দীতেও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মধ্যে যেসব উদ্ভট্ উৎকট্ অনৈতিহাসিক গোঁজামিল হাস্যকর ব্যাপারগুলিকে, যাঁরা আসল তথ্য বলে পোষণ ধারণ পূজন ক'রে চলেছেন তাঁদের চিন্তাধারাই আলাদা। কোন যুক্তিই তাদের কানে ঢুকবে না।

বলদেব বিদ্যাভূষণের পর থেকেই, গ্রন্থটি কবি কর্ণপুরের লেখা ব'লে পরিচিত করার জন্য গৌরগণোদ্দেশ দীপিকারওই মধ্ব সম্প্রদায়ই যে গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এ ঘোষণার দায়িত্ব কারা নিলেন ? কারণ, ষড়্ গোস্বামীর আমলে গৌড়ে প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি কি মাধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছিল ?

যে কারণে গৌড়োদ্ভূত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে—

শ্রীবলদেবের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, (১৬৫৪ জন্ম) তিনি শ্রীকবি কর্ণপুরকে দেখেন নাই। কর্ণপুরের গ্রন্থখানি পাঠ করেছেন এবং শ্রীভাগবতের উপর কবি কর্ণপুরের যে একখানি টীকা আছে, সেটির কথা ভাগবতের ১০।২৯।৯) টীকায় চক্রবর্তী বলেছেন অর্থাৎ 'অপত্যবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহে ইতি নিরুদ্ধা বভূবুরিতি' কবি কর্ণপুর-গোস্বামীকৃত-দশম-স্কন্ধ টীকায়াং দৃষ্টং"। একথা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্বীকারই ক'রেছেন। তাতেই, স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের বৃদ্ধ বয়সের শিষ্য শ্রীবলদেব, তিনি যতদিন না জয়পুরের গলতা গদিতে বিতর্ক সভায় যোগ দিয়েছেন' অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দে, ততদিন পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে "মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত" করার কোনও কাহিনীই প্রচারিত হয় নাই। অতএব কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় "তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে," এ কি রকম কথা ?—তাহলে এ গ্রন্থটিতে মধ্বমতের নাম থাকাটাই তো জালিয়াতির চিহ্ন।

তারপর আবার সেই মহাকবি কর্ণপুর তত্ত্ববাদমূলক তত্ত্ব নিরূপণ না ক'রে, শুধু রহস্য-বাদকে প্রকটিত ক'রেই শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তি প্রাধান্য দিয়ে, স্বরূপসত্তায় তিনি যে শ্রীকৃষ্ণই এই মতটিও পোষণ করেছেন—

> যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভূবিপুরা সচ্চিদানন্দ সান্দ্রো
> গোরাঙ্গীভিঃ সদৃশ রুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
> তাসাং শশ্বদ্ দৃঢ়তর পরীরম্ভ সম্ভেদতঃ কিং
> গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্ব মানঃ ?

তাছাড়া সেই কবি কর্ণপুরই তাঁর চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যটিতে (এটি ১৫৪২ খৃঃ শ্রীগৌরাঙ্গের যে চরিত্র বর্ণনা ক'রেছেন, সেটিতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে তাঁকে অভিন্ন ক'রে, এমন কি তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রই লিখেছেন, এটি ব্যক্ত ক'রেছেন—(অথচ তত্ত্ববাদ নয়)।

> অস্য শ্রীমদ্ ব্রজবর বধূ প্রাণনাথস্য লীলা—
> লাবণ্যাঢ্যং তরুণিমসুধাসম্ভৃতং তং বিলাসম্।

যে তৎ পাদাম্বুজ মধুকরা বক্তূতো বাক্যমেষ
স্তেষাং শ্রুত্বা প্রচল হৃদয়শ্চাপলাদেব বক্তি।

তারপর আরও ব'লেছেন—

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন বর বধূ প্রাণনাথঃ সমস্তং
বিশ্বপ্রেমামৃত লহরিভি র্নির্ভরং প্লাবয়িত্বা।
তত্তলীলামৃত মপি মুহুঃ স্বাদয়িত্বা বিশেষং
ভূয়স্তেষাং নিকট মগমৎ যদ্বিয়োগাক্ষমোঽসৌ।।)

অতএব শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও যে চৈতন্যচরিত্রটিকে কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ক'রবেন, এতে কি সন্দেহ ? কারণ, তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দই তো শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তি প্রাধান্য অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্যই দিয়েছেন ; অতএব তাঁদেরই পথ অনুসরণ করেছেন শ্রীকবিরাজ।

কিন্তু শ্রীকবিরাজ আরও ভিন্ন পথে—

এরপর আরও নূতন একটি দিকে অগ্রসর হ'য়েছেন, যেটি তত্ত্ববাদের পথ। সে পথে তিনি কৃষ্ণকেও উপস্থাপিত করেছেন 'পঞ্চতত্ত্বময়' করে, শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন এই পঞ্চতত্ত্বময় কৃষ্ণতত্ত্বটি ব্যক্ত করেছেন "শ্রীস্বরূপ গোস্বামী"। (এমন সিদ্ধান্ত কিন্তু ষড় গোস্বামীর কেউ করেন নাই)।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সান্নিধ্যে ছিলেন শ্রীরঘুনাথ দাস, তাঁরই মুখে শুনে নাকি শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব নিরূপণ করেছেন শ্রীকবিরাজ, এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামী নাকি একখানি কড়চার মাধ্যমে অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে তত্ত্ব নিরূপক কয়েকটি শ্লোক লিখে গৌরাঙ্গ তত্ত্বকে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখার যুগের জন্যও সম্পুটিত ক'রে রেখেছিলেন ?

যে কড়চাখানি আবিষ্কৃতই হয়নি, সেই কড়চাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব নিরূপণই করা ছিল, কিংবা তাঁর জীবনের কিছু আচরণের বা লীলার কথা লেখা ছিল, একথা আজও জানা যায়নি, তা নিয়ে শ্রীকবিরাজও কিছু বলেন নি।

কিন্তু সে কড়চাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব নিরূপণই করা ছিল, একথা কবিরাজ গোস্বামীই সর্ব্বপ্রথম ব'লেছেন। যেমনটি ঐ জাল গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়, তেমনি তত্ত্ববাদের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। (এগ্রন্থ যে কবি কর্ণপূরে আরোপিত, বিশেষ কোন মতলববাজের লিখিত, তা তো নিঃসন্দেহ। একথা পূর্বেই বলেছি)।

সেই কড়চাটিতে গৌরাঙ্গের যে তত্ত্ব বলা হয়েছে, সে তত্ত্ববাদ এমনই যে, উপাধি ভেদে যেমন একই তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আসলে সে তত্ত্ব এক। সেখানে ভেদটাই উপাধি। এই যে সিদ্ধান্ত, এটি তো মায়াবাদে অদ্বৈতাবাদিদের সিদ্ধান্ত। ঠিক ঐ রকম সিদ্ধান্তই কি কড়চাটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল ? কবিরাজ গোস্বামী কি সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ ক'রেছেন ? এর ফলে যে গৌরাঙ্গের দেহ এবং চরিত্রকে অদ্বৈতবাদির উপাধি মাত্রই স্বীকার করা হয়, তাতে তো পারমার্থিকতাই থাকে না, মায়াবাদে ব্যবহারিক সত্যটাই উপাধিবাদে থাকে, অদ্বৈতবাদিদের এই সিদ্ধান্ত কি পূজ্যপাদ কবিরাজ জানতেন না ? তবুও ভক্তিবাদে তিনি এমন তত্ত্ববাদের প্রসঙ্গ অনলেন কেন ?

খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, স্বরূপ গোস্বামীর ঘাড়ে ওই দোষ চাপিয়ে, ভক্তিবাদী

বিরাজ গোস্বামীও তা মেনে নিলেন ? অদ্বৈতবাদের শিশুপাঠ্যেও আছে, উপাধি ভেদ-
দটিতে পারমার্থিকতা থাকে তত্ত্বে, আর প্রাকৃতত্ত্ব বা ব্যবহারিকত্ব থাকে উপাধিতে।
তে তো শুধু পঞ্চভেদই নয়, অনন্তভেদই তো থাকবে উপাধিতে। এও কি পূজনীয়
বিরাজ জানতেন না।

অথচ ওই পঞ্চতত্ত্বাত্মক উপাধিভেদবাদ মূলক শ্লোকটি এবং আরও দুটি শ্লোকই যে জাল
ার গণোদ্দেশ দীপিকার অবলম্ব্য শ্লোক এবং তাকে ভর করেই, যে কবিরাজ গোস্বামীর
রতত্ত্ব রচনার অবলম্বনীয় শ্লোক, এ রহস্য যে চাপা যায় না। দীর্ঘকাল ধ'রে এই সিদ্ধান্ত
লিয়ে চালিয়ে অনেক ডক্টরেট উপাধিধারীর অনেক ঘোষণা, অনেক ব্যাখ্যায়।

অতঃ স্বরূপ চরণৈ রুক্তং তত্ত্ব নিরূপণে।
উপাধি ভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহপ্রদশ্যতে ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্ !
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

খুব বিস্ময়ের কথা, গৌরগণোদ্দেশের এই শ্লোকের বক্তব্যকেই প্রামাণ্য করার জন্য,
খানে আবার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে; পূর্ব্বে যেমন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বাত্মক হ'য়েও পৃথক
কটিত হয়েছিলেন, এবারেও সেইরকম প্রকটিত হ'য়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ—

"যদ্বৎ পুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বৎ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ।"

কি অদ্ভুত ! কর্ণপুরও কি একথা বলতে পারেন ? মিথ্যা কথা। ভক্তিবাদে এ
দ্ধান্ত হয় না।

এরপর ঐ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গের পর গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,
বাস ও গদাধর সম্বন্ধেও প্রত্যেকের তত্ত্বগত অবস্থায়, তাঁরা যে পূর্ব্বজন্মে ব্রজের হ'য়েও
াবার একটি তত্ত্বময় ব্যক্তি হয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, এই তত্ত্ববাদই শ্রীকবিরাজের
বলম্ব্য হয়ে গেছে।

কিন্তু এ সব শ্লোকের প্রামাণ্য আকরগ্রন্থ কি ? অথচ কবিরাজ গোস্বামীর অবলম্বনীয়
ন্থও তো ঐখান থেকেই ; তবে তিনি বলেন নাই যে, আমি এ তত্ত্ববাদটি, শিবানন্দ
নের-পুত্র কবি কর্ণপুরের গ্রন্থের শ্লোক থেকে লিখছি। কবিরাজ লিখেছেন, স্বরূপের কড়চা
কে জেনেছি। অথচ হিসেব মত ধরলে, কর্ণপুর তো কবিরাজের আগের ব্যক্তি এবং
পুর অমন তত্ত্ববাদের দ্বারা গৌর চরিত্র কোথাও লেখেন নি। লিখতে পারেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে—

শ্রীকবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ব্বের চিন্তা ধারাকেই আশ্রয়
রেছেন অর্থাৎ অতিসত্তার বা অতীন্দ্রিয়সত্তার প্রাধান্য দিয়ে, এবং ব্যক্তি সত্বাকে গৌণ
রে। তিনি গৌরাঙ্গকে আগে দেখেছেন—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥
(চৈঃ আ ১।২।৪ পয়ার) সেই কৃষ্ণ ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান।

আবার শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের ব্যক্তি প্রাধান্যও তিনি দেন নাই, তিনিও ব্রহ্ম সত্বার
গ্রহ কিংবা পরমাত্মার বিগ্রহ, ব'লে দেখেছেন।

এসব ক্ষেত্রে শ্রীকবিরাজ ভাগবত গ্রন্থকেই সর্ব্বোপরি মান্য দিয়েছেন। কিন্তু ভাগবত গ্রন্থটিতে যে বুদ্ধের পরিচয় রয়েছে (ভাঃ ১৩।২৪) এবং চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য্য) নন্দ বংশ চাণক্য, বিম্বিসার, অশোক ও তাঁর পুত্রাদি এবং বৃহদ্রথ, পুষ্যমিত্র, শুঙ্গবংশ) বসু মিত্র এবং কান্ববংশ শিশুনাগবংশ, বিশ্বস্ফটিক, সৌরাষ্ট্রের রাজবংশ এবং কাশ্মীর মণ্ডলে পরিচয় (ভাঃ ১২।১ অধ্যায়,) পাওয়া যায়, সে সব প্রসঙ্গ কি শ্রীকবিরাজের আমলে ভাগবতে ছিল না ? যদি থাকে তাহলে ভাগবত কত খ্রীষ্টাব্দের ?

ইতিহাসের এই সব প্রসঙ্গের অস্তিত্ব দেখেও, ভক্তদের মধ্যে প্রচারিত বক্তব্য হোলো প্রতি যুগে প্রতিকল্পে এঁরা আসেন। কিন্তু তাঁরা একথা বলেন না যে, চাণক্য, অশোক ও ম্লেচ্ছ যবনরা (ভাগবতে ম্লেচ্ছ যবন শব্দ আছে) বেদ বিদ্বেষী হ'য়েও, তাঁরা প্রতি যুগে প্রতিকল্পে অবতীর্ণ হন এবং ধর্ম ও জাতি নিয়ে ভারতও ভাগ করেন এবং হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়।

যদি উপরের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অস্তিত্ব ভাগবতে স্বীকৃত হয়, তা'হলে বেদব্যাসকে খৃষ্টপূর্ব ২য় থেকে পরবর্ত্তি অন্ততঃ ৭।৮ম খৃষ্টাব্দে না আনলে তো তাঁর লেখাই ভাগবত ব'লে ঐ গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য করাই যায় না ; কিন্তু বেদব্যাস রচিত ঐ ভাগবত সম্বন্ধে তো অকুণ্ঠ বিশ্বাসী শ্রীকবিরাজ গোঁসাই তাঁর বিশ্বাসের ব'লেই ব'লেছেন—

সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাই।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।
(চৈতন্য চরিতামৃত আদি ২য় পরিচ্ছেদ]

আবার কৃষ্ণের বেলাতেও কৃষ্ণ নামে পরিচিত ব্যক্তির প্রাধান্যটি তখনই বড় হয়েছে যখন সেই কৃষ্ণ নারায়ণ হয়েছেন।

আবার সেই নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ যে অভিন্ন হ'য়েছে এবং একই বিগ্রহ হয়েছেন কিন্তু আকার বিভেদ। এখানেও ভাগবতের প্রমাণে তিনি জেনেছেন নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণ গোলোকবাসী তিনি কিন্তু কৃষ্ণ নন, তবে কৃষ্ণই নারায়ণ।

কবিরাজ গোস্বামী নিজেরই তোলা পূর্ব পক্ষ সৃষ্টি ক'রে আবার শ্লোকের প্রমাণ দিয়ে নিজেই উত্তর সাজিয়েছেন—

এই মত নানারূপে ক'রে পূর্ব পক্ষ। তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ ॥

কবিরাজ গোস্বামী সেই কৃষ্ণকে মুখ্য তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ ক'রে, যেন প্রতিপক্ষেরই মুখ বন্ধ ক'রে উত্তর দিয়েছেন—

শুন ভাই। এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্য তত্ত্ব, তিনি, তাঁহার প্রচার ॥
জ্ঞান তত্ত্বময় হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তিন তার রূপ।
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈল, নির্বচন ॥
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥
(চৈ চ° আদি ২।৫৪)

একথা ব'লেই কৃষ্ণ যে ভগবান এবং তিনি যে ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং শ্লোকটির উপপাদ্য তুলেছেন, শ্রীকবিরাজ এই প্রসঙ্গেই ভাগবত বক্তাকে বলেছেন মু

গোস্বামী ভয় পেয়েই ব'লেছেন অন্যান্য পুরুষরাও পাছে পূর্ণ হ'য়ে যান, তাই তিনি পরিস্কার ক'রে ব'লেছেন, অন্যান্যরা অংশ কলা, আর কৃষ্ণ হ'লেন পূর্ণ।

তবে সুত গোঁসাই মনে পাইয়া বড ভয়।
যার যা লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥
অবতার সব, পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংস ॥

কবিরাজ গোস্বামী এক্ষেত্রে ন্যায় শাস্ত্রের শব্দ খণ্ড থেকে যে বিচার পদ্ধতির রীতিটি অর্থাৎ অনুবাদ, বিধেয়, অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, তাতে তাঁর অজ্ঞাতে ফুটে উঠেছে মধ্যযুগের টৌলিক চিন্তা ধারা। অর্থাৎ সে যুগের অথবা এ যুগের সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার পণ্ডিতদের মধ্যে, বিশেষ করে ন্যায়, শাস্ত্রে এমন অভ্যাস আছে যে, নিজে প্রসঙ্গ তুলেই সেইটিতেই নিজেদের বক্তব্য বিষয় যাই হোক না কেন, কোনও এক প্রসঙ্গ ভরে দিয়ে সেইটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে নানা শ্লোক বচন পুরাণ শ্রুতি প্রভৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে তাকে দুর্বোধ্য করা। ইতিহাসের ধারা থাক্ বা না থাক্ তাতে ধর্ম্ম ও তত্ত্বের চিন্তার ঘুর্ণিতে তাঁদের বক্তব্য বিষয়টি ঘোরাল হ'য়ে যাক' অথবা হারিয়ে যাক, কিন্তু স্থবির ও অলক্ষ্য ধর্মতত্বটি অর্থাৎ সনাতন ধর্মতত্ত্ব নাকি তাতে জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'রতে গিয়ে, আসল বক্তব্য ছেড়ে কোথায় কত দূর যে এগিয়ে যান, সে খেয়াল থাকে না। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মন তেমনি ধরণের সংস্কার থেকে যে মুক্ত হয়েছিল তা মনে হয় না। অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান ছিল কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।

কারণ কৃষ্ণই ভগবান, এটি কি প্রথমেই তাঁর বক্তব্য ? তাতো নয়, মূল লেখ্য বিষয় তো শ্রীচৈতন্যের জীবন কথা। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে কৃষ্ণেরই আর এক নাম, অথবা গৌরকান্তিতে কৃষ্ণেরই আবার আবির্ভাব, এইটি বলার জন্যই কি কৃষ্ণের তত্ব ও লীলা প্রকাশের কথা বিস্তৃত করে ব'লেছেন ? তর্ক পদ্ধতির আর একটি লিখিত ধারা হোলো, যেন আমি প্রথমে যা ব'ল্লাম, তাই যখন তোমরা মেনে নিলে, তখন আমার আদি বক্তব্যের ধারায় এসে বোঝো যে, আমি যাই বলি তাই ঠিক···

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এসব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
চৈতন্য গোঁসাইর এই তত্ত্ব নিরূপণ।
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥

তারপর কবিরাজ গোস্বামী তাঁর পূর্ব্বাচার্যগণের অনুসৃত পথেরই অনুসরণ ক'রেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যদের (পৌরাণিক পদ্ধতি ক্রমে) পথ হোলো—(১) মর্ত্তলোকের কষ্ট দেখে নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণকে নিবেদন ক'রে বলে থাকেন এবং তাঁর অনুরোধে নারায়ণ এই ধরায় অবতীর্ণ হন কোনও ভাগ্যবান ভাগ্যবতীকে পিতা মাতা স্বীকার ক'রে।

(২) মর্ত্তের কোনও তপস্বিনী ও তপস্বীর প্রার্থনায় নারায়ণ তাঁর পুত্র হন

(৩) দেবতারাও মর্ত্তে দানবের দ্বারা পীড়িত,অত্যাচরিত হ'য়ে নারায়ণকে মর্ত্তে অবতীর্ণ করান। (৪) নারায়ণ স্বয়ংও মর্ত্তের কষ্টের কথা শুনে ও অবস্থা দেখে অবতীর্ণ হন। (৫) ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় দেখে ব্যথিত হ'য়েও অবতীর্ণ হন। ইত্যাদি।

কবিরাজ গোস্বামী এ ক্ষেত্রে আরও একটু রসাল ক'রে ব'লেছেন, জনগণের যে চির-অদৃষ্ট স্থান গোলোক, সেই ভূলোকোত্তরের অধিপতি যিনি, তিনি, ভগবান এবং তিনিই কলিযুগে মর্ত্তলোকে সংকীর্ত্তন ধর্ম প্রচার ক'রতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি গোলোকের মধ্যে আবার ব্রজধাম নামেও একটি স্থানে চিরকালবাস করেন। ব্রহ্মার একটি দিনে (মর্ত্ত-লোকের দিন সংখ্যায় তা বহুদিন) মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। সেই গোলোকস্থ ব্রজবিহারীর আগমনের হেতুই ছিল ধর্ম প্রচার—

"পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার
গোলোকে এঁদের সহ নিত্য বিহার।
ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার
অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার॥"

সেই কৃষ্ণ—

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

পূর্ব সঞ্চিত সংস্কারের অতিসত্তায় আকৃষ্ট শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর মন পৌরাণিক ছাঁচে কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিয়েছেন। তাছাড়া, অনুভব ক'রেছেন কৃষ্ণের মানস ভূমিকাটিও। শ্রীকৃষ্ণ বিচার ক'রে স্থির ক'রেছিলেন কলিতে নাম সংকার্ত্তন প্রচার করতে হবে, 'যুগধর্ম প্রবর্ত্তাইমু—

চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
চারিটি ভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর।

এই রকম বিচার ক'রেই গোলোকবাসী সেই ব্রজেন্দ্র কুমার আরও স্থির করেছিলেন—

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সভারে।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় আদি ৩।২২

সেই গোলোকের অধিপতি কৃষ্ণই এবার নদীয়ায় অবতীর্ণ হ'লেন, তাঁর প্রথম জীবনের নাম হোলো বিশ্বম্ভর, আর দ্বিতীয় জীবনের নাম হোলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। (এখানে কিন্তু বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, গৌর নন, কারণ সর্বাদৌ বিষ্ণু বা নারায়ণ, তারপর তিনি কৃষ্ণ, তারপর তিনি গৌরাঙ্গ।)

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূত গ্রাম।

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈলা ধন্য॥ (শেষের সিদ্ধান্তটি শ্রীজীবের)

অন্যান্য যুগে তাঁর অঙ্গের বর্ণ দেখেই ভক্ত সাধকেরা জানতে পারেন ইনি সেই গোলোকের পতি। শুক্ল বর্ণ, রক্ত বর্ণ, ও পীত বর্ণ, এই তিন বর্ণে আবির্ভূত হন। কলিযুগে তিনি পীতবর্ণের অঙ্গকান্তি ধ'রে আবির্ভূত হন।

কলিকালে যুগধর্ম নামের প্রচার চৈঃ আ ৩।৩১

এখানে কবিরাজের এই বক্তব্যগুলি কি স্বতন্ত্র নাকি পরতন্ত্র? যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তাই সে কথার উত্তর দিতে মহাভারত ও ভাগবতের শ্লোক দিয়ে তিনি নজীর টেনেছেন। এতেও তাঁর অজ্ঞাতে ফুটে উঠেছে মহাভারত ও ভাগবতের বক্তব্যই যেন তাঁকে সমর্থন করে এপথে টেনে এনেছে।

প্রতিটি শ্লোকের শব্দকে ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায় দীর্ঘায়িত ক'রে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমুরারি, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস প্রভৃতির মত পৌরাণিক পন্থাকে অনুসরণ ক'রতে গিয়ে, শ্রীচৈতন্যের আর এক নূতন তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা চৈতন্যের স্বরূপেই নয়. এমনি সংস্কার মধ্য-যুগের আরও আগে থেকে যে রীতি চলে আসছিল তা তো এখানেও হয়েইছে, তাছাড়া হ'য়েছে অভিনব এক তত্ত্ববাদ।

ঠিক এমনি ক'রে কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দকেও হলধর বলরামের লোকাতীত অতিসত্বাটির আরোপ ক'রেছেন এবং অদ্বৈতেরও আর এক ঈশ্বরের অতিসত্বাকে স্থাপন ক'রেছেন।

নিত্যানন্দ গোঁসাই সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য গোঁসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

শ্রীকবিরাজের এই অতিসত্বা বা অলৌকিক সত্বাকে স্থাপনের সঙ্গে, বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের ফল ও প্রভাবের সঙ্গে তুলনা মূলক কোন প্রসঙ্গ তুললেই, কবিরাজ গোস্বামী তাঁকে পাষণ্ডী এবং যমের দণ্ডনীয় ব্যক্তি বলে মনে করেন।

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥ চৈঃ আদি ৩।৬৪

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ভাগবত, ভারত ও আগম এবং পুরাণের শ্লোক তুলে তুলে ব্যাখ্যা ক'রে ব'লেছেন—

শ্রীচৈতন্য যে কৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তই যাবতীয় শাস্ত্র তাই প্রমাণিত ক'রেছেন। এতে কেউ যদি তাঁর অলৌকিকত্বের অনুভব না মানে, তবে সে অভক্ত, তাকে সূর্য্যের আলো দেখতে অসমর্থ যেমন প্যাঁচা, তার সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। অর্থাৎ বাস্তব সূর্য্য আর বাস্তব প্যাঁচা এবং অবাস্তব বা অলৌকিক কৃষ্ণের সঙ্গে প্যাঁচার বাস্তবতাকে উপমা উপমেয়ের স্থল ক'রেছেন, তা যেকি করে হয়, কবিরাজ গোস্বামীই বলতে পারেন, মধ্য যুগীয় সংস্কারে গভীর নিষ্ঠা রেখেই হয়তো বা তিনি এই রীতিতেই শ্রীচৈতন্য চরিত্র অঙ্কন ক'রেছেন—শ্রীকবিরাজের ভাষ্য—

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ॥

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব।
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের প্রমাণ।

এরপর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী আর একটি পথ অবলম্বন ক'রেছেন, প্রথমে যে ব'লেছেন গোলোকে ব'সে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রকুমারই নদীয়ায় অবতীর্ণ হবেন স্থির ক'রলেন, তাই জানতে পেরে অদ্বৈত হুঙ্কার করলো—আচার্য্য অদ্বৈতের হুঙ্কারের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'য়েছেন—

আচার্য্য গোঁসাই প্রভুর ভক্ত অবতার
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার। /

শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ শ্রীগৌরাঙ্গের বয়োজ্যেষ্ঠ, অতএব সামাজিক নিয়মে তাঁরা গুরুজন। তাঁরা শ্রীচৈতন্যের আগেই জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন অথবা গোলোকপতি তাঁদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত দেখলেন মর্ত্ত্যলোকের খুব দুঃখ কষ্ট চলছে। এই দুঃখ দূর ক'রতে কৃষ্ণের আগমনের প্রয়োজন। অতএব তিনি আসুন। তিনি শুদ্ধভাবে কৃষ্ণ আরাধনা ক'রতে ক'রতে বুঝলেন এবার কৃষ্ণ আগমন ক'রছেন—

লোকগতি দেখে আচার্য্য করুণ হৃদয়
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার।

• • • •

কৃষ্ণেরে আহ্বান ক'রে করিয়া হুঙ্কার
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার ॥

কবিরাজ গোস্বামী কোনটিকে প্রাধান্য দিলেন? অর্থাৎ গোলোক বাসী শ্রীকৃষ্ণ কি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হ'লেন অথবা ভক্তের ইচ্ছায় আগমন ক'রলেন? এমন প্রশ্নের সমাধানের জন্য কবিরাজ দুই রকম হেতু বাক্যই দিয়েছেন। তারপর আবার একবার ব'লেছেন "প্রেম ভক্তি দান ক'রতে এবং নাম সংকীর্ত্তন ধর্ম প্রচার ক'রতে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'লেন, আর দ্বিতীয় বার ব'ল্লেন অদ্বৈতের আহ্বানে এলেন—

চৈতন্যের অবতারে দুই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্মসেতু ॥

তারপর কবিরাজ গোস্বামী (৩) তৃতীয় হেতু ব'লেছেন। পূর্ব্বে যে দুই প্রকার হেতু বাক্যের কথা ব'লেছেন সে দুটিকেও আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে বহিরঙ্গ হেতু ব'লেছেন, অন্তরঙ্গ হেতুটি অন্য—

সত্য এই হেতু কিন্তু হয় বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।

পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্যও শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেন, সে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয, ওসব তো বিষ্ণুই করেন, তাতে কৃষ্ণের আসার প্রয়োজন নেই, কৃষ্ণ যে

গৌরাঙ্গ রূপে এলেন, তার মূল কারণ প্রেমের নির্য্যাস আস্বাদন ক'রতে এবং জন সাধারণকে রাগ মার্গের ভক্তির সাধনা দেখাতে—

যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ
প্রেম রস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগ মার্গে, ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥

গোলোকের পতি ব্রজেন্দ্র কুমার পরম করুণাময়। তিনি স্থির ক'রেছিলেন প্রেমের নির্য্যাস আস্বাদন ক'রবো এবং মর্ত্তবাসীদের রাগ ভক্তির পথ দেখাবো, প্রকৃত সত্য এইখানে।

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ,
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্‌গম।

•   •   •

এই শুদ্ধভক্ত লইয়া করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভূত বিহার।

কবিরাজ গোস্বামী মনে করেন, গোলোকপতি সেই কৃষ্ণের মনে নিশ্চয় হ'য়েছিল যে উপপতি ভাবে লীলার প্রচারটি নারায়ণের বৈকুণ্ঠেও হয় নাই। মর্ত্তলোকে তাই ক'রবেন। ঠিক এর পূর্বে যেমন ব্রজের গোপীরা আমাকে উপপতি ভাবে ভেবেছিল তেমনি। সেখানে যোগমায়া যেমন সব ঢেকে রেখেছিলেন—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলার করিব যাতে মোর চমৎকার।
তৎ তৎ বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তির প্রসাদ' ॥
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম' কর্ম ॥

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে, শ্লোকের ভাগবতের ১০।৩৩।৩৬ শ্লোক উপস্থাপিত ক'রেছেন। শ্লোকের বক্তব্য হোলো, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ ক'রেই দেহ আশ্রয় ক'রেই শ্রীকৃষ্ণ ঠিক মানুষের মত কাজ করেন। আর সেই কাজ যেন মানুষও করে। কিন্তু এ প্রমাণটি এমন বিপজ্জনক হয়ে যায় যে, ঈশ্বর যে কাম ক্রীড়াদি ক'রেছেন মানুষও তাই যেন অবশ্যই করে'। এর অর্থ তো তাই দাঁড়ায়, ফলে কবিরাজকে শ্লোকের তাবৎ ক্রিয়ার অর্থকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাখ্যান ক'রতে হ'য়েছে। সেটির অর্থ এমন হয়েছে যে মধ্যযুগের ব্যাখ্যায় ও লেখায় পণ্ডিতদের স্বাভাবিক টানই যেমন ছিল।

এত গোপনীয় ব্যাখ্যা বেদব্যাসেরও মনে উঠে ছিল কিনা কেউ জানেন না। কিন্তু শ্রীকবিরাজ জানেন। তিনি মনে করেন না যে, বেদব্যাসের অবস্থিতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে অবশ্যই ছিল, কিংবা তার আগে, নইলে অন্ধ ও কাম্ব বংশের কাহিনী যে শ্রীভাগবতে আছে এটা তিনি অবশ্যই দেখতে পেতেন।

যাক্, এখন শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের হেতুটিকে এই রকম ব'লে, শ্রীকবিরাজ এমন কয়েকটি পয়ার রচনা ক'রেছেন, যার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পুরো গরমিল হ'য়ে যায়, উনি পূর্ব্বে ব'লেছেন—

সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোঁসাই
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।

আদি ।২।১৪

কলিকালে যুগ ধর্ম নামের প্রচার
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্য অবতার
আদি ।৩।৩১

তারপর, শ্রীচৈতন্য অবতারের যে আরও গূঢ় কারণ কি কি থাক্‌তে পারে সেগুলি পর পর ব'লে শেষ ব'লেছেন—

এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান,
যুগধর্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥

এ সিদ্ধান্ত শ্রীকবিরাজের বোধহয় নিজের কথায় নিজেরই কেমন সংশয় জেগেছিল এবং সামঞ্জস্য করার পথ কি তাই মনে ক'রে পরে ব'লেছেন—

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম হৈল সে কালে হইল মিলন ॥
দুইহেতু অবতার লইয়া ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥

ঐ ৩৫

কি বিস্ময়কর কাণ্ড। অপার্থিব কৃষ্ণতত্ত্ব নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে যুগধর্ম নাম প্রচারের ব্যাপারটিকে, জুড়ে দিয়েও শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন আখ্যাটিকে একটি অতিবাস্তব পর্য্যায়ে পরিণত করেছেন।

এরপর নিজেই ব'লেছেন আমি এতদূর ব'ল্লাম, তাও কিন্তু বাহ্য—

অবতারী প্রভু প্রচারিলা সংকীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥

তারপর এই চৈতন্য অবতারের আরও একটি গূঢ় কারণ আছে, সে কারণটি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রখ্যাত ভক্তদের মধ্যেও অজ্ঞাত। তবে একমাত্র জ্ঞাত ছিলেন "স্বরূপ দামোদর" তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি!

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার ॥
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥

এই পর্য্যন্ত ব'লেই, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য অবতারের হেতুবাদগুলি থামিয়ে দিয়েছেন।

এর ফলে দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, একটি অ-নবস্থাদোষ, আর দ্বিতীয়টি, নিষ্কাম ঈশ্বরের জন্মান্তরীয় দেহের প্রতি আশা বা কাম।

অর্থাৎ এই হেতু, এই হেতু, এই হেতু, এইরকম কয়েকবার হেতু বা কারণ বলাতে পূর্ব হেতুটির মৌলিকত্বে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরবর্ত্তী অবস্থাটিও যে চঞ্চল, এমনই আর একটি হেতুর সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে উপপাদ্য ও উপপাদকের অ-বিশ্রান্তি প্রসঙ্গ আপনা আপনি এসে পড়ে।

কবিরাজ গোস্বামীর মত ব্যক্তি কেন যে এতগুলি হেতুবাক্য সৃষ্টি ক'রে গৌরাঙ্গ তত্ত্বকে তাঁর যথাযথ জীবন চরিত থেকে পৃথক ক'রেছেন, সেটির গোপন কারণ কিন্তু গোপনে রাখেন নাই। মুরারি, কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাসও গৌরাঙ্গ চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে তত্ত্ববাদকে পৃথক ক'রেছেন ঠিকই, কিন্তু এমন একটি মাত্র ব্যক্তির অনুভূত সিদ্ধান্তকে (স্বরূপ দামোদরের সিদ্ধান্তকে) প্রামাণ্য করার পথ তাঁরা দেখান নাই। যেখানে ভাগবত, গীতা, মহাভারত প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থাবলীর শ্লোককেই প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য উক্তি দিয়ে, গৌরাঙ্গ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, সেখানে গৌরাঙ্গের ও তাঁর সমকালের এবং সহাবস্থিত কোন একটি মাত্র ব্যক্তির কথাকেই কেন এমন প্রামাণ্য করার ঝোঁক কবিরাজের মনকে আকৃষ্ট ক'রেছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা তো নিষ্কাম। তবুও ঈশ্বর বিগ্রহটি সকাম, এবং সেটাও তো গুণময় সৃষ্টির প্রথম ক্ষেত্রে। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়"।

সেই ঈশ্বর যদি মায়া বা বৈষ্ণবী মায়া বা যোগমায়ার প্রভাবে কাম বা সকাম হন এবং কামনা এক জন্মের পর অন্য জন্মে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তবে সে কথা কোন বিজ্ঞের পক্ষে প্রকাশ ক'রলে, ব্যক্তির চরিত্রটি সব ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যই সৃষ্টি করে। তার জন্য কেউ যদি প্রতিবাদ ক'রলে, তাতে যে বিজ্ঞ ক্রুদ্ধ হন তর্ক করেন, অপরকে অভদ্র ভাবেন, অপরের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেন, এবং অন্যান্য শ্লোক তুলে নিজের বক্তব্যকেই সমর্থন করেন, তাহলে বলতে হয় এটাতো মধ্যযুগীয় কাণ্ড। তাও আবার নিজের লেখা গ্রন্থে, এ ত্রুটিগুলি বড় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে শ্রীচরিতামৃতে।

তবে মানসিকতায় গুরুনিষ্ঠা এমনই ব্যাপার যে, বক্তার বা লেখকের ভাবকেন্দ্রিক পরিবেশের পরিমণ্ডলেই সব দেখতে শুনতে বুঝতে ভাল লাগে। সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজের সংস্কারের অনুকূলে গুরুকে পেলে, সে নিষ্ঠা আরও বলবতী হয়। কবিরাজ গোস্বামী তো মধ্যযুগের পণ্ডিত ও সাহিত্যিকর সংস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর মানস ক্ষেত্রটি কিভাবে সংস্কার বদ্ধ হওয়ার অবকাশ পেয়েছিল তা তো পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তবুও সংক্ষিপ্ত আকারে ছক করা চলে—

কবিরাজ গোস্বামীর আবাল্য মানস সংস্কার গঠিত হয়েছিল—

(১) অহিন্দু রাজ শাসনের আওতায়—

(২) বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাবে

(৩) উচ্চবর্ণের কৌলিন্য গর্ব্বী সমাজ শাসকের নিয়ন্ত্রণে এবং যারা অনুচ্চ বর্ণের

মানুষের মেধা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি ক'রতে, জাতি বর্ণের ধুয়া তুলে এবং স্মৃতি, দর্শন, ধর্ম ও আচার মূলক শাস্ত্রাদির পঠন ক'রতে অস্পৃশ্য বর্ণকে রীতিমত বাধা দিতেন।

(৪) বাংলা বিহার উড়িষ্যায় যখন বৌদ্ধদের দেব দেবীকে ঈশ্বরীয় তত্ত্বে আরাধনা করা হোতো।

(৫) সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য দেওয়া হোতো। আর প্রায় প্রদেশেই যখন বজ্রযানী, সৌত্রান্তিক ও যোগাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আত্ম-তত্ত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন দৃষ্টিকেই জ্ঞান ভক্তির প্রবেশ দ্বার বলা হোতো এবং সেই সংস্কারই বর্ণাত্মক ও তত্ত্বময় বাক্যগুলি অমোঘ শাস্ত্রবাক্য ব'লে মেনে নেওয়া হোতো।

(৬) যে সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তম অষ্টম নবম শতাব্দী থেকে প্রচলিত প্রেমিক কৃষ্ণ-নায়কই (মহাভারতের কৃষ্ণ নন) বৈষ্ণব ধর্মের প্রবাহ প্রসারিত ক'রতেন।

(৭) যে সময়ে দ্বারকা বিহারী বা কুরুক্ষেত্রের সমর নায়ক কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃন্দাবনে গোপ রমণীর নায়ক কৃষ্ণের আচরণকে মাধুর্য্য মণ্ডিত ও উপাসনা বৈভব বলে ভাগবতীয় চিন্তাধারায় তত্ত্ববাদের উদ্ভাবন হ'য়ে চলেছে।

(৮) যে সময়ে হিন্দু রাজা মাত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে ও ঈশ্বরের অংশে জন্মলাভ করেন, এমন বিশ্বাস নিয়ে প্রজারা বাস ক'রতেন।

(৯) যে সময়ে ব্যবহারিক রীতির মত ঈশ্বরীয় তত্ত্বেও উত্তরাধিকার সূত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাব বোধ হোতো। নারায়ণ বা বিষ্ণুই আবার রাম হন, কৃষ্ণ হন এবং লক্ষ্মী ব অন্যান্য দেবী হন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও পূর্ণতমত্ব নাই।

(১০) যে সময়ে পূর্বোক্ত কারণের জন্যই মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও গৌণ হোতো কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরীয়ত্বের উত্তরাধিকারিত্বই মুখ্য বলে প্রচারিত হোতো।

(১১) যে সময়ে অতিবাস্তব সত্বাটি পুরোহিত তন্ত্রবাদের মাধ্যমেই বিকশিত হোতো কিন্তু তা সবারই বোধ করবার উপায় ছিল না।

(১২) যে কোন পুরাণ বা পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকমালার (গল্প কাহিনী, ঐতিহ্য ইতিহাস, তত্ত্ব, উপদেশ, নীতি, আচার সম্বলিত) পুঁথিই বেদব্যাস রচিত বলে ধারণ করা হোতো।

(১৩) যে সময় বেশীর ভাগ কবি তাঁদের কাব্যগুলিকে রূপক নামক অর্থালঙ্কারে অলংকৃত ক'রে, পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি লাভ ক'রতেন। অর্থাৎ উপমেয়কে উপমান রূপে বর্ণনা ক'রে, বাস্তব ও অতিবাস্তব সত্বাকে এক ক'রে ফেলতেন ; এবং উপমেয়ের স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিত গুণ ক্রিয়াদি এবং তার স্বরূপাবলিকে প্রকারান্তরে বা উপমান সম্ভাবিত ক'রে উৎপ্রেক্ষা অলংকার করার চাতুর্য্য প্রকাশ ক'রতেন।

(এই দুটি অর্থালঙ্কারই কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সর্ব্বাধিক, তাছাড়া শ্রীকবিরাজে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীও কৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকায় পরিস্ফুট)।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটিতে তাঁর মানস ভূমিকটিও তাঁ সংস্কার প্রবাহটি তাঁর মনকে এত গভীর ভাবে আকৃষ্ট ক'রেছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গে তত্ত্বকে তিনি নানাভাবে বিশ্লেষণ করেও শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর রচনা ব'লে যে সহজ মতে মেনে নিয়েছিলেন।

"রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্।

এই শ্লোকটিই প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই
* রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

এসম্বন্ধে কিন্তু প্রবীন পুরাণগুলির মধ্যে, রাধার দেহাবস্থানের পরিচয় কোথাও নাই। ন কি কৃষ্ণকথা বা ব্রজের কৃষ্ণকাহিনীর পূর্ণভাণ্ডার ভাগবতেও নাই। আর শ্রীকবি-জও কোথাও বলেন নি শ্রীরাধা ছিলেন দেহময়ী। তিনি ব'লেছেন শ্রীরাধা হলেন কৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার, তিনি তত্ত্বময়ী। একাধারে তত্ত্বময়ী ও তনুময়ী রাধার বিস্তৃত থা ও কাহিনীর উল্লেখ ১০ম ১১দশ শতাব্দীর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই আছে। পুরাণটির মকরণও যেমন বিচিত্র, কাহিনীগুলিও তেমনি অদ্ভুত। হেন কাহিনী নাই, যাতে কাম াতে তার শেষ পরিণতি নাই! আর তেমন পরিণতি ঘটেছে পূর্ব্বের সব পুরাণের বান এবং তাঁর শক্তিদের মানবীয় আচার আচরণের মধ্যে। তাঁদের আচার আচরণ নব-মানবী হ'য়েও অবাস্তব ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করা হ'য়েছে। সেই কেই সংক্ষিপ্ত সার করে পুরাণটির নাম করণ এবং ব্রহ্মের বিবর্ত্তন হয় বলেই বৈবর্ত্ত; ম সত্য, আর বাকী সব মিথ্যা। সত্য ব্রহ্মে মিথ্যারই ভ্রম, তারই নাম বিবর্ত্ত, সেই বর্ত্তই আবার সগুণ সাকার। এটি অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত, আর সৌত্রান্তিক ও াগাচারী বৌদ্ধদেরও ছায়া সিদ্ধান্ত, এই নিয়েই ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের জন্ম।

ওই পুরাণের কাহিনীগুলিও ঐ দৃষ্টির কোণ থেকেই লেখা। শিব, রাম, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, র্গা, সীতা, সাবিত্রী রাধা প্রভৃতিকে নিয়ে যত কাহিনী, সবই ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত হ'য়ে াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য, বাকী সব মিথ্যা। কৃষ্ণ ও রাধার কাহিনীও ব্রহ্মের বর্ত্তিত। ঐ পুরাণটির লেখকের এই হোলো সিদ্ধান্ত।

শ্রীভাগবতের কৃষ্ণ ছিলেন গোপ কুমার (মহাভারতের কৃষ্ণ নন, তাঁর পিতাও বসুদেব ন। ভাগবতের কৃষ্ণের পিতা নন্দ। শিশুকালেই একদিন পিতৃবক্ষে অবস্থান ক'রতে রতে ভাণ্ডীর বনে উপনীত হলেন। অন্যান্য গোপ ও শ্রানন্দ গোচারণ ক'রতে গিয়ে-লেন। সেইসময় এক বৃক্ষ মূলে ব'সেছিলেন। গোরুগুলি আশপাশে চরছিল। এই সময় ষ্ণ মায়া সৃজন ক'রলেন। মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ, পরে এল বৃষ্টি। শিশু কৃষ্ণ ভয়ে াদতে লাগলেন। তার ওপর এল ঝড়। আরও ভয় পেয়ে গেলেন শিশু কৃষ্ণ। নন্দ স্তিতই হ'লেন। ইত্যবসরে একটি মেয়ে সেখানে এসে হাজির। নাম শ্রীরাধা। নন্দের

* এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা এবং শ্লোকের মধ্যে কোথায় কি দোষ তার সংক্ষিপ্ত রিচিতি এ গ্রন্থের শেষ ভাগে দিয়েছি।

প্রতিবেশিনী। অপরূপ গঠন আর তেমনি সুন্দরী। তাকে দেখেই নন্দ বিস্মিত হ'লেন। তাঁর মনে প'ড়লো, এইতো সেই মেয়ে, যার নাম রাধা। ইনিই তো শ্রীহরির প্রিয়া। এ কথা তো আমাদের গর্গ পণ্ডিত ব'লেছিলেন। যাই হোক, এরই সঙ্গে কৃষ্ণকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই। এ কথা ভেবেই শ্রীনন্দ শ্রীরাধার হাতে কৃষ্ণকে অর্পণ ক'রলেন, আর ব'ল্লেন, হ্যাঁ নিয়ে যাও, ইনি তোমার প্রাণনাথ। ভোগ ক'রে নাও পথে, তারপর আমার ছেলেকে ফেরৎ দিও। কৃষ্ণ তখনও কাঁদছেন ভয়ে। রাধা তাঁকে নিলেন কোলে।

গীত গোবিন্দ কাব্যের এই হল উৎস "রাধে গৃহং প্রাপয়।" রাধা বল্লেন নন্দকে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটি কাউকে ব'লবেন না। আপনি আমার কাছে বর নিন। নন্দ বর চাইলেন, রাধা এবং কৃষ্ণে যেন অচলা ভক্তি থাকে আমার। রাধা তাঁকে বর দিলেন তাই হবে। রাধা পথে আসতেই কৃষ্ণ মায়াময় দেহ ধারণ ক'রলেন। কৃষ্ণ হলেন সুঠাম গড়নের কিশোর-যুবা। পথে একটি রমণীয় কুঞ্জ ছিল। কুঞ্জের ভিতরে ছিল সাজানো ঘর, তার মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করলেন। সে ঘরে সব সাজান ছিল। উভয়ের দেহমনে মদনের বিকার পরিপূর্ণ হ'য়ে হ'য়ে নানান বিকার দেখা দিল। নিবৃত্তিও হোলো দেহ উপভোগের দ্বারা। কৃষ্ণ ব'ল্লেন রাধাকে রাধে! আমরা উভয়ে কে মনে প'ড়ছে? গোলোকের সেইসব ঘটনা তোমার মনে আছে তো? "রাধে স্মরসি গোলোকো বৃত্তান্তং কচিৎ চ সুর সংসদি?" তুমিই আমার সব। গন্ধ ছেড়ে পৃথিবী থাকে না, মাটি ছেড়ে ঘট থাকে না, শরীর ছেড়ে শরীরী থাকে না। এমনি ভাষায় আরও শ্লোক।

তুমি শক্তি, আমি শক্তিমান। তুমি আমার অংশ, আমি অংশী, তুমি মূল প্রকৃতি, তুমি ঈশ্বরী। আমি ঈশ্বর। শক্তি দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা আমরা উভয়ে তুল্য। যারা আমাদের ভেদবুদ্ধি করে, তারা কাল সূত্রে বাঁধা পড়ে সাত পুরুষকে নরকে পাঠায়, আর নিজের কোটি পুণ্যকে বিনষ্ট করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাধা বল্লেন, হ্যাঁ প্রভু! আমার সব মনে প'ড়ছে, তোমারই কৃপায় আমি বুঝতে পারছি, আমি কে তুমি কে? ইত্যাদি ইত্যাদি

"স্মরামি সর্বংজানামি বিস্মরামি কথং বিভো?

তারপর আবার উভয়ে উভয়কে জড়াজড়ি ক'রে ধরলেন, এমন কি উভয়ের প্রতিটি অঙ্গের সাথে প্রতিটি অঙ্গের মেলামেশা হ'য়ে গেল। তখনই হোলো অদ্বৈত মূর্ত্তি।

প্রত্যেক মঙ্গং দৃষ্টৈব দত্বা শান্তে মুখাম্বুজে।
দৃষ্টামুখারবিন্দং চ নাঙ্গাজং ন সা ক্ষমা॥
ন খণ্ডনীয় মদ্বৈতং রূপং পূর্বং নিরূপিতম্
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপং হি লাবণ্যপরিমণ্ডিতম॥

সেই অদ্বৈত অবস্থায় কৃষ্ণ ব'ল্লেন রাধাকে, রাধে! এ মূর্ত্তিকে কেউ খণ্ডিত ক'রতে পারেনা। আমরাই স্বেচ্ছায় পারি, যথাকালে।

এই অবস্থায় তাঁরা যখন জড়াজড়ি হ'য়ে আছেন সেই সময় সেই কুঞ্জে এলেন ব্রহ্মা।

এতস্মিন্ সময়ে ব্রহ্মা জগাম পুরতো হরেঃ"

রাধা ও কৃষ্ণ মুহুর্ত্তের মধ্যে দেহ ভেদ ক'রে কুঞ্জের প্রকোষ্ঠের আসনে পৃথক ভাবে অবস্থান ক'রতে লাগলেন—

ভেদং প্রাপ্য যথাবস্থং উভয়ো রূপ ভেদতঃ
বিধাভূশ্চ বিধাতা হি শ্রীহরিঃ যোগ যোগ্যতঃ ।।

ব্রহ্মা উভয়কে "প্রণময্য পুনঃ কৃষ্ণং রাধাংচ কমলোদ্ভবঃ" । স্তব ক'রলেন। শ্রীকৃষ্ণেরও স্তব ক'রলেন তাঁর চরণে যেন সুদৃঢ়া ভক্তি হয়। আর রাধাকে স্তুতি ক'রে বল্লেন তুমি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ সম্ভূতা কৃষ্ণ তুল্যা, তুমি কৃষ্ণ তুমি রাধা, তুমি হরির বাইরে, হরির ভিতরে অবস্থান করছো। এ রূপ বেদে নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর মাধবের চরণে দাস্য ভক্তি প্রার্থনা ক'রলেন এবং সেই ভাবে বর লাভ ক'রে ব্রহ্মা চ'লে গেলেন। রাধা ও কৃষ্ণ আবার গাঢ় প্রণয় রসে প্রমত্ত হ'লেন। বহু প্রকার শৃঙ্গার-সমরে আসক্ত হলেন, বংশী বাদন, তাম্বূল হরণ ইত্যাদি সেরে সেই পূর্ব্বের মত মায়াময় শিশুরূপ ধারণ ক'রে কৃষ্ণ রাধার বক্ষে আরোহণ ক'রে বাড়ি ফিরে যশোদার কোলে গেলেন।

এইভাবে অদ্ভুত বিচিত্র মায়াময় কৃষ্ণের উপাখ্যানে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেহ ভেদ, দেহ অভেদের কাহিনী সেখানে বিন্যস্ত করা হ'য়েছে।

এটি আছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ১৫ অধ্যায়ে। তারপর আর একটি কাহিনী ৮৪ অধ্যায়ে। সেখানে আছে—ভগবান ব'লছেন, আমি একদিন গোলোকে রাস ক্রীড়ায় মত্ত ছিলাম, অকস্মাৎ আমার বাম অঙ্গ থেকে, ষোল বৎসরের এক বালার উৎপত্তি হোলো। অপূর্ব তার বর্ণ এবং অপূর্ব তার গঠন।

"একদা ময়ি গোলোকে রাসে নৃত্যং প্রকুর্বতি।
আবির্ভূতা চ বামাঙ্গাৎ বালা ষোড়শ বার্ষিকী।"

তিনি আমাকে কটাক্ষের দ্বারা অবলোকন ক'রেই আমার সঙ্গে রমণোৎসুকা হ'লেন। তার পরই রাসে উপস্থিত হ'য়ে আমার সামনে এলেন। ইনিই রাধা, ইনিই ঈশ্বরী, ইনিই প্রকৃতি। ইনি সকলের আধার, ইনি শক্তি, পুরাবিদ্‌গণ বলেন ইনিই সেই রাধা। ঐতেই আমি গর্ভাধান করে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করি। "সা দদর্শ কটাক্ষেণ রমণী রমণোৎসুকা।"

রাসে সংভূয় সা রামা দধার পুরতো মম।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিঃ প্রপূজিতা।
প্রহৃষ্টা প্রকৃতি শ্চাদ্যা সর্ব কার্য্যেষু সাধিকা।

ইত্যাদি—। আর একটি কাহিনী ঐ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের ১৩ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের কাহিনীটিতে নন্দ ও গর্গের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে একটি গূঢ় বিষয় বলা হ'য়েছে, যে বিষয়টির সঙ্গে চরিতামৃতের রাধার দেহবস্থান সম্বন্ধে হেঁয়ালীগর্ভ উক্তির অবিকল মিল পাওয়া যায়।

শ্রীচরিতামৃতের ঐ দুটি পয়ারে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্তটি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের 'হঠযোগ' এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম মিল হ'য়ে যায়। হঠযোগী সিদ্ধাচার্যগণ বলেন (বিন্দু প্রকাশ, রতি চিন্তামণি) আত্মাতেই আত্মবিলাসের রস ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়।

আত্মানমেব প্রকৃতিং পুরুষং বিধায়, বিন্দু বিবর্ত্তয়তি যঃ সহজ ক্রমেণ। মাধুর্য্য কর্ম-

রমণীয়ক চিত্ত মিশ্রং, পশ্যন্ স এব সততং প্রণয়েন মুগ্ধঃ। (বিন্দু প্রকাশ ২য় প্রকাশের ৪র্থ শ্লোক।)

কবিরাজ গোস্বামীরই কথিত স্বরূপ গোস্বামীর কড়চার (যা আজও কেউ দেখেন নাই) একটি শ্লোকের সিদ্ধান্তকেই তিনি শ্রীগৌরাজের চরম ও পরম তত্ত্বনির্দ্দেশ ব'লে মেনে নিয়েছেন। শ্রীরাধার দেহাবস্থানকে এই জন্যই তিনি খুব হেঁয়ালীর ভিতরে রেখে তাঁকে স্ফুটিত ক'রেছেন—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। স্বরূপ শক্তি "হ্লাদিনী" নাম যাহার।

প্রণয় শব্দটি চিত্তের বিকার ভিন্ন অন্য কোনও অর্থে প্রাচীনগণ কোথাও ব্যবহার করেন নাই। মহাকবি কালিদাস (রঘু—২।৫৮, ৬।১২) (পূর্বমেঘ ২৮) শকুন্তলা ৬।৮, বাণভট্ট (কাদম্বরী—৪৯) অমর সিংহ (প্রশ্রয়) গীতা (১১।৪১) উত্তরমেঘ (৪) উত্তরমেঘ (৭৪) মাঘ (৩।৩৮) প্রভৃতি সকলেই প্রণয় শব্দটির প্রয়োগ ক'রেছেন নিজেদের রচিত কাব্য সাহিত্যে ঐ অর্থে।

কবিরাজ গোস্বামীও প্রকারান্তরে কৃষ্ণের চিত্ত বিকারের নামই যে প্রণয়, এই অর্থই গ্রহণ ক'রেছেন। তারপর সেই প্রণয়েরও আবার বিকার ঘটে ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। পূর্বের 'অনবস্থা' প্রসঙ্গও এখানে ঘটিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকারই শ্রীরাধা। আবার সেই প্রণয় বিকারটির অপর নাম কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। তার আর একটি পরিচয়ও আছে, সেটি কৃষ্ণের শক্তি, অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি এবং প্রণয় এই তিনটিই এক। বিকারের অপর এক নাম শ্রীরাধা, এটিকে প্রমাণিত ক'রতে চেয়েছেন বিষ্ণুপুরাণের ১।১২।৬৯ শ্লোক দিয়ে। ৮ চরণের ২ শ্লোকের মাঝখান থেকে তা গ্রহণ ক'রেছেন। কিন্তু সেখানের প্রসঙ্গটি ধ্রুব উপাখ্যান নিয়ে, ধ্রুব বিষ্ণু বা গোবিন্দের স্তব করেছেন সেখানে। "এই জগতের মধ্যে অদ্বৈত সত্তায় অবস্থিত একমাত্র গোবিন্দই অবস্থিত। কলাগাছের ডাল পাতা মিলিয়ে যেমন বৃক্ষবৎ, আসলে কিছুই নাই, এই জগৎটাও তেমনি। এই জগতের তাপকারী শক্তি তোমায় স্পর্শ করেনা। আনন্দ প্রভৃতি শক্তি তোমাতেই আছে, জীবে নাই।

বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ স্বষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্ পত্রাদ্ বাথ দৃশ্যতে॥
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং তা স্থায়ীশ্বর! দৃশ্যতে।
হলাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ, ত্বয্যেকা সর্ব সংস্থিতৌ।
হ্লাদি তাপকরী মিশ্রা, ত্বয়ি নো গুণ বর্জিতে।
পৃথক ভূতৈক ভূতায় ভূত ভূতায় তে নমঃ। (বিষ্ণু পু)
১।১২।৬৮, ৬৯।৭০

উপরের শ্লোকগুলি শ্রীরাধার অস্তিত্বে কেমন ক'রে আনা যায়, তা শ্রীকবিরাজের পরবর্তি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দই হয়তো অনুভব করতে পারেন, কিন্তু টীকাকার শ্রীধরও যা পারেন নাই, এবং সংস্কৃত ভাষা ও গ্রন্থাবলীর আলোচনাকারী পণ্ডিতদেরও তা চিন্তার উর্দ্ধে।

সেই স্বরূপ শক্তিই হ'লেন শ্রীরাধা। তাই কৃষ্ণের তিনি নিজের শক্তি। তিনি

কৃষ্ণেরও ক্রীড়ার সহায়। তাঁর থেকেই দ্বারকায় লক্ষ্মীর গণ, মহিষীর গণ এবং ব্রজাঙ্গনার উদ্ভব।

উপমা হিসাবে কবিরাজ ব'লেছেন—

যেমন শ্রীকৃষ্ণ অবতার ও অবতারী দুই হন, তেমনি শ্রীরাধাও অংশ, কায়ব্যূহ, বৈভব বিলাস প্রভৃতি ভেদে অবতীর্ণ হ'তে পারেন।

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হইতে তিন গুণের বিস্তার।

এখানে অতি সত্বার মধ্যেই উপমা উপমেয়ের এমন রীতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম বাংলা ভাষায় ব্যবহার ক'রেছেন।

এরপর শ্রীরাধার তত্ত্বটিকেও পর্য্যায়বাচী শব্দে এনে কিম্বা ব্যাখ্যা ক'রে এমন ক্ষেত্রে তাঁকে উপনীত করেছেন, যাতে খুব গভীরভাবে আলোচনা ক'রলেও শ্রীরাধার দেহাবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহই থেকে যায় এবং ত'ার কার্য্যাবলী ও বৌদ্ধতন্ত্রের "বজ্রযান" সাধনার কয়েকটি রূপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৭৩ পয়ার থেকে পর পর তুলে দিচ্ছি :—

(১) কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে, (ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের শ্লোকের তুল্য)

(২) কিংবা প্রেম রসময়.........তার শক্তি তাঁর সহ.........

(৩) কিংবা সর্বলক্ষ্মী.........

(৪) কিংবা কান্তি শব্দে.........

(৫) কিংবা রাধা পূর্ণ শক্তি......

এই রাধা এবং কৃষ্ণ কিন্তু একই স্বরূপ, শুধু রস আস্বাদন ক'রতেই দুই রূপ ধারণ করেছেন।

রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

(এখানেও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের আদর্শের ধারা)

"রূপ এবং স্বরূপ" এ দুটি কথাকে কতটুকু ভেদ্ ক'রে, অদ্বৈত এবং দ্বৈত তত্ত্ব পক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়, সে সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ আর কিছু বলেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি তত্ত্ববাদ থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে অথবা জীব ঈশ্বরকে কোথায় রেখে এই রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রলেন, দার্শনিক দৃষ্টিতে তা বোঝার অবসর রাখেন নাই।

শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন এই তত্ত্ববাদের দ্বারাই সেই নিগূঢ়তত্ত্বটি অবগত হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিচার ক'রতে হবে। এ তথ্য অপরে কেউ জানে না। অতি গূঢ় তত্ত্ব এটি, একমাত্র স্বরূপ দামোদরই জানেন বা জানতেন। কারণ তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ—

অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥

স্বরূপ গোঁসাই, প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ।

স্বরূপ গোঁসাইই যে শ্রীচৈতন্যের এই তত্ত্ব নিরূপণ করেছেন, তার হেতু হোলো শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরাগৃহে অবস্থানের সময় তাঁর চেষ্টা দেখে, সে চেষ্টাটি ঠিক যেন ভাগবতের উদ্ধবকে দেখে শ্রীরাধিকার চেষ্টা, (অথচ ভাগবতে শ্রীরাধিকা নামটির কোনও উল্লেখই নাই)।

"রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। সেই ভাব মত প্রভু রহে রাত্রি দিনে।"

এই হেতুবাদটি অথবা লক্ষ্যটি কিন্তু স্বরূপ গোস্বামী ছাড়া কেউ জানতেন না। যদি কারোর গ্রন্থে এ তথ্যটি দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে তিনি স্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত থেকেই নিয়েছেন, অন্যত্র কুত্রাপি কারোরই তা অজ্ঞাত।

"যেবা কেহো অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাইর তেঁহো অত্যন্ত মর্ম যাতে॥"

এরপর হ্লাদিনী শক্তিময়ী শ্রীরাধার ভাব, কান্তি, গুণ ও ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের বর্ণনা এবং কৃষ্ণ সুখ-মাত্রই যে তাঁর কাম্য, এমন এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তিধরী শ্রীরাধা রমণীর আনুগত্যে শুদ্ধা ভক্তির সাধনার ইঙ্গিত জ্ঞাপন ক'রে কবিরাজ ব'লেছেন—সেই রাধার ভাব নিয়েই চৈতন্যের অবতার এবং সেই সঙ্গে যুগধর্ম নাম প্রেমের প্রচার এবং নামের চরম প্রাপ্য যেটি, সেটিকে প্রচার করার জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব—

"সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার। যুগধর্ম নামে প্রেম কৈল পরচার॥
সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ। অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥"

(এখানে লক্ষ্য করার মত, দেহ না থাকলেও ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ?)

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন চরিত্রের আস্বাদন প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে এসে পৌঁছেছে, তাতে বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর প্রভৃতি পূর্বাচার্য্যগণ বিস্মিত হ'য়েই সরে আসতে বাধ্য হবেন॥ কারণ শ্রীরাধা সর্বদা কৃষ্ণসুখে সুখভাবিতা, দেহ গৃহ পরিজন ব'লে কোন কিছুতেই মন নাই তাঁর, সেই রাধার ভাব নিয়ে রসময় মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্র কুমার যদি শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হন, তবে সেই চৈতন্যের উপর কোনও জ্ঞানী, কিংবা ভক্ত, কোনও পাপী, কোনো ঈশ্বর বিমুখ, কোনো সংসারী কি ভরসা ক'রতে পারেন ? বৃন্দাবন দাস, মুরারি, কর্ণপূর প্রভৃতি ব'লেছেন "জগতে ঈশ্বর বিমুখতার দুঃখ দেখেই কৃষ্ণের আবির্ভাব, তিনি বিষ্ণু তিনি নারায়ণ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণই কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথ দেখিয়েছেন "নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা।"

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন ও কাজটি কৃষ্ণের নয়, ওটি যুগধর্ম এসে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ও কাজ ক'রেছেন। (এই মতটি ষড়্ গোস্বামীরও নয়, এবং অন্যান্য জীবনীকারদেরও নয়।)

কিন্তু শ্রী কবিরাজ ব'লেছেন হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের মুখ্যতা ওই জন্যেই নয়—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার। আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই রসের সদন। অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব ধর্ম॥

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার রহস্যটিকে এমন ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন যে, স্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্তিত রহস্যবাদ যাঁরা জানেন না, তাঁরা গৌরাঙ্গের স্বরূপ রহস্য ও তাঁর কোন তত্ত্বই বুঝবেন না। অর্থাৎ বৃন্দাবন দাস, মুরারি, কর্ণপূর প্রভৃতির গ্রন্থে যদি এ রহস্য ব্যক্ত না হয়ে থাকে, তবে তাঁদেরও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু যাঁরা জ্ঞাত, সেইখানেই বুঝতে হবে এটি স্বরূপের জানান এবং এই তত্ত্ব থেকে রসিক ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব জানতে পারবেন, এ তত্ত্ব যাঁরা জানেন না তাঁরা অরসিক মূঢ়।

এ মূঢ়তা কবিরাজের ছিল না বলেই খুব নিগূঢ় ক'রে তিনি বলেছেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন করে তিনি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু রসিক ব্যক্তি ছাড়া অপর মূঢ়রা তা ধরতেই পারবেন না। তাই এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, কবিরাজ কি এসব কথা স্বেচ্ছায়, না অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায় 'মূঢ়' শব্দটি ব্যবহার ক'রেছেন? কারণ প্রতিস্থলেই যখন মহাকবি, ভক্ত, সাধক ও বেদব্যাসের নামা কোন ব্যক্তির রচিত শ্লোক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্বকে বিশ্লেষণ ক'রেছেন, যা পণ্ডিতদের কাছেও দুর্বোধ্য, সেখানে কেবল "বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়" একথা বলার সার্থকতা কোথায়?

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়। না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥"

কবিরাজ গোস্বামী এই গোপনীয় রহস্য বাদটি প্রকাশ করতে গিয়ে ভক্ত, অভক্ত, রসিক, অরসিক, পাষণ্ডীদের শ্রেণী ভাগ ক'রে ক'রে প্রত্যেকের জন্য এক একটি উপমা ব্যবহার ক'রেছেন।

শ্রীকবিরাজের এ সব উপমায় বৈষ্ণবতা কোথায়?

এই উপমাগুলি ব্যবহার করার জন্য তাঁর মানস সংস্কার কোথায় কোথায় আবদ্ধ ছিল, তা নিশ্চয় অনুধাবন করার কৌতুহল জাগবে। কারণ জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস এটি যাঁর সিদ্ধান্ত তিনি হিংস্র পশু পক্ষীর সঙ্গে মানব সাধারণকে কেন তুলনা ক'রেন?

১। ভক্তবৃন্দ কোকিল (আদি ৪র্থ ১৯)

২। অভক্ত উঁট (আদি ৪র্থ ১৯২)

৩। ভরত মুনিও কৃষ্ণের ব্রজরস জানেন না (ঐ ২১৪)

৪। অভক্তগণ প্যাঁচার মত (আদি ৩৬৯)

৫। শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে সম বিশ্বাসী না হ'লে, সে ব্যক্তিকে আধা কাটা মুরগীর দৃষ্টান্ত দেওয়া (আদি—৫।১৫৪)

৬। বৃন্দাবনের প্রতিমাগুলিকে যিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন না ভাবেন, তাঁকে নরকে যেতে হবে।

৭। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের মহিমা জীবকীট জানতে পারে না।

৮। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর এ কথা যে না মানে, তার পাপ হয়, সেই পাপে তার সর্বনাশ হয় আদি ৬।৭২।

৯। ভাবের বৈভব যারা জানে না তারা মূঢ়। আদি—৬৷৯০

১০। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র অত্যন্ত দুর্বোধ্য, তর্ক ক'রে তাঁকে বোঝা যায় না! কেউ যদি তর্ক করে, তবে তার কুম্ভীপাক নরকে গতি হবে, আদি—১৭৷২৯৮

১১। যে সব পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ তত্ত্ব মানেন না, তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের যে সব যুক্তি তর্ক, সেগুলি ব্যাঙের চীৎকার (আদি—৮।৫)

১২। ঐ তত্ত্বগুলি যাঁরা মানেন না অথচ কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করবেন, তাঁদের কোন গতি হবে না (আদি ৮।৬)

১৩। কৃষ্ণ না মানলে যেমন তাদিকে দৈত্য বলা হয়, তেমনি শ্রীচৈতন্যকে না মানলে তাকেও দৈত্য বলা হবে (আদি ৮।৭।৮)

১৪। কৃপাময় শ্রীচৈতন্যকে না ভ'জলে যতই উত্তম ব্যক্তি হোক, তাকে অসুর বলা হবে (ঐ—৮।১১)

ইত্যাদি বহুতর স্থলে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শাসন বাক্যগুলি এবং অবজ্ঞা মিশ্রিত উপমাগুলির সঙ্গে তাঁর চরিতামৃত গ্রন্থের স্থানে স্থানে আবার আশ্চর্য রকমের দৈন্যময়ী বাণীগুলিরও সন্নিবেশ থাকায়, তাঁর মানস সংস্কারের স্বাভাবিক ঝোঁক কোন দিকে, তা বিচার করতে গেলে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যে প্রস্তাব ক'রবেন, সে প্রস্তাবের প্রসঙ্গটি এখানে তুললে তা বিরক্তিকর হবেই।

শ্রীকবিরাজের আবিষ্কৃত পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণের ব্যাপারে যেমন পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বকেই প্রধান উপস্থাপ্য বিষয় বলে নির্বাচন ক'রেছেন, তেমনি ক'রেছেন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর সম্বন্ধেও, এঁদের কারোরই ব্যক্তি জীবনকে প্রাধান্য দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগুলিকে ক্রমিক পর্য্যায়ে এনে,বলরাম মহাবিষ্ণু বা শিব, নারদ এঁদেরশক্তির অবতার হয়ে এক এক পুরুষ এঁদের দেহে আবির্ভূত হয়েছেন।

এঁদের নিয়েই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। এঁরা একাধারে অভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব। এবং একাধারেই পঞ্চতত্ত্ব, আবার একাধারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশ।

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে প্রভুর বিবিধ বিভেদ ॥

এই তত্ত্বটি তাঁর নিজের নয়। এটিও স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে তিনি নিয়েছেন। (এই পঞ্চতত্ত্ব কি বস্তু তা কিন্তু বৌদ্ধরা ভাল জানেন)। আর এ তত্ত্বটি কবি কর্ণপুরের রচিত বলে সেই জাল গ্রন্থ গৌর গণোদ্দেশেও দেখা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে—

যাবৎ পুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।
যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্ গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ।

এই শ্লোকটির বক্তব্য "পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র যেমন পঞ্চতত্ত্ব রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে—ছিলেন. এবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও সেই রকম পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকটিত হ'য়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী এ শ্লোকটি কিন্তু চরিতামৃতে তোলেননি, শুধু ব'লেছেন স্বরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্ ॥

কবি কর্ণপুরের উক্তিই নয়, তবুও যদি ঐ গ্রন্থটির লেখক ব'লে অন্যায় ভাবে কেউ দাবী করে, তাতেও প্রশ্ন ওঠে, কবে পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচন্দ্র এক হ'য়ে পঞ্চরূপ ধারণ করে-ছিলেন? এ প্রসঙ্গ কোন পুরাণে আছে? আর সে উক্তি কে কে করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অব্যক্ত রস আস্বাদন ক'রতে রসিক শেখর কৃষ্ণ, দেহ বিলাসের জন্য ললনা পরিকর সহ অদ্বিতীয় নাগর হ'য়ে যেটা আস্বাদন ক'রলেন, সেইটাই কি আস্বাদন ক'রতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মূর্ত্তিতে পূর্ব পরিকরদের সঙ্গে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন?

"স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক শেখর ॥
রসাদি বিলাসী ব্রজললনা নাগর।
আর যত দেখ সব ত'ার পরিকর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকর গণ সঙ্গে সব ধন্য ॥"

আদি ৭।৫-৭

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী পরিষ্কার বলেছেন, হ্যাঁ, এই পাঁচজনই পৃথিবী জুড়ে পূর্ব্বের প্রেম ভাণ্ডারের আবরণ উন্মুক্ত ক'রে নিজেরাই আস্বাদন ক'রেছেন,—

'পাঁচে মিলে লুটে প্রেম করে আস্বাদন। যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহামত্ত। পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান ॥
উপজিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক সবারে ডুবায় ॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইলে জগতের জন ॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ব'ললেন জগতের কেউ বাকী থাকলো না। কিন্তু বাকী থাকলো—

মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষাণ্ডী সব পড়ুয়া অধম ॥

এরা সেই পঞ্চতত্ত্বের প্রেমদান গ্রহণ ক'রলো না, পলায়ন ক'রলো। মহাপ্রভু চিন্তিত হ'লেন, তাই তাদিকে ধরার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রলেন। সন্ন্যাসী মূর্ত্তিতে তাদিকে আকৃষ্ট ক'রে তাদের পলায়ন জন্য যে অপরাধ তা মার্জনা ক'রলেন এবং তাদিকে প্রেমের জলে সিঞ্চিত ক'রলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত এই জন্যই, অথচ পূর্ব্বে ব'লেন পঞ্চতত্ত্বময় কৃষ্ণই তিনি। এবং ভক্তমূর্ত্তি, ভক্তশক্তিমূর্ত্তি, ভক্তাবতার মূর্ত্তি, সবই তিনি। এমন পঞ্চতত্ত্ব কিন্তু মুরারি, কবি কর্ণপুর, অথবা বৃন্দাবনবাসী, বা অন্য কোনও পণ্ডিত, ভক্ত বা আর কোনও ব্যক্তি বা গৌরাঙ্গ স্রষ্টা কী স্বীকার ক'রেছেন?

কেউ করেন নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের কৃষ্ণ ও বলরামই চ'লেন গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এই মাত্র ব'লেছেন। বাকী সমস্ত পরিকরকে বৈষ্ণব, মহা বৈষ্ণব ব'লেছেন, আর মুরারিগুপ্ত ত'ার কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে ব'লেছেন "এই গ্রন্থটি দামোদর পণ্ডিতের ইচ্ছায় লিখলাম।" দামোদর পণ্ডিত পঞ্চতত্ত্ব কথাটি যদি জানতেন, তাহ'লে মুরারি গুপ্ত নিশ্চয় তেমন পঞ্চতত্ত্বের এতটুকুও ইঙ্গিত দিতেন। তিনিও কৃষ্ণ বলরামকেই পৌরাণিক রীতিতে

শ্রীগৌরাঙ্গকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে তত্ত্ব হিসাবে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের প্রসঙ্গই তোলেন নাই।

তারপর, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কবি কর্ণপুরের (যে গ্রন্থটিকে কবির নামে কোন জালিয়াত তৈরী করেছেন,) সেই গৌরগণোদ্দেশ ছাড়া পঞ্চতত্ত্ব নামে কোন তত্ত্বকে কেউ জানতেন না। গৌরগণোদ্দেশ একখানি জাল পুস্তক।

কবিরাজ কিন্তু নিজের কথা না ব'লে এটি স্বরূপ দামোদরের কথা, এমনি ভাবে সেই পঞ্চতত্ত্ববাদটি স্থাপিত ক'রেছেন। এই পঞ্চতত্ত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে যেমন উড়িষ্যায় উদ্ভূত কাহিনী, তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল বাসের সময়কার আচরণ যেমন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর প্রত্যক্ষীকৃত ও তত্ত্বগত অনুভূত, ঠিক তেমনই যেন শ্রীকবিরাজ গোস্বামীরও প্রত্যক্ষীকৃত ও তত্ত্বগত অনুভূত হয়েছিল এমনি ভাবেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন—

স্বরূপ গোস্বামীর মত রূপ রঘুনাথ জানে তত্ত্ব
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।

অথচ শ্রীরঘুনাথ দাস এমন পঞ্চতত্ত্বের কথা তাঁর কোনও গ্রন্থে কোনও কিছুই লেখেননি।

তারপর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার ৮ম পরিচ্ছেদে প্রখ্যাত রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের" রসতত্ত্ব মিলন প্রসঙ্গটিও অপর কোন জীবনীকারই কবিরাজের মত জানতেন না। একমাত্র স্বরূপ দামোদরই জানতেন। তিনি নাকি তাঁর কড়চায় এ' প্রসঙ্গটি লিখে রেখে ছিলেন। কিন্তু শ্রীকবিরাজ তা পেলেন কি ক'রে ?

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচার ॥

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর বহুপূর্ব্বেই তো মহাকবি কর্ণপুর ত'ার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যে যা যা লিখেছেন কবিরাজ গোস্বামীর লেখার মধ্যেও সে সবই পাচ্ছি, তিনি তাঁর পংক্তিগুলি অবিকল অনুবাদের রূপেই ফুটিয়ে তুলেছেন। একথা কে অস্বীকার ক'রবে ? কবিরাজ গোস্বামী তাই কি বলেছেন যে, যিনিই যে রহস্য কথা সম্বন্ধে লিখুন তিনি স্বরূপ দামোদরের কাছ থেকেই নিয়েছেন।

কিন্তু কর্ণপুর তাহলে ত'ার দুখানি প্রসিদ্ধ চরিত গ্রন্থে স্বরূপ দামোদরের তত্ত্ববাদটি নিশ্চয় গ্রহণ ক'রতেন, কারণ স্বরূপ দামোদর ছিলেন সবার মাননীয় কিন্তু কর্ণপুর ওটিকে নিশ্চয় অপবিত্র ও ভক্তি বিরোধী বলেই মনে ক'রতেন ?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক রহস্য বাদটিকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটি কিন্তু একমাত্র স্বরূপ দামোদরের কড়চায় ? তিনি ব'লেছেন, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিকারের আনন্দ হিল্লোলময় কৃষ্ণ তত্ত্বটি গভীর ভাবে আস্বাদন ক'রতে এবং জগতের আপামর জনসাধারণকে আস্বাদন ক'রাতেই "পঞ্চতত্ত্বাত্মক" শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

স্বরূপ দামোদরের অনুভূত এই তত্ত্ববাদ রহস্যবাদটিকে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের আদিকালে আবৃত থাকলেও মধ্য ও অন্ত্যলীলায় তা পরিস্ফুট হ'য়েছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের সর্ব্বত্র তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পরিবারবর্গের মধ্যে এই উপাসনা ঘটেছিল কিনা তা কিন্তু জানা যায় না, আর সেটি যে শ্রীগৌরাঙ্গের হার্দ্দি অথবা

গৌরাঙ্গ তত্ত্ব জানার পূর্ণতা আনে এমন কারোর কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাই, কারণ তাতে শ্রীগৌরাঙ্গ হন উপায় এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রণয় রহস্য হয় অনুভব গম্য উপেয়।

এই রীতিটি ষড গোস্বামীদের কেউ জানতেন না, এটি যদি স্বরূপের মত হয়—তবে তাঁকে অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব হোতো না, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে অদ্যাবধি অবিচ্ছিন্ন ভাবে চ'লে আসছে এবং ঐ মতবাদ আশ্রয় কারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে' অথচ কত প্রাচীন তা কেউ জানেন না, এর আকর কোথায় তাও কেউ জানেন না।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, শ্রীস্বরূপ দামোদরের ঐরূপ অনুভূতি বেদ্য যা সেটি কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারাই কি আরও প্রসারিত? এমন তত্ত্ববাদের মৌলিকতা কোথায়? বেদে পুরাণে অথবা ভাগবতে? কিন্তু যাঁরাই এই তিন স্থলে প্রচুর অনুসন্ধান ক'রেছেন তাঁরা অবশ্যই বলেন, না তা পাওয়া যায় না। এই পঞ্চতত্ত্ব ভক্তিবাদের বিরোধী

যা পাওয়া যায় তার সূত্র সৌত্রান্তিক; যোগাচারী ও হঠযোগী, এবং বজ্রযানী, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, নাথ সম্প্রদায় আর ঔষড়সম্প্রদায়, কুরুকুল্লা সম্প্রদায় এবং সহজযান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সূত্রগুলির উদ্দীপনা সহজেই আসে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২০ পরিচ্ছেদের একটি দৃষ্টান্ত থেকে এটা খুব স্পষ্ট হয়—

প্রসঙ্গটি সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের সাধন তত্ত্বের উপদেশ—

শ্রীসনাতন বল্লে'ন—

কে আমি আমায় কেনে জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়!

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রেছেন, তার মধ্যে দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্যণীয়—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

জীব সে তত্ত্ব ভুলে গিয়েছে অনাদিকাল থেকে, সে ভোলার জন্য কে দায়ী, তার কথা শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন নাই। তবে ভুলেছে এবং ভুলেছে ব'লেই মায়া তাকে সংসার দুঃখ দেয়। এখানে বলেন নাই মায়া বস্তুময়ী অথবা অবস্তুকা।

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।

সে দুঃখের উপমাটি রাজার দণ্ডদানের মত। যেমন অপরাধীকে রাজা শাস্তি দেন জলে চুবিয়ে নাকানি চোবানি খাইয়ে, অর্থাৎ একবার জলে ডুবিয়ে আবার তুলে। রাজার শাস্তি দেওয়ার এই উপমাটি কবিরাজ গোস্বামীর আমলে খুব প্রচলিত ছিল। তুরকী সেনা, পাঠানী সেনারা রাজদণ্ডের এই পথ গ্রহণ ক'রতো খৃষ্টীয় ১৪।১৫ শতাব্দী পর্যন্ত। এই ভাবে শাস্তি দেওয়ার প্রথা ভারতের বহুপ্রদেশে ও বাংলায় চালু হ'য়েছিল। আরও একটি প্রথা ছিল "তুড়ুং ঠোকা"।

অনাদি কালের কৃষ্ণভোলা সেই জীবের নিস্তারের উপায় হোলো, সাধু ও শাস্ত্রের করুণা লাভ যদি কারও ভাগ্যে ঘটে তবে।

শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা ক'রে শাস্ত্ররূপে উপদেশ দেন। আর সাধু গুরুরূপে দেখা দিয়েও উপদেশ দেন।

তিনিই এতে জীবের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন তত্ত্বটি জানিয়ে পুরুষার্থ "শিরোমণি প্রেম মহাধন" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি তখন বলেন—

কৃষ্ণ মাধুর্য্য প্রাপ্তির সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করে আর কৃষ্ণ রস আস্বাদন।

এর জন্য কবিরাজ গোস্বামী একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দুঃখী দরিদ্রের বাড়ীতে সর্বজ্ঞের উপস্থিতি ও তাঁর উপদেশ—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন।
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়।
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুড়িবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পড়িবে।
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাথে না পড়য়।
উত্তরে খুড়িলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সভারে।
পূর্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাথেতে।

কবিরাজ গোস্বামীর এই উপমা ও সিদ্ধান্তটি সন্ধ্যাভাষার যুগের এবং সহজযানী, অনঙ্গ বজ্রযানী, কালচক্রযানী, নাথ সম্প্রদায়ী, মহাযানী ও অন্যান্য বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণও নানা ভাবে গ্রহণ ক'রেছেন, এমন কি পঞ্চবুদ্ধ, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ মানুষবুদ্ধ ও উৎকল দেশের পঞ্চসখা উপাসকরাও গ্রহণ ক'রেছেন।

এই সম্প্রদায়গুলির প্রধান বক্তব্য হোলো, জীবের বাসনারাশিকে চেপে রাখলে চলবে না, তারা অবসর পেলেই মাথা তুলবে। অতএব সহজ পথে তাদিকে চ'লতে দিতে হবে। তখন শীঘ্রই চিত্তের সংক্ষোভ দূর হবে। এই হোলো সহজ সাধনা।

এই সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্যে "অনঙ্গ বজ্রসাধকদের" অভিমত একটু পৃথক, তাঁরা বলেন, বাসনাগুলিকে ভাবনার দ্বারা পঞ্চ বুদ্ধের সাধনায় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বভাব প্রবৃত্তিটাকে বিপরীত পথে আনতে হবে। তারা ভোগ করুক কিন্তু পঞ্চবুদ্ধের সাধনার রীতিতে পরিবর্তিত হয়ে করুক। সেই সাধনা'র রীতি পাঁচ প্রকার—

বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। (প্রত্যেকটির বিস্তৃত তথ্য জানতে হ'লে "সাধনমালা", যোগাচার, ভূমিসার, প্রবন্ধ চিন্তামণি", অমরোঘশাসনম্ উড্ডীয়নতন্ত্র এই গ্রন্থগুলি দেখা উচিত।)

পঞ্চতত্ত্বাত্মক বুদ্ধ উপাসনার প্রধান গ্রন্থ "সাধনমালা"। গ্রন্থটি বহুদিন হোলো বরদায় ছাপা হ'য়েছে, তাতে প্রসঙ্গ ক্রমে আত্মতত্ত্বের উপদেশ এই ভাবে লেখা হয়েছে—

"প্রণিপত্য সর্ববুদ্ধান্"। ওঁ নমঃ পঞ্চবুদ্ধ বোধিসত্ত্বেভ্যঃ।
নমঃ প্রতিবুদ্ধ আর্য্যশ্রাবকাণাম্ বোধিসত্ত্বানাম্।
নমো ভাগবত্যৈ আর্য্য প্রজ্ঞাপারিমিতায়ৈ—
নাথতত্ত্বং ত্রিভি র্মার্গৈঃ অলভ্যং সহজং ঋতে।
ন গুরু নৈ'ব শক্তিশ্চ নিধি প্রাপ্তৌ পরাত্মদৃক।
ভ্রান্ত্যা চেৎথনতে মূঢ়ঃ দক্ষিণে কীট দংশনম্॥
পিতৃযানং চোত্তরে চ, যক্ষরক্ষঃ পিশাচকাঃ॥
পশ্চিমে কাল কূটানাং আগারম্ ভীম ভৈরবম্।
পূর্বে রম্যনিধি স্তত্র নিত্য জ্যোতির্বিরাজতে।
সিদ্ধিঃ করতলে লভ্যঃ বজ্রসত্ত্ব সুধাম দৃক্।
সহসা মন আলোক্য, সহজং বিন্দতে সুখম্।"

ওই দৃষ্টান্তের দ্বারা বজ্রযানীদের বক্তব্য যে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যে কোন একটির দ্বারা মনকে চালিয়ে আত্মতত্ত্ব লাভ ক'রতে হবে, তারই মধ্যে এটি একটি দিক্ নির্ণয়।

তা ছাড়া ওঁরা আরও বলেন, মন বুদ্ধি ও অহংকারের মধ্যে কোনও একটিকে শক্তি-শালী ক'রলেও, সেই আত্মানন্দ তত্ত্বের কেউ সন্ধান পাবে না ; এক্ষেত্রে একমাত্র পথ হোলো সহজ সাধনা। সকলের উত্তরে থাকে মন, সে কেবল যক্ষ রক্ষ পিশাচের মতই গ্রাস করে, বস্তুলাভ ক'রতে দেয় না, দক্ষিণে থাকে বিচার বুদ্ধি, কেবল সে বিচার করে তাতে কীটের দংশন জ্বালাই বাড়ায়। আর পশ্চিমে থাকে অহংকার, সে তো কাল-সাপ, সেই অহংকারে গ্রস্ত হ'লেই সব শেষ। অতএব সহজ সাধনাই শ্রেষ্ঠ পথ। সে পথ পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের মত, তাই পূর্বদিকটাই অল্প আয়াসের স্থান। সহজেই সিদ্ধিলাভ। স্বল্প সাধনায় বজ্রসত্ত্বের সুধাম জ্যোতি অল্পতেই প্রতিবিম্বিত হবে।

এই সিদ্ধান্তটি যেমন সাধন মালায়, তেমনি 'বজসত্ত্ব বন্ধন" ও কুরুকুল্যা সাধন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তটির দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর দেওয়া উপমা সমা-হারের আশ্চর্য্য মিল কেন? তবে কি সহজিয়া ভাবধারারই অস্তিত্ব?

ঐতিহাসিক সুধীবৃন্দ জানেন, পঞ্চবুদ্ধের উপাসনাময় ভক্তি সাধনার রীতিটি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আবির্ভাবের বহু আগেই উড়িষ্যায় জ্ঞানীভক্ত সাধকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচ-লিত ছিল ; এবং এখনও উৎকলের ব্রাহ্মণ সন্তানদের মধ্যে সেই জ্ঞানীভক্ত সাধকদের ভক্তি ভাবনার রীতিটিরই প্রাধান্য দেন তাঁরা। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে তাঁরা তেমন আকৃষ্ট হন নাই। এমন কি আজও বৈষ্ণবদের সংকীর্তনসাধক মৃদঙ্গবাদ্যটির স্পর্শ ক'রতেও চান না তাঁরা, ওটিকে অপবিত্র মনে করেন।

তাঁদের মধ্যে বুদ্ধরূপী আত্মতাত্ত্বিক ভক্তিভাব এবং বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন তন্ত্রবাদ এই দুটির প্রতিষ্ঠা দেন সর্বাগ্রে। যে সময়ে শ্রীস্বরূপ দামোদর নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর হ'য়ে অবস্থান করেন, সে সময়ে বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ এবং পঞ্চতত্ত্বাত্মক পঞ্চ-বুদ্ধের এক তত্ত্বময় উপাসনার প্রচার খুব বেশী ছিল।

পঞ্চবুদ্ধের উপাসনায় রসতন্ত্রের রহস্যবাদটির অপর নাম হঠযোগ। আত্মরতির সাধন-

বাদ যাঁরা ক'রতেন, তাঁদের মধ্যে পঞ্চসখার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা ক'রতে চান, তাঁরা শ্রীজগন্নাথ দাসের "দারুব্রহ্ম" অচ্যুতের শূন্য সংহিতা, জগন্নাথ দাসের "রাস ক্রীড়া" বলরাম দাসের "বটপ্রকাশ", "বিরাট গীতা" যশোবন্তের "শিব স্বরোদয়" ও দিবাকর দাসের "জগন্নাথ চরিতামৃত" গ্রন্থাবলী পড়ুন।

এ'রা সকলেই শ্রীভাগবত গ্রন্থকে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রতেন এবং শ্রীভাগবতের অনুবাদও উৎকল ভাষায় ক'রেছেন। এমন কি এ কথাও তাঁরা ব'লেছেন যে, আমাদের পঞ্চ-তত্ত্ব পঞ্চআত্মার উপাসক যে পঞ্চসখা, তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম—

শ্রীচৈতন্য বোলন্তি বচন মন দেহ শুন রাজন।
পঞ্চ আত্মক নাম শুন এক জগন্নাথ দাসেন।
দ্বিতীয়ে বলরাম কহি।
তৃতীয়ে অনন্ত যে হই।
চতুর্থে যশোবন্ত কহি
পঞ্চমে অচ্যুত বোলাই

(চৌরাশী আজ্ঞা ৪২ অধ্যায়)

তা ছাড়া শূন্যসংহিতার ১ম অধ্যায়টি পাঠ ক'রলেও জানা যায় যে, অচ্যুতানন্দ ব'লেছেন, পঞ্চসখার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল—

অনন্ত, অচ্যুত, ঘেনি যশোবন্ত, বলরাম, জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহি নৃত্য করি
গলে গৌরাঙ্গ চন্দ্র সঙ্গত।

ঐ অচ্যুতানন্দই আবার ঐ শূন্য সংহিতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব'লেছেন—

বেলান্তি প্রভু ভগবান বুদ্ধরূপমো শ্রীচৈতন্য।
তাঙ্ক সেবা কর পঞ্চতত্ত্ব পথক আবোর।"

শ্রীস্বরূপ দামোদরের মনে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণের ব্যাপারে উড়িষ্যায় তৎকালীন পঞ্চতত্ত্বাত্মিক ভক্তি সাধনার প্রভাব কতখানি পড়েছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীস্বরূপ দামোদরের রচিত ব'লে চলতি ধারণার কড়চাখানি যদি এতটুকুও দেখতে পাওয়া যেতো, তবে তার সঙ্গে পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণতত্ত্বটির আশ্চর্য্য রকমের মিল দেখা যেতো, এবং সমগ্র ভারতে এবং বাংলায় এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সঙ্গে, ভক্তিবাদ বহির্ভূত এই তত্ত্বটি চিরদিন রহস্যগুহায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকতো না।

জ্ঞানীদের পঞ্চতাত্ত্বিক বোধিসত্ত্ব, বা অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ও বুদ্ধ সামন্ত ভদ্র। এ'দের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর হোলেন করুণাময় করুণার্ণব ও প্রেমিক। এ'রা সকলেই প্রেমিক। এ'র প্রধান শক্তি মঞ্জুশ্রী, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, ও সম্বিত গুণময়ী। আর অবলোকিতেশ্বর হ'লেন স্বয়ং সৎ চিৎ ও আনন্দময়, উভয়েই সর্বদা অভিন্ন এবং স্বেচ্ছায় ভিন্ন হ'য়ে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেন এবং স্বেচ্ছায় উভয়রতিনিষ্ঠ হ'য়ে প্রেমভোগ করেন।

এ'দের স্বরূপ ও তত্ত্বকে ভাবনা ক'রলে সমস্ত কামনা বাসনা হৃদয় থেকে দূরীভূত হয়। এ'দের সেবা সুখময় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়, এ'রা আত্ম তত্ত্বের প্রভাবে প্রত্যেকের

হৃদয়ে অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করেন এবং পঞ্চতত্ত্বাত্মক বোধিসত্ত্বে মনকে আবিষ্ট করান, হ্লাদিনীর আনুগত্যময় ভাবনায় দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বতা বোধ করিয়ে দেন।

বৌদ্ধরত্নাগারিক গ্রন্থ ছাড়া, অন্যান্য সমস্ত তন্ত্রগুলিতে এ সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি। এঁদের আরও সিদ্ধান্ত যে, বোধিসত্ত্ব ও মঞ্জুশ্রী স্বকীয় তত্ত্বে নিবদ্ধ থেকেও পরকীয় তত্ত্বে সর্বদাই উল্লসিত।

সমগ্র ভারত ব্যাপী এই তত্ত্ববাদের প্রচার থাকলেও, তৎকালে একমাত্র উড়িষ্যাতেই এই তত্ত্ববোধের সাধকদের রচিত দেশীয় ভাষার গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া বোধিসত্ত্ব বা নিরঞ্জন সাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক বৈষ্ণবাচার আজও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে।

বাংলায় উদ্ভূত শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারার সঙ্গে, উড়িষ্যার তত্ত্ববোধক উপাসনার কোন মিল বা এতটুকু সম্বন্ধ কেউ রাখেন নি। বৈষ্ণবীয় চরিত্র বা ব্যক্তি জীবনের চরিত্র মাধুর্য্যকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন, তবে পৌরাণিক রীতি অবলম্বন ক'রে, যদিও তাতে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি প্রাধান্য প্রকটিত হয় নাই, তবুও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের তাত্ত্বিক দিকটির প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনকে গৌণ ক'রেছেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার ক্ষেত্রে তত্ত্বময় শ্রীগৌরাঙ্গকে উপায় মাত্র রূপেই অঙ্কিত ক'রেছেন, সে আলেখ্যটি যে ভাবে উদ্ভাসিত হয়, সেটির মৌল পটভূমিকায় প্রতিবেশী উড়িষ্যার সহজিয়া বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্তবাদকেই স্মরণ করায়।

*(১) রাধা ও কৃষ্ণের দেহগত ভেদ এবং অভেদ এই বিবর্তন মূলক চিত্রটির সঙ্গে ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ ও পঞ্চতত্ত্বময় বুদ্ধ উপাসনার খুব মিল।

*(২) নিজেকে একটি সখী মনে করে ভাবনার রীতিটি পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডের ৮৩ অধ্যায়ে আছে। পরকীয় রস বোধটি এবং কৃষ্ণ রাধার উপাসনাটি ঐ অধ্যায়ে। এ সব পুরাণ আনুমানিক ৯ম থেকে ১০ম শতাব্দীর আগে নয়। পুরাণগুলির আভ্যন্তরিক ঘটনা ও ভাষার ছাপগুলিই তা প্রমাণ করে।

শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেব

শুধু বাংলারই নয়, অখণ্ড ভারতেরও ভাব এবং ভাষার সাহিত্য মন্দিরের যাঁরা পরম পূজনীয় মহাকবি, কবি, রসিক, আলংকারিক, দার্শনিক ব'লে আখ্যাত হ'য়ে আসছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিক, রসিক ও মহাকবি রূপে পূজিত হ'য়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়।

এঁর আবির্ভাব আনুমানিক ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জন্মভূমি বিংশ শতাব্দীতে আখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার 'ঝামটপুর' গ্রাম। তাঁর জীবনকালের মধ্যবর্তি সময়ের কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন; ওই ভূমিটি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণ চিহ্নে চিহ্নিত হ'য়ে আরও মহিমময় হ'য়ে ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছে। ওইখানেই তাঁর প্রিয় পার্ষদবৃন্দের ভক্তি সাধনার আবাসস্থলী।

পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" রচনা করেন।

ওইখানেই তিনি তাঁর অন্তর-রস-আরাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জীবন মহাকাব্যটি বাংলা ভাষায় রচনা করেন। অন্য ভাষায় বলা যায়, সেটি সংকলন করেন। সংকলন করেন ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে।

তিনি এই অমূল্য মহাকাব্যটির রচনার উপাদান প্রাপ্তির জন্য স্বীকৃতি জানিয়ে ব'লেছেন, আমার পূর্ববর্তীকালে রচিত যে সব গ্রন্থের যে যে স্থান থেকে সাহায্য নিয়েছি—

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে 'মুরারি গুপ্ত' করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষ লীলা 'স্বরূপ দামোদর'।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥ চৈঃ।চঃ।১।১৩।১৪-১৬

আরও লিখেছেন—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্র গণ।
বিস্তারি বর্নিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত অবশেষ কিছু করিব চর্বণ॥ চৈঃ।চঃ।১।১৩।৪৪

এখানে কবিরাজ গোস্বামী আর একটু পরিষ্কার করে লেখেনি বা সে পয়ার গুলি পাওয়া যায় না, যে গুলিতে শ্রীবৃন্দাবন দাস যা বলেন নাই, সেগুলি সংগ্রহ ক'রতে কোন্ কোন্ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন?

যদি বলা যায়, বৈষ্ণবের মুখে প্রভুর যেসব লীলা কথা শুনেছেন তাই সংগ্রহ ক'রেছেন, তা হলে সে সব সংগ্রহের কথা তিনি না ব'ললেও, আমরা ধ'রে নিয়েছি যে, তিনি জন প্রমুখাৎ শ্রুত ঘটনাগুলিই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন।

কবিরাজ গোস্বামী আরও বলেছেন—

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল॥ চৈঃ।চঃ।৩।২০।৬৪
চৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা॥
—চৈঃ।চঃ।৩।২০।৭৯-৮০

আরও ব'লেছেন—

শ্রীচৈতন্যলীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেট। চৈঃ।চঃ।২।২।৭৩

শ্রীকবিরাজ আরও ব'লেছেন—

স্বরূপ গোঁসাই আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেই কালে এই দুই রহে প্রভুর স্থানে।
আর সব কড়চা কর্তা রহে দূর দেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥ চৈঃ চঃ ৩।১৪।৬-৯

এখানে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল, কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্ববর্তী আরও যে একজন জীবনী কার ছিলেন, যাঁর নাম মহাকবি কর্ণপুর, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর কোন অংশের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন নাই। যাঁর বিখ্যাত দুখানি গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" এবং "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য"।

তবে এক্ষেত্রে তাঁর নাম এবং তাঁর গ্রন্থের অংশের স্বীকৃতি না জানালেও অন্যত্র তা জ্ঞাপন ক'রেছেন। হয়তো বা পরবর্তী সময়ে সেই স্বীকৃতি জ্ঞাপনের অংশটুকুই হারিয়ে গিয়েছে, নইলে কবিরাজ গোস্বামী যে অংশটির অবিকল অনুবাদ ক'রেছেন, সেই অংশের জন্য নিশ্চয় স্বীকৃতি জানাতেন।

একটা নমুনা দিই—

মহাকবি কর্ণপুর তাঁর অমর কাব্য "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের" যেখানে লিখেছেন—

ততোঽদ্বৈত প্রীত্যা প্রণত হরিদাসস্য চ মুদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয় বশঃ।
শচীদেব্যা তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজনৈঃ
সমং তৈর্ভুঞ্জানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্॥
চৈঃ চঃ মহাকাব্য ১১।৭৪

কবিরাজ গোস্বামী সেখানে লিখেছেন—

এইমত অদ্বৈত গৃহে ভক্তগণ মেলে।
বঞ্চিল কতেক দিন নানা কুতূহলে॥ চৈঃ চঃ ২।৩।২০

এক্ষেত্রে কিন্তু শ্রীমুরারি ও শ্রীবৃন্দাবন দাসের কোন উক্তি নেই।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মহাকবি কর্ণপুরের গ্রন্থাবলী ভাল ক'রেই অধ্যয়ন করেছিলেন, কারণ তিনি তো নিজেই বলেছেন—

"চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥ চৈঃ চঃ ১।১০।৩০

গোস্বামীজী মহাকবি, তিনি গৌরকথা এত বেশী জানতেন, যা অপরে জানতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের সঙ্গে কর্ণপুরের শৈশবে প্রথম মিলনের কথাও জানতেন, তা-ছাড়া, তাঁর জন্মের পূর্ব্ব প্রসঙ্গও জানতেন। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৩।১৬।৬২-৬৭ পরিচ্ছেদে বিশদ বর্ণনাও ক'রেছেন।

তারপর কর্ণপুরের নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন, আমার এই গ্রন্থের এই এই জায়গা কর্ণপুরের কাছ থেকে নেওয়া—

"শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥ চৈঃ ২।১৯।১০৯

আবার ২।২৪।২১৯ পয়ারে—

নিজ গ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥

তাহ'লে স্পষ্টই পাওয়া যায় কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীরূপ সনাতনের মিলন প্রসঙ্গটি কর্ণপূর যে ভাবে লিখেছেন, সেটির মৌলভিত্তি স্বরূপদামোদর নামে আরোপিত অদৃষ্ট গোচর কোনও কড়চা ভিত্তিক নয়। আর শ্রুতিআরোপিত মাত্র সেই কড়চাটিতে শ্রীচৈতন্যস্তবটিও পান নাই। কারণ ওই স্তবটি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেই আছে, অন্য কোথাও নাই।

এমনি দৃষ্টান্ত সংকেতের কয়েকটি নমুনা দিই।

১। সার্ব্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর যেটি বিচার প্রসঙ্গ, সেটি তো শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকেই আছে, শ্রীমুরারির কড়চাতেও নেই। নাটক—৬।৬৭

এটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এখান থেকে না পেলে অবিকল অনুবাদ দিলেন কি করে? চৈতন্য চরিতামৃত—২।৬।১৩৩ পয়ারের পর থেকে বাকী সব।

২। স্বরূপ দামোদরের শ্রীচৈতন্য স্তব, এটি আছে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ৮।১৪ আর শ্রীকবিরাজের চরিতামৃতের ২।১০।১১৬ পর তা অবিকল অনুবাদিত হ'য়েই পয়ারে আছে।

৩। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ৮।২৭, ২৮।৩৪ অংশে যেভাবে প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের মিলনটির বর্ণনা দেওয়া আছে, অবিকল সেই ভাবেই শ্রীকবিরাজ তাঁর চৈঃ চঃ ২।১১।৬৮, ৩৭ পয়ারে অনুবাদ করেছেন।

৪। কর্ণপুরের নাটকে শ্রীশিবানন্দ মিলনটি যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকবিরাজ তেমনি ভাবেই পয়ার লিখেছেন—চৈঃ চঃ গ্রন্থের ২।৯।১৩৬ এর পর।

৫। কর্ণপুর শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীরূপের মিলন বর্ণনা ক'রেছেন নাটকের ৯।৪২, ৯।৪৩ এবং ৯।৪৮এ।

আর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ প্রসঙ্গটি অবিকল অনুবাদের আকারে প্রকাশ করেছেন ২।১৯।১০৯ এর পর।

৬। শ্রীরূপ সনাতনের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা প্রকাশের চমৎকার সংবাদ দিয়েছেন

কর্ণপুর তাঁর নাটকের ৯।৪৫, ৪৬, ৪৮ এ।

আর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে সেইটিকেই পয়ারে করেছেন ২।২৪।২৬৯ এর পর।

৭। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ১০।৩-৪-এ যে অংশটি শ্রীরঘুনাথ দাসের মহিমা বর্ণনা সেইটিই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৩।৬।২৫৯ এর পর।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

এইত প্রস্তাবে শ্রীকবি কর্ণপুর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর ॥
শিবানন্দ যৈছে সেই পুত্রেরে কহিল।
কর্ণপুর সেইমত শ্লোকেতে বর্ণিল ॥

অতএব খুব সহজেই বলা যায়, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যে স্বরূপ দামোদরের কড়চাটিকে ভিত্তি ক'রেই শ্রীগৌরসুন্দরের শেষ লীলা বর্ণনা করেছেন এটা ঠিক নয়, অথবা কোন কারণে চরিতামৃতের সূচীপত্রের ওই অংশে কর্ণপূরের নামোল্লেখের পয়ারগুলি হারিয়ে গিয়েছে, কিংবা কোন উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য একজন "মাননীয়ের" অর্থাৎ স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থ ছিল, বলে তা বসিয়ে দিয়েছে কেউ।

সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির এমন একটি ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত ক'রতে চান, যেটিতে শ্রীগৌর-সুন্দরের মহত্ব অপেক্ষা রামানন্দের মহত্ব, এবং অজ্ঞাতসারে কাল-অনৌচিত্য-দোষ ঘ'টলেও যা সহজিয়া রসসাধকরা সহজেই মেনে নেবেন।

কথাটা এই যে, স্বরূপ দামোদর যেন রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌর সুন্দরের রসবাদ ও তত্ত্ববাদের সিদ্ধান্তগুলির সার নিষ্কর্ষ ক'রেই—"শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ" এই শ্লোকটি লিখেছেন, আর পূজনীয় কবিরাজ গোস্বামীও সেই শ্লোকের অনুবাদ ক'রেছেন—

"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥"

তাতে ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিরোধ ঘটলেও ঘটুক আর সহজিয়া মতের প্রতিচ্ছবি প'ড়লেও পড়ুক, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ছায়া প'ড়লেও, ওটি কবিরাজের সিদ্ধান্ত নয়, ওটি স্বরূপ দামোদরের সিদ্ধান্ত, তাতে কবিরাজ গোস্বামীর কি দোষ? এইটি বোঝাতে চাইছেন সেই সহজবাদী।

(এর বিশ্লেষণ এই শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" ও নিত্যানন্দ গ্রন্থের প্রথম দিকে লিখেছি)

গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বজন মান্য স্বরূপ দামোদর যদি অমন উৎকট সিদ্ধান্ত-পূর্ণ কড়চা লিখেছিলেন, তাহলে কোনও আচার্য্য তা গ্রহণ করেন নি কেন? এ প্রশ্নতো স্বাভাবিক উঠবেই?

আরও প্রশ্ন, সেই স্বরূপ দামোদরের কড়চাটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কার কাছে পেয়েছিলেন, তা পরিষ্কার করে বলেন নি! তা হলে সে সংবাদও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কোন পয়ারে নিশ্চয় উল্লেখ ক'রতেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এঁরা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ জীবনী লেখক, প্রত্যেকেই শ্রীগৌরসুন্দরের জীবনে যে সব ঐতিহাসিক ও মূল্যবান ঘটনা তা সবই লিখেছেন।

খুব আশ্চর্য্যের কথা, কবিরাজ বর্ণিত "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" গ্রন্থটিতে কি লেখা ছিল কেউ জানতে পারলে না, শুধু পারলেন শ্রীকবিরাজ ? যা ভক্তি শাস্ত্রবিরোধী গৌরাঙ্গ তত্ত্ব, আর দাক্ষিণাত্যের রামানন্দ রায় আনীত এবং তাঁরই দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত গৌরাঙ্গদেবের অনুভূত ব'লে প্রচার ঐ ধরণের রাগমার্গের প্রসঙ্গ ?

এই প্রশ্নকে সম্মুখে রেখে উত্তর প্রসঙ্গ লেখার আগে ঐতিহাসিক তারিখ নিরীক্ষার একটি সূচী রাখাই যুক্তি বোধ্য—

১। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

২। গৃহীর আশ্রমে তাঁর অবস্থান ২৩ বৎসর, ১১ মাস ৬ দিন।

৩। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ।

৪। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে পুরী থেকে প্রথম বের হন দাক্ষিণাত্যের পথে ভ্রমণের জন্য।

৫। পুরীতে ফিরে এলেন ১৫১১ খৃষ্টাব্দের বর্ষার শেষে এবং ফেরার পথেই গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার।

এইটুকু মাত্র প্রকাশ করেছেন মহাকবি কর্ণপুর।

কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর অভিমত, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রথম পর্য্যায়েই রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামী বলেন নাই যে, কার উক্তিতে আস্থা স্থাপন করে তিনি ঐ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অর্থাৎ এক বৎসর ভ্রমণ শেষ ক'রে শ্রীগৌর যখন পুরীতে ফিরেছেন, সেটা স্নান যাত্রার কিছু পূর্ব্বে, এই রামানন্দ মিলন এটি মহাকাব্যের ১৩।৫০ শ্লোকে বর্ণনা ক'রেছেন।

সেটি ১৪৩৩শ শকাব্দা বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দ। তারপর ১৪৩৪ শকাব্দে বা ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার স্নানযাত্রার পর থেকে শ্রীজগন্নাথ যখন গূঢ়ভাবে অবস্থান ক'রছিলেন, তখন শ্রীগৌর সুন্দর তাঁর দর্শন না পেয়ে, তিনি আবার গোদাবরী তীরে যান এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে দ্বিতীয় বার মিলিত হন।

এ কথা মহাকবি কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যের ১৩।৫৭ শ্লোকে বর্ণনা ক'রেছেন। "বভুব দুঃখী কৃত বাষ্প মোক্ষঃ" ওইখানেই তিনি চার মাস কাটান—

তেনৈব সার্দ্ধং প্রিয়ভাষণেন
নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ ॥

মহাকাব্য—১৩।৬০

গৌরাঙ্গ সুন্দর ফিরে আবার এলেন রায় রামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে, তখন হেমন্ত কাল—

হেমন্ত কালেঽথ তথৈব তেন
সমং সমস্তাৎ করুণাং বিতন্বন্ ॥
সমাযযৌ ক্ষেত্রবরং বরীয়ান্
জানাতু ক স্তৎ-চরিতং বিচিত্রম্ ॥

মহাকাব্য ১৩।৬১

শ্রীগৌর সুন্দর যে দ্বিতীয়বার গোদাবরী তীরে গিয়েছিলেন রায়ের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ক'রতে, একথা কবিরাজ গোস্বামী লেখেন নাই।

অথচ একথা তো ঠিক যে, তখনও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মোটেই দেখা হয়নি। শ্রীগৌর সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার পর, অনেক পরে নবদ্বীপ থেকে এলেন স্বরূপ দামোদর।

এমনি দৃঢ় ভিত্তিক সিদ্ধান্তের জোরে নিশ্চয় ক'রে বলা যায় "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" নামক অদৃষ্ট গোচর সেই গ্রন্থটিতে শ্রীগৌরের সঙ্গে রামানন্দের মিলন, এ-প্রসঙ্গটি লিপিবদ্ধ ক'রতে গেলে কবিরাজ গোস্বামীকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ অবশ্যই দিতে হবে এবং সে গ্রন্থের নামও উল্লেখ ক'রতে হবে, কিন্তু তা তিনি করেন নাই।

৬। তারপর ১৫১২ খৃষ্টাব্দেই গৌড় দেশে সংবাদ ছড়িয়ে প'ড়লো গৌর সুন্দর পুরীতে ফিরে এসেছেন, এবং সে সংবাদ জেনে প্রথমে এলেন শ্রীশিবানন্দ সেন ও তাঁর অনুগামি ভক্তবৃন্দ।

তারপর 'বহুতীর্থ-ভ্রমণকারী সুমহান্ পুণ্যপয়োনিধি 'গোবিন্দ', যিনি গৌর-সুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রতে এলেন। একথা মহাকাব্যের ১৩-১৩০—১৩২ শ্লোকে।

এই গোবিন্দ কায়স্থ কুল জাত। ইনি শ্রীঈশ্বর পুরীর শিষ্য। তাঁর লোকান্তরের সময় গোবিন্দ গুরুদেবের আদেশ পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে শ্রীগৌর রাজী হন নাই; কিন্তু সার্ব্বভৌমের পরামর্শে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে স্বীকার করে নেন। অ-রাজী হওয়ার কারণ, গোবিন্দ ছিলেন তাঁর গুরুদেবের ভৃত্য"। সেন শিবানন্দ এবং গোবিন্দের আসার পর এলেন পুরুষোত্তম আচার্য্য, যাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় "স্বরূপ দামোদর"।

এটি বর্ণনা করেছেন কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যের ১৩।১৩৭—১৪৪ শ্লোকে।

অতএব খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ১৪৩৩ বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন হয় এবং ১৫১২ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি কোনও এক সময় স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ।

৭। তারপর ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ এলেন গৌড়ের রামকেলিতে। ওইখানেই শ্রীরূপ সনাতনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

এ সংবাদ পাওয়া যায় প্রথম শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চার ৩.১৮ শ্লোকে এবং ৩।১৮।৪-৬ শ্লোকে।

এ-বিষয়টি মহাকবি কর্ণপুরের বর্তমান কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তা যাক, এই রায় রামানন্দকে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ঐতিহাসিক সম্পর্কের তথ্যটিকে পণ্ডিত বৃন্দ এইভাবে স্থির করেছেন—

আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি রায় রামানন্দের জন্ম।

১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌর সুন্দরের অন্তর্ধানের পর ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রায় রামানন্দের লোকান্তর।

রামকেলিতে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লাভ করেন ওঁরা, তখন শ্রীরূপের বয়স আনু-

মানিক ২৫ পঁচিশ বৎসর অতিক্রম ক'রেছে বা ক'রছে। এই শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং ব্রজ ভূমিতে পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে অবস্থান করেন। তাছাড়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অভিনব ধরণে যে বৈষ্ণব ধর্ম, তার যাঁরা স্তম্ভতুল্য তাঁদের মধ্যে শ্রীরূপ সনাতনের কৃতিত্ব অপরিমেয়। এঁদের রচিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা যা অদ্যাবধি পাওয়া গিয়েছে. তাতে শ্রীরূপের গ্রন্থ ১৫খানি এবং শ্রীসনাতনের রচিত ৬ খানি।

এঁদের মধ্যে শ্রীরূপের গ্রন্থ রচনার কাল আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

শ্রীরূপের লোকান্তর ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণী দ্বাদশীতে এবং শ্রীসনাতনের লোকান্তর ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ী পূর্ণিমায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ২।১।১৭২ পয়ারে রামকেলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর, প্রয়াগে দশদিন (চৈঃ চঃ ২।১৯।১২২) এবং নীলাচলে দশ মাস (চৈঃ চঃ ৩।৪।২৫)। এঁরা যখনই শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পেয়েছেন তখনই সন্ন্যাসী গৌরেরই দর্শন পেয়েছেন।

আর শ্রীসনাতনও শ্রীগৌরের দর্শন পেয়েছেন প্রথম রামকেলিতে একদিন. পরে কাশীতে ২ মাস, নীলাচলে ১বৎসর।

এই দুই ভাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কাছে বৈষ্ণব ধর্মের আদি ভিত্তিতে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন, সেটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পরিবেশনের ভঙ্গীতে এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেন, ও সব তত্ত্ব ও তথ্য শ্রীগৌরাঙ্গের মোটেই জানা ছিল না, ওসব রায় রামানন্দের কাছে শিখে এসেই, তা তাঁদিকে উপদেশ ক'রেছেন—

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
শ্রীরূপে কৃপা করি সব তাহা কহিলা ॥

চৈঃ চঃ ২।১৯

আবার সেই শ্রীরূপের মুখেই যেন শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শুনেছেন রায় রামানন্দের উক্তি—

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণ বিষয় ভাব ॥
রায় কহে কহ "সহজ প্রেমের" লক্ষণ।
রূপ গোঁসাই কহে "সাহজিক প্রেম" ধর্ম ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম।

এখানে লক্ষ্য করার কথা, এই যে 'সহজ প্রেমের' কথা, তাও নিশ্চয় স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় তিনি লিখেছিলেন ?

প্রকারান্তরে দাঁড়াল এই যে, গৌরাঙ্গ সুন্দর সাহজিক বা সহজিয়াপ্রেমের কোন কিছুই জানতেন না. রায় রামানন্দের কাছে "সহজিয়াপ্রেম তত্ত্ব" জেনে বা শিখে এসে ছিলেন এবং তাই আবার শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তেমনি তথ্যই বোধহয় স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এতে হ'য়েছে এই যে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" (শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধবের শ্লোক) এটি

গৌরে খাটে না, এটি রায় রামানন্দেই খাটে। কারণ উজ্জ্বল রসের প্রেমভক্তির দান তো গৌরাঙ্গের নয়, ওটি যে রায় রামানন্দের।

এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর প্রসঙ্গ অর্থাৎ তাঁর জন্ম । শ্রীচরিতামৃতের জন্ম ও পূর্ণতার সময়টি কত খ্রীষ্টাব্দের।

কারণ কতদিনের ব্যবধানে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন শ্রীগৌর সুন্দরের অনর্পিতচর প্রেম দানের কথা? অপর পক্ষে রায় রামানন্দেরই বা অনর্পিতচর প্রেম দানের কথা? যেটি রূপের উক্তি?

আর সেই রায় রামানন্দের সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তি গুলিকে সমর্থনের জন্য কবিরাজ গোস্বামী কোন্ কোন্ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন?

ও ক্ষেত্রে চিরকালের অদৃষ্ট গোচর থাকা অথচ একমাত্র কবিরাজ গোস্বামীর গোচরে আসা "স্বরূপ দামোদরের কড়চার" অস্তিত্ব কি ভাবে তিনি রক্ষা ক'রেছেন।

এই পয়ারটিকে ঐতিহাসিক ভিত্তির সমর্থনে রাখলে বোঝা যাবে—শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তির কতখানি পুষ্টিসাধন করেছে এবং তাঁর প্রদত্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের শ্লোকরাজি য সব উল্লেখ অথবা ওই উল্লেখ তা করে নাই তা কি সমর্থন ক'রেছে সেইটিই এখানে আলোচ্য।

শ্রীস্বরূপ দামোদরের মত পরম মাননীয়ের রচিত কড়চা ব'লে যে একখানি গ্রন্থ ছিল সেটির প্রসিদ্ধি সৃষ্টির পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে দেখা দরকার, কারণ অনেক আলোচনা ক'রে দেখা যাচ্ছে, সে কড়চাটির অস্তিত্বে পূর্বাপর কোন আচার্য্যেরই লিখিত গ্রন্থে তার উল্লেখ নাই। অথচ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর মত বিজ্ঞতম ব্যক্তির নামে 'স্বরূপ দামোদরের কড়চার' উদ্ধৃতি, এটার লিখিত নজীর তো পাওয়া যাচ্ছে; যদিও তা প্রাচীন পুঁথিতে শুধু 'তথাহি' আছে পুরাতন হাতের লেখা। আর ও কড়চাটির সিদ্ধান্তবাদ এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যটি কোনও আচার্যের লিখিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে না কেন?

কিন্তু প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" ব'লতেই নতমস্তকে তাকে সমর্থন জানান হয়।

পরম পূজনীয় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটিতে বাংলায় উদ্ভূত বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে বাংলা ভাষায় রূপদান ক'রে, তিনি অমর লেখক হ'য়ে আছেন, আর সেই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন চরিতকেও একটি অখণ্ড মহিমময় পুরুষের রূপদান করেছেন, যা অপরত্র দুর্ল'ভ।

তবুও তাঁর পূর্বাচার্য্যদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ স্থলে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, যেটি অনুশীলন ক'রতে গিয়েই পণ্ডিতরা বলেন "তত্ত্ব ও লীলাবাদের" সমন্বয় করার দক্ষতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে বাংলা ভাষায় আর কারোর মধ্যে এমন নিখুঁত হ'য়ে ফোটে নাই।

তাঁর সেই দক্ষতা বাংলা ভাষায় মহনীয় পুরুষদের জীবনী লেখার একটা নূতন দিক্ খুলে দিয়েছে, যার ফলে তত্ত্ববাদের প্রাধান্য দিয়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় আখ্যায় আখ্যায়িত করার সুযোগ এসেছে।

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যটি তত্ত্ববাদেরই অনুসৃতি এবং আচরণ কিংবা লীলা ও সেই তত্ত্ববাদেরই ক্রমবিকাশ, এমন সিদ্ধান্ত স্থাপন করার প্রাথমিক পর্যায় ভারতে 'বজ্রযানীদের' আগে কেউ করেছেন এমন ইতিহাস লক্ষ্যে আসে না।

যদি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা দেখা যায় যে, কবিরাজ গোস্বামীর ঐ 'কড়চার' উক্তিটিই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধকের লেখা হয়, তা হ'লে পরিষ্কার ধরা যাবে কোনও গূঢ় উদ্দেশ নিয়েই শ্রীমন মহাপ্রভুর অপরূপ সুন্দর বৈষ্ণব ধর্মকে ভারতে বেদানুসৃত পথ থেকে বিচ্যুতই ক'রতে চেয়েছেন তিনি, যা ছয় গোস্বামীর কেউই তা অনুমোদন করেন নি।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকবৃন্দ কি কি সংকেত রেখেছেন, আগে সেই তথ্যগুলিকে সম্মুখে রেখে, রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হবে; কারণ শ্রীচরিতামৃতে "শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দের" মিলনে যে ভক্তিরসের অবদান এসেছে বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্মে, সেটির কাল ঔচিত্যের ভিত্তি কতখানি এবং তাতে কবিরাজ গোস্বামীর জবানীর মূল্যায়ন কি ভাবে সাধিত হয়।

ঐতিহাসিক বৃন্দ তথ্য প্রমাণের পঞ্জী বিবেচনা ক'রে জেনেছেন, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর জন্ম আনুমানিক ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্য রচনা করেন। এ গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ২৫৮৮। এটি এতবড় কাব্য এবং কাব্যের ভাষা এত চমৎকার, যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিরাট কাব্যটির মত তা সাধারণ মেধাবীর পক্ষে রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বলা চলে, মাঘ নৈষধ কাব্যের পরই এর স্থান।

শ্রীপাদ শ্রীজীবও বিরাট কাব্য নির্মাণ করেছেন, যার নাম "শ্রীগোপাল চম্পূ" সেটিও শুধু পদ্যে নয় সেটি গদ্যে এবং পদ্যে মিশিয়ে।

কবিরাজ গোস্বামী এক 'গোবিন্দ লীলামৃত' মহাকাব্য রচনা ক'রেই তিনি কবিরাজ এটা নিঃসন্দেহ। তিনি মহাকবি। এত রকমের ছন্দ, এত বিভিন্ন রকমের অলংকার যে, অপর কথায় বলা যায় "শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরেই এটি ভক্তি মহাকাব্য।

এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রেই বোধহয় শ্রীগৌরাজ-করুণা-সিক্ত-হৃদয় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ শ্রীকৃষ্ণদাসকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত ক'রে ছিলেন—

যস্য সঙ্গ বলতোহদ্ভুতাশয়া মুক্তিকোত্তম কথা প্রবাচিতা।
তস্য কৃষ্ণ "কবি ভূপতি" ব্রজে সঙ্গতিঃ ভবতু মে ভবে ভবে॥

—"মুক্তাচরিত্রম্"

সেই গোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্যটি রচিত হবার পরই যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তাচরিত্র রচিত হ'য়েছে তাও নিঃসন্দেহ।

আবার মুক্তাচরিত্র রচিত হবার পর যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "উজ্জ্বল নীলমণি" রচনা ক'রেছেন, তাও স্পষ্ট হ'য়ে আছে, কারণ মুক্তাচরিতের কয়েকটি শ্লোক উজ্জ্বলে উদ্ধৃত হ'য়েছে।

এই সব নজীর পেয়েই পণ্ডিতরা মনে করেন, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের রচনা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

তখন কিন্তু শ্রীরূপের ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর রচনা শেষ হ'য়ে গিয়েছে, কারণ ও গ্রন্থটির পুষ্পিকা দেখে বোঝা যায় ওটি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের।

আবার রসামৃতের আগেই রচিত হয়েছে শ্রীহরিভক্তিবিলাস, কারণ রসামৃতের দ্বিতীয় লহরীর ৯৪ সংখ্যক শ্লোকটি হরিভক্তি বিলাসের।

এ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে যে কৃষ্ণদাসের প্রশস্তিমূলক শ্লোকটি রয়েছে, কাকে লক্ষ্য ক'রে তা বলা যায় না, কারণ শ্রীকবিরাজের বৃন্দাবনে উপস্থিতির কাল ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং তিনি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে এটি সমাপ্ত করেন।

এদিকে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীপাদ শ্রীজীবের শ্রীগোপাল চম্পুর পূর্বার্দ্ধের লেখা শেষ এবং ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে সেটির উত্তরার্ধের সমাপ্তি।

কিন্তু সকলেই জানেন এসব গ্রন্থের আগেই অর্থাৎ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি রচিত হ'য়েছে এবং ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের এবং ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যও রচিত হ'য়েছে।

তারপর শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থটি ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় অর্থাৎ কর্ণপুরেরও গ্রন্থ দুটি রচিত হবার পরে।

তবে একথাও ঠিক যে, কর্ণপুরের ঐ গ্রন্থ দু'টি রচিত হবার আগেই শ্রীরূপের "বিদগ্ধ মাধব" নাটকের রচনার শেষ, কিন্তু শ্রীজীবের তোষিণী এবং শ্রীরূপের লঘুতোষিণী তখনও হয় নাই।

কারণ ভাগবতের ঐ টীকাটি (শ্রীজীবের) ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং শ্রীরূপের টীকাটি ১৫৮২ থেকে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

এ গ্রন্থের মধ্যে ঐসব ঐতিহাসিক নিরীক্ষা সংগ্রহ ক'রতে স্বর্গীয় ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ, স্বর্গীয় ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, স্বর্গীয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, স্বর্গীয় মুরারিলাল অধিকারী, স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় বৃন্দের লিখিত তথ্যাবলীর সাহায্য গ্রহণ ক'রেছি।

০ ০ ০ ০

এই অংশটি লেখার সময় আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ২৩ নম্বর সরকার লেন, কলিকাতা নিবাসী শ্রীঅমিয় গোপাল বর্মণ রায়, এম. এ. মহাশয় স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে যশোহর ও খুলনা জেলার ইতিহাস লেখক ৺সতীশ মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত সরণিটি, যা ঐতিহাসিক ঘটনার আনুমানিক তারিখের নিদর্শন, সেই পত্রটি পাঠিয়েছেন, সেই সংগ্রহটি ছাড়া স্বর্গীয় মধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি মহাশয়ের সংগৃহীত নিরীক্ষাপত্রটিও প্রকাশ ক'রলাম। পাঠকবর্গের অনুসন্ধান ও গবেষণায় অনেক সাহায্য হবে।

শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ	
১৪৩০	১৫০৮	নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ
১৪৩১	১৫০৯	কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও পুরী যাত্রা
১৫৩২-৩৩	১৫১০-১১	দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ

শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ	
১৪৩৯	১৫১৭	ঝামটপুরে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম
১৪৫৫	১৫৩৩	শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান (আষাঢ়)
১৪৫৭	১৫৩৫	শ্রীজীবের বৃন্দাবন আগমন
১৪৬৪	১৫৪২	কর্ণপুরের মহাকাব্য রচনার শেষ
১৪৯৪	১৫৭২	কর্ণপুরের নাটক রচনার শেষ
১৪৯৭	১৫৭৫	শ্রীবৃন্দাবন দাসের চৈঃ ভাঃ/শ্রীলোচনের চৈঃ মঙ্গল
১৫০০	১৫৭৮	শ্রীজীবের লঘুতোষিণী রচনার শেষ
১৫০৩	১৫৮১	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচনার শেষ
১৫১০	১৫৮৮	শ্রীজীবের গোপাল চম্পূ রচনা শেষ
১৫১৮	১৫৯৬	শ্রীজীবের লোকান্তর

শ্রীমধুসূদন তত্ত্ব বাচস্পতি কর্তৃক সংগৃহীত

শকাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	
১৪৩৬	১৫১৪	কর্ণপুরের জন্ম
১৪৫৫	১৪৩৩	স্বরূপ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান
১৪৫৬	১৫৩৪	রায় রামানন্দের লোকান্তর
১৪৮৫	১৫৬৭	রঘুনাথ ভট্টের লোকান্তর
১৪১৯	১৪৯৭	রঘুনাথ দাসের জন্ম
১৫০৮	১৫৮৬	রঘুনাথ দাসের লোকান্তর
১৪২৫	১৫০৩	গোপাল ভট্টের জন্ম
১৫০৭	১৫৮৫	,, লোকান্তর
১৪০৯	১৪৮৭	গদাধর পণ্ডিতের জন্ম
১৪৫৬	১৫৩৪	গদাধর পণ্ডিতের লোকান্তর
১৪৬৩	১৫৪১	ভক্তি রসামৃত রচনা শেষ
১৪৫২	১৫৩৭	ললিতমাধব রচনা শেষ
১৪৭১	১৫৪৯	দানকেলি কৌমুদী রচনা শেষ
১৪৩৬	১৫১৪	কর্ণপুরের জন্ম
১৪১৮	১৪৯৬	কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম
১৫০৩	১৫৮১	কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতের রচনা শেষ
১৫০৪	১৫৮২	কবিরাজ গোস্বামীর লোকান্তর

শ্রীনিত্যানন্দ

১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভাব

১২ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ

১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্ধান

এ গ্রন্থের এইভাবে পূর্ব পীঠ রচনার প্রয়োজন এইজন্য যে, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ব'লেছেন—

"দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে" ॥ চৈঃ চঃ ২।৮।২৬

বজ্রযানী সম্প্রদায়ের মৌল ভূমিকা পাতঞ্জল যোগ দর্শনের সাতাশ প্রকার যোগের মধ্যে 'মেঘ সমাধির' একটি পর্যায়ের নাম "বজ্রযোগ"।

সেই বজ্রযোগই বজ্রযানী বা বজ্রমার্গীদের উপাসনার শেষ লক্ষ্য। এই যোগে মেঘের বর্ষণের মত আত্মশক্তির বর্ষণ হয়।

দয়া, করুণা, লাবণ্য, হ্লাদ, আনন্দ, সম্বিৎ, সন্ধি, কৃপা, তারুণ্য, কৈশোর্য, অমৃতত্ত্ব প্রভৃতি নিখিলাত্মীয়তা বর্ষিত হয়, বিশ্ব আপ্লুত হয় এই বজ্রযোগের সিদ্ধিতে। বজ্রযোগে যাঁদের অবস্থিতি, তাঁরা আত্মরমণ করেন, তাঁরা নিগ্রস্থ হন, তাঁরা আত্মানন্দ লাভ করেন, তাঁরা আত্মাকে দ্বৈধ, ত্রৈধ, অনেকধা ক'রে বিশ্বরমণ করেন, তাঁরা দেহ-দেহী অভিন্ন হ'য়ে ভিন্ন হয়ে যান এবং তাতেই বিশ্বপ্রকৃতি দর্শন করেন, আবার বিশ্বের যে কোনও চিৎকণ প্রাকৃতকণ ও হ্লাদ কণে রমণ করেন।

বজ্রযানীদের এই হলো সিদ্ধান্ত। তত্ত্ববাদ ব'ল্লেই প্রধানতঃ 'কেবল তান্ত্রিক' ধারাটির শিরা উপশিরার খোঁজ পাওয়া যায়। বজ্রযানীরা হ'লেন 'কেবলতান্ত্রিক' তাঁরাই তত্ত্ববাদের আদি প্রবর্তক। তবে এতে কেউ কেউ বৌদ্ধ এই বিশেষণটুকু জুড়ে দেন, সেটা সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। দেহ তত্ত্ববাদকে অবলম্বন ক'রে যে কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিআচরণকে আত্মলীলা বলার রীতি ভারতে খুব প্রাচীন। তিনি গৃহী, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, রমণী, পুরুষ সবই হ'তে পারেন।

এইভাবে বজ্রযোগের দর্শন, সেই ধারার প্রবর্তনের পর থেকে, লয়যোগ, আত্মযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, গুহ্যযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, নৈষ্কর্মযোগ, সাংখ্যযোগ প্রভৃতি বহু বিশেষণে বিশেষিত যোগ শব্দটির প্রকাশ, এবং তাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনা-রীতির প্রতিষ্ঠাও ভারতে সুপ্রাচীন। মূলে সেই বজ্রযোগেরই অনুসরণ।

বজ্রযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তত্ত্ববাদ। ব্যক্তি প্রাধান্য সেখানে গৌণ। বৈদিক রীতিতে এমন তত্ত্ববাদের প্রকাশ স্পষ্টতঃ দেখা যায় না। তাই তাঁদের ধারায় হ্রীং হ্লীং ক্রীং ক্লীং স্লীং, ঐং হুং রাং প্রভৃতি বর্ণ সঙ্কেতে মন্ত্রপ্রকাশ ক'রে এবং ব্যক্তির মূর্তি পূজারও রীতি দেখা যায় না, আর মন্ত্রাত্মক তত্ত্ববাদও তাঁদের নাই। অথর্ববেদের আমলেও অমনভাবে প্রসারিত মন্ত্রাত্মক তত্ত্ববাদের উদ্ভব হ'য়েছে ব'লে জানা যায় না।

কিন্তু যাঁরা "কেবলতান্ত্রিক" তাঁদের মধ্যেই তত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। ও তত্ত্ববাদে মন্ত্রাত্মক পূজায় স্ফূর্ত-মূর্তি ছাড়া অন্য সব মূর্তিই প্রাকৃত এবং অনিত্য। বেদের পূর্ব মীমাংসার শব্দাত্মক দেব স্ফূর্তির সঙ্গে অভিন্ন করে, বজ্রযোগের শব্দ সঙ্কেতময় মন্ত্রবাদই 'তত্ত্ববাদ' এটি পরবর্তিকালের মন্ত্রভাষ্য। অতএব মন্ত্রাত্মক মূর্তির প্রকাশ অপ্রকাশই হোলো নিত্যানিত্য তত্ত্ব।

এই তত্ত্ববাদকেই সাহিত্য ভাষায় জ্ঞাপন করার রীতি হোলো "কোনও কোনও ভাগ্যবান্ তাঁকে দেখতে পান, তিনি চিরকাল লীলা ক'রছেন। অদ্যাপীহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।

সেই নিত্যানিত্যময় তত্ত্ববাদেই ভারতে সব রকম যোগের প্রকাশ। যাঁরা ভক্তি-যোগী তাঁরা, তত্ত্ববাদের নাম দিয়েছেন "অপ্রাকৃত", আর যেটিতে তত্ত্ববাদ নেই তার নাম প্রাকৃত।

যে সব দার্শনিক ও সাহিত্যিক অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদ প্রকাশক গ্রন্থ নির্মাণ ক'রেছেন, সেইসব গ্রন্থে এই তত্ত্ববাদেরই সমর্থন ছত্রে ছত্রে। কোনও ব্যক্তির জীবনের আচরণ বা লীলা সেইজন্যই তত্ত্ববাদের অনুগত ক'রে প্রকাশ করার পদ্ধতি, আমাদের ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই চ'লে আসছে।

সেই রীতিতেই শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবনটিকে তত্ত্বময় করে দেখানর ধারা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীই প্রথম দেখিয়েছেন ব'লে মনে করা হয়।

তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস ও শ্রীগদাধর নামের পুরুষবৃন্দ এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

সেই পাঁচটি বিশিষ্ট পুরুষই বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। শ্রীকবিরাজ তাঁদের কার্যাবলীকে প্রাধান্য দিয়েছেন তত্ত্ববাদের মাধ্যমে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে নয়।

কিন্তু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এই তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত ক'রেছেন স্বরূপ দামোদরের কড়চার ওপর এবং কড়চার লেখকের ওপর।

বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি পূর্বতন ঈশ্বরবৃন্দের জন্য এমন তত্ত্ববাদের প্রসঙ্গ এসেছিল অথবা আসে কিনা, তেমন কোন প্রশ্ন তোলেন নি শ্রীকবিরাজ। অর্থাৎ তাদেরও পূর্বে যে আরও বিশেষ পুরুষ ছিলেন, তাঁদেরই তত্ত্ববাদে শ্রীবিষ্ণু, ও শ্রীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা এমন প্রসঙ্গও তোলেন নি এবং অন্য কোন পুরাণাদির শ্লোকের প্রামাণ্য নজীরও দেখানর প্রয়োজন হয়নি শ্রীকবিরাজের। তবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের যুগে সত্ব, রজ, তমোগুণের তত্ত্ববাদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। যা ঘটেছে তা, সত্ব, রজ তম গুণ দিয়ে নয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য জীবনীকারদের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর পরিবার একেবারে ভিন্ন স্বাদের হ'য়েছেন।

এই ভিন্ন ধরণের আস্বাদনের মৌল ভিত্তিটি কেমন ক'রে এল, এর কৈফিয়ৎ হিসাবে শ্রীকবিরাজ বলেছেন, এ তত্ত্ববাদ আমার নয় এটি স্বরূপ দামোদরের লেখা কড়চা থেকেই জানা গিয়েছে।

(এ প্রসঙ্গ বিস্তৃত করে সমালোচনা ক'রেছি এই গ্রন্থের প্রথম দিকে)

কড়চার আরও একটি আকর্ষণীয় স্থান শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার ৮ম পরিচ্ছেদ। যেটির অপর নাম "রায় রামানন্দ সংবাদ"।

বাংলার উদ্ভূত বৈষ্ণব ধর্মের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ষড় গোস্বামীর বিশুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্তে যাঁরা আস্থাশীল পণ্ডিত এবং অনুপ্রাণিত, তাঁদের কাছে রায় রামানন্দ সংবাদটি খুব বিস্ময়কর প্রশ্নে জড়িত হ'য়ে আছে, কারণ, যুক্তির ক্ষেত্রে এটি কালগত-অনৌচিত্য-দোষে দুষ্ট, এতে দাক্ষিণাত্য সংস্কৃতিরই মৌল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করা

হ’য়েছে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত ভক্তি সিদ্ধান্তের এতটুকু মৌল প্রতিষ্ঠাও এতে নেই, এতে তাঁরা বলেন ও মনে করেন এ এক অপূর্ব তথ্য।

কিন্তু যাঁরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও অন্যান্য মহাজনদের লিখিত পদ-পদাবলীর পরকীয় রসভাষ্যে বিশেষ আস্থাশীল, তাঁরা পূর্বের সন্দেহ ও প্রশ্নের তোয়াক্কা না রেখে, রায়-রামানন্দ সংবাদটিকে বড দুর্লভ ও অমুল্য সম্পদ রয়েছে বলে মনে করেন এবং ‘স্বরূপ দামোদরের কড়চার,’ অস্তিত্ব যে ছিল এমন বিশ্বাস ও করেন এই সংবাদের দ্বারা।

এখন যাঁরা পূর্বপক্ষ অবলম্বন ক’রতে চান [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ধারাতে নয়] তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলার ৮ম পরিচ্ছেদটি কেন বিস্ময়কর ? কেন কাল অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট ? কেন বিতর্ক ও সন্দেহ সৃষ্টি করে ?

এই সব কেনর উত্তরে—

১। যেহেতু বৈষ্ণব আচার্যদের সিদ্ধান্তের গ্রন্থগুলি যখন জন্মগ্রহণ করে নাই।

২। অন্যান্য প্রামাণ্য জীবনীকারদের প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে ও আচরণের সঙ্গে মোটেই মিল নাই।

৩। স্বরূপ দামোদরের কড়চার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য অন্য আচার্য্যদের অজ্ঞাত।

৪। মধ্য লীলার ৮ম পরিচ্ছেদের দায়-দায়িত্ব কবিরাজ গোস্বামী নিজেও গ্রহণ করেন নাই।

৫। সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে কেন মিল হ’য়ে যায় ?

৬। শ্রীচৈতন্যদেবকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাপক না ব’লে দাক্ষিণাত্যের সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতীক কেন করা হ’য়েছে ?

পণ্ডিতবৃন্দ জানেন যে; শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত “ভক্তিরসামৃত সিন্ধু” গ্রন্থের ১।২।১৫১ থেকে ১।২।১৭৩ পর্যন্ত শ্লোকগুলির বক্তব্যের ভিত্তিতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান দান ‘রাগানুগাভক্তি’, এবং সেই পথেই ভক্তিময় জীবনের উপাসনা।

তবে এই শ্লোকগুলির প্রধান উপজীব্য কি এবং তাদের আকর গ্রন্থ কি কি, সে সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীরূপ এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব, শ্রীভাগবতের কয়েকটি শ্লোক ছাড়া, দার্শনিক ধারায় আর কিছু বলেন নাই।

কিন্তু তাঁদের ঐ বক্তব্যের ধারাকেই অনুশীলন ক’রে জানা যায়, শ্রীভাগবতের ৩।১৫।১৪ শ্লোকের বক্তব্যকে ভিত্তি ক’রেই এই রাগানুগা ভক্তি ও সেই পথের উপাসনা, এটা নিঃসন্দেহ।

শ্রীভাগবতের ঐ স্কন্ধের আর একটি শ্লোক ৩।৯।১১। প্রথমটি হোল—

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠ মূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্ত নিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥

অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্মে শ্রীহরিকে আরাধনা ক’রে যাঁরা সেইখানেই বাস করেন, তাঁরা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি।

আর দ্বিতীয় শ্লোক—

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিত পথো নন্থ নাথ পুংসাম্ ॥
যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তদ্ তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

অর্থাৎ—হে ঈশ্বর! হে নাথ! ভক্তিযুক্ত চিত্তে তোমাকে ভাবনা ক'রলে তুমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ কর।

এই ভক্তিবাদটিতে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তি রসামৃতের ১।২।১৫১ শ্লোকে বলেছেন—

"সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

দ্বিতীয়টি—

লুব্ধৈর্বাৎসল্য সখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্রসাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্র সুবলাদীনাং ভাব চেষ্টিত মুদ্রয়া ॥

অর্থাৎ—ভক্তিযুক্ত সাধক (রাগভক্তি যুক্ত) ব্রজবাসিদের মত কৃষ্ণকে প্রীতি করা ভাবে লুব্ধ হ'লে, সেইভাবেই সিদ্ধরূপে নিজেকে ভাবনা ক'রবেন, বাৎসল্য, সখ্যাদিভাবে লোভযুক্ত ও রাগাত্মিকা ভক্তিময় চিত্তে তাঁর ভাব ও চেষ্টাকে সাধক ভাবনা ক'রবে ব্রজবাসিদের মত।

এই শ্লোকের বক্তব্যে সাযুজ্য, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তিরই অপর একটি ভিন্ন ধরণের পৃষ্ঠচিত্রই ফুটে ওঠে। তবে মুক্তি সংজ্ঞায় নয়। ঐ স্বভাবের আর ঐ তত্ত্বের দাতা, সে বৈকুণ্ঠেশ্বর। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

পূর্বের বৈষ্ণব আচার্যদের সঙ্গে গৌড়ের বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্তের ছাড়াছাড়ি এইখা থেকে। অর্থাৎ ভাব সাযুজ্য এবং ভাব সামীপ্যের দাতৃত্ব থেকে নারায়ণ বা বৈকুণ্ঠেশ্বর ' তাঁর ধাম ও তাঁর সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্তি স্বীকার করেন এটা পূর্বের বৈষ্ণ আচার্য্যগণের মত।

ওইখানে গৌড়ের বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মৌন রক্ষা ক'রে বলেন শ্রীকৃষ্ণই, ভগবান আর নারায়ণ প্রভৃতি তাঁর অংশ কলা। গোলোক এবং বৃন্দাবনেই তাঁর নিত্য বসতি বৃন্দাবনে প্রাকৃতবৎ হ'য়েও তিনি অপ্রাকৃত। তাই তাঁর লীলায় প্রকট ও অপ্রকটে মাত্র ছেদ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলার সেবা সুখই সাধকের কাম্য, তারই নাম প্রেমসেবা এ সেবা লাভ ক'রতে রাগভক্তিযুক্ত চিত্তের সিদ্ধাবস্থার প্রয়োজন।

অতএব সাধক সেই রাগভক্তিযুক্ত হবেন এবং ব্রজবাসিগণের ভাবে নিজেকে বিভাবিত ক'রবেন। তা'হলেই ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণের ধাম ও সেবালাভ হবে।

শ্রীরূপের এই সিদ্ধান্তটি খুব জটিল মনস্তাত্ত্বিক। তাই ওই শ্লোকগুলিকে পরিষ্কা ক'রে বোঝাবার জন্য শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ব'লেছেন—

"পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন, তৎ পিত্রাদিভিরভেদ ভাবনয়া চ অত্রাদ্যমনুচিতং ভগবদভেদ-উপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমানে তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎ পরিকরেষু তদনুচিতভাবনা বিশেষেণ অপরাধপাতাৎ।"

অর্থাৎ যে রাগভক্তিতে ব্রজবাসিগণের মত ভাবটি অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রের কিম্বা সুবলাদি সখার ভাবে লোভ হবে, সে ভাবের লোভটি খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে চিন্তা ক'রতে হবে, বা ভাবনা ক'রতে হবে।

কারণ ঐ ভাবের অভিমান দুই রকমের, স্বতন্ত্ররূপে পিতা মাতা সখার ভাব এবং তাঁদের সঙ্গে অভেদ-ভাবনার ভাব। এই দুই রকমের মননটিই অনুচিত। তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন ভাব চিন্তা ক'রলে যে অপরাধ, তাঁদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে চিন্তা করলেও সেই অপরাধ এবং তা অনুচিত; কারণ, স্বতন্ত্র চিন্তা ক'রলেও কি পরে নন্দ, যশোদা সুবল, শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলীর দেহ লাভ ক'রে সেই সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবে শেষে? না, তা হয়না! তবে?

তার উত্তর এই যে, "তত্র হি অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট সেবোপযোগি দেহেন তৎ সিদ্ধির্ভবতি করুণাময় স্বশক্তি প্রভাবেণ নিত্যকালযোগ যুক্তিতঃ :—

অর্থাৎ, অন্তরে তাঁকে ও তাঁর সেবা প্রাপ্তদের মত চিন্তা ক'রলে, করুণাময়ের কারুণ্য শক্তি প্রভাবেই নিত্যকালেই তা সিদ্ধ হবে। যেমন—

নন্দসূনোরধিষ্ঠানং যত্র পুত্রতয়া ভজন্।
নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধঃ অভূদ্ বদ্ধবর্দ্ধকিঃ।

ভক্তিরসামৃত ১।২।১৬১

অর্থাৎ লীলাশক্তির প্রভাবে গো-বৎস হরণলীলায় যেমন তাঁদের পিতা-মাতাদের কৃষ্ণ সান্নিধ্য, কৃষ্ণসঙ্গ, কৃষ্ণময় কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হ'য়েছিল সেইরূপ লাভ হয় ভাবনাসিদ্ধ সাধকের।

এই হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের লীলাবাদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ উপাসনা। এই উপাসনায় কোনও রকমেই কোনও আচার্যের দার্শনিক ও ভক্তিরসময়ত্বে গরমিল হয় না। এই সিদ্ধান্তটিকে দৃঢ় করার জন্য ভাগবতের ৩।২৫।২৮ শ্লোক :

ন কর্হিচিৎ মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নোঽমে নিমিষো লেঢ়ি হেতি।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরু সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

এই সব শ্লোকের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন শ্রীপাদ শ্রীরূপ। খুব সংক্ষেপে শ্রীরূপের বক্তব্যের সার অর্থ এই যে, "জীব সিদ্ধাবস্থাতেও তটস্থা শক্তিতে অবস্থান করে। স্বরূপ শক্তি হয় না, কখনও কোন কালেও হয় না।"

এখান থেকেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর প্রদত্ত প্রতিবেদনটির সঙ্গে (রিপোর্টিং) পণ্ডিত মহলে বিতর্কের সৃষ্টি ক'রেছে। বিশেষ ক'রে রায় রামানন্দ সংবাদটিকে ভিত্তি ক'রে।

শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন—এই পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তুর সার সংগ্রহ করা হয়েছে "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" থেকে অর্থাৎ রায় রামানন্দ মিলনটির সংবাদই স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে পেয়েছি।

"দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে॥ চৈঃ চঃ ২।৮।২৬

তাছাড়া আরও ব'লেছেন রায় রামানন্দকে আমি কোটি নমস্কার করি। কার তাঁরই প্রমুখাৎ প্রচারিত এই রস বিস্তার তথ্যটি জানতে পেরেছি।

রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥

কিন্তু স্বরূপ দামোদরের কড়চার অস্তিত্ব শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর জবানীতেই পাওয়া যায়, আর কোনও আচার্য্যের লিখিত প্রমাণে তা নেই। আর রায় রামানন্দ সংবাদটি কর্ণপুরের দুটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, যা অপরত্র অত বিস্তৃত নাই।

কর্ণপুরের সে দুটি গ্রন্থ হোলো শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য।

ও দুটিতে রামানন্দ মিলনের বিশেষ বক্তব্য (১) ক্রম অনুসারে সাধ্য নির্ণয় (২) নানোপচার কৃত পূজনং (৩) এবং পহিলহি রাগ।

ওখানে কিন্তু প্রভুর মুখেই রসের বিস্তার হ'য়েছে এমন মন্তব্য নাই।

এইখানে অর্থাৎ শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে, ওই মন্তব্যটি অতিরিক্ত ক'রে জোড়া র'য়েছে দেখা যাচ্ছে। কবিরাজ ব'লছেন প্রভুই কৃপা ক'রে রামানন্দ রায় মুখে বিস্তৃত ক'রে ব'লেছেন।

শ্রীকবিরাজ আরও ব'লেছেন এই রসের বিস্তৃতির প্রসঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানা যায়।

শ্রীচৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব? (কি সে গূঢ় তত্ত্ব?) (ঈশ্বরের আবার গূঢ়তত্ত্ব?) জানা যায়। এ সম্বন্ধে তর্ক না ক'রে বিশ্বাস ক'রতে হবে। এটি অলৌকিক লীলাই। এই হোলো শ্রীচৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব।

চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥

এই মন্তব্যটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব? অথবা স্বরূপ দামোদরের?

সেই নিগূঢ় তত্ত্বটিই বা কি?

গোদাবরী নদীর তীরের পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে সন্ধ্যায় রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে সাক্ষাৎ হয়, তা একবার নয়, দু'বার। শ্রীকবিরাজের মতে একবার। কবি কর্ণপুরের মতে দুবার। এবং উক্তি প্রত্যুক্তি হয় দ্বিতীয় বারে। শ্রীকবিরাজের মতে সেই প্রথম বারেই। এবং সে সংবাদটি স্বরূপ দামোদরের কড়চার মাধ্যমে শ্রীকবিরাজই জেনেছেন।

যাই হোক, সেই সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন জীবের সাধ্য সাধন সম্বন্ধে আমাকে তুমি কিছু শোনাও।

তার উত্তরে রায় রামানন্দ ব'লেছিলেন তা বৈদিক আচার ও উপাসনার যে সিদ্ধান্ত র'য়েছে অর্থাৎ বিষ্ণু পুরাণে ধৃত শ্লোকাবলীর মাধ্যমে যা জ্ঞাপন করা আছে তাই সাধ্য সাধনের কথা। এই প্রথম উত্তর।

তাঁর সেই উত্তরে শ্রীচৈতন্য ব'লেছিলেন, এছাড়া আর কি জান বল ?

রায় রামানন্দ তখন ব'ল্লেন গীতার ৯ম অধ্যায়ে যা বলা হ'য়েছে, এবং শ্রীভাগবতের ১১দশ স্কন্ধে এবং গীতার ১৮দশ, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে যা বলা হ'য়েছে সেই সব তথ্য।

কিন্তু তাতেও শ্রীচৈতন্য দেব বল্লেন—হ্যাঁ এও জানা, আর কি জান বল !

আবার রায় রামানন্দ ব'ল্লেন

ভক্তি লাভের উর্ধ্বে আছে প্রেম ভক্তি

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং—

অর্থাৎ পদ্যাবলী গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তাই—

নানাপোচার কৃত পূজনমার্ত্ত বন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নহু ভক্ষ্যপেয়ে ॥

পদ্যাবলী গ্রন্থের এই উক্তিটিকে প্রামাণ্য করেই রায় রামানন্দ "প্রেমভক্তি"র সিদ্ধান্ত স্থাপন ক'রেছেন। অর্থাৎ যখন রায় রামানন্দ ঐ উক্তিটি ক'রেছেন, তার অনেক দিন পরে স্বরূপ দামোদর শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে এসে মিলিত হ'লেও—তাঁর কড়চা গ্রন্থটিতে অমন উক্তি লিখতে গিয়ে স্বরূপ দামোদর এমনও বুঝেছিলেন কি যে, ঐ পদ্যাবলী গ্রন্থটি তো তাঁর ঢের পরে সংগৃহীত হ'লেও, পণ্ডিতরা তা মেনে নেবেন ? অথবা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বা তাঁর নামে যিনি "স্বরূপ দামোদরের কড়চার" অস্তিত্ব জ্ঞাপন ক'রতে চেয়েছেন তিনিই—এমন কাঁচা কাজটি ক'রেছেন ?

ব্যাপারটা খুলে বলি—

"পদ্যাবলী" গ্রন্থটি শ্রীপাদ শ্রীরূপেরই সংগৃহীত। এটিতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাধিপ লক্ষণ সেনের সভাকবি উমাপতি ধর, শ্রুতিধর, ধোয়ী, জয়দেব, শরণদেব এবং লক্ষণ সেনের রচিত অনেক কবিতা আছে। কবিতাগুলি ভগবদ্ ভক্তি উদ্দীপক। নানা ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে পদ্যাবলী ব'লে কোন গ্রন্থের অস্তিত্বই ছিল না। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ঐ সব চমৎকার শ্লোকগুলিকে একত্র করে পদ্যাবলী নাম দিয়ে একটি সংগ্রহ গ্রন্থের বিন্যাস করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য এবং ইতিহাস ভিত্তিক ঐ নামের গ্রন্থটি রায় রামানন্দের সময়ে জন্মগ্রহণই করে নাই, সেই গ্রন্থেরই একটি শ্লোককে উদাহরণ দিয়ে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে "প্রেম ভক্তির" দৃষ্টান্ত দেবেন এ কোন ধরণের সত্য ভাষণ ? তবে বলা যেতে পারে শ্লোকটি প্রাচীন ; কিন্তু এই ধরণের লোকোক্তিমাত্রকে ভিত্তি করে স্বরূপ দামোদরের কড়চার অস্তিত্ব ?

থাক্। তারপর আবার ঐ পদ্যাবলীরই আর একটি শ্লোক দিয়ে (১৪ নম্বর) শ্রীগৌর সুন্দরকে রামানন্দ রায় বললেন—

কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

অর্থাৎ কোনও কারণে, কিংবা কোথাও কৃষ্ণ ভক্তি রসের সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে গিয়েছে যার বুদ্ধি, তেমন বুদ্ধিমানকে পেলেই কিনে নিও। তার মূল্য দিও, সে মূল্য নিজের লালসা। কিন্তু কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে লালসা যে আসবেই এ বিশ্বাস রেখো না। সৎসঙ্গের ফলেই অমন লালসা আসে।

পদ্যাবলীর এই উক্তিটিও পূর্বের মতই "কড়চা" নামক গ্রন্থটির অস্তিত্বকে বিজ্ঞাপিত ক'রেছে? কারণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামীই কি পদ্যাবলীর নাম প্রথম উল্লেখ করেছেন? তখন কিন্তু পদ্যাবলীর জন্ম হয়েছে ঠিকই, তাব'লে রায় রামানন্দের সময় পদ্যাবলী নামে কোনগ্রন্থ জন্ম গ্রহণ করে নাই। তবে শ্লোকটি কার এমন নজীরও স্বরূপ দামোদর নিশ্চয় পান নাই।

রামানন্দের ঐ উক্তির পর শ্রীচৈতন্যদেব ব'ললেন—হ্যাঁ, এও জানা, আরও কিছু বল। তখন, রামানন্দ ব'ললেন—শ্রীকৃষ্ণে দাস্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বস্তু। এই দাস্য ভক্তির সমর্থনে শ্রীভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ৫মে অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রলেন। তারপর যামুনাচার্য্যের স্তোত্ররত্ন থেকেও একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি ক'রে শোনালেন। (খুব বিস্ময়ের কথা স্বরূপ দামোদর তখন উপস্থিত না থেকেও, দীর্ঘকাল পরে তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্যের স্তোত্র রত্নটি বাছাই করে রায় রামানন্দের রেফারেন্স্ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন)।

রায় রামানন্দের ওই উদ্ধৃতি শুনেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'ললেন—ওহে রায়! এও ঠিক, কিন্তু তুমি আরও কিছু বল। তাতে রামানন্দ ব'ললেন—

কৃষ্ণ সখ্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ সাধ্য সার।

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকটি।

ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন॥

এখানের ধারাটি এমন হ'চ্ছে যেন শ্রীরামানন্দ গৌরসুন্দরকে পরীক্ষা ক'রছেন, আর তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'চ্ছেন।

তারপর রায় রামানন্দের আর একটি উক্তিও শুনলেন, তিনি ব'ল্লেন—বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বসাধ্য সার। তার সমর্থনে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোক ও ৯ম অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের উদ্ধৃতি শোনালেন। তাতেও গৌর সুন্দর ব'ললেন—ওহে রামানন্দ—

এও তো উত্তম। কিন্তু আরও এগিয়ে চল।

তখন রায় ব'ল্লেন—"রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার"।

এই প্রেম ভাগবতের ১০।৪৭।৬০ এবং ১০।৩২।২ শ্লোকে সমর্থিত।

তবে সেই কৃষ্ণকান্তা প্রেমের প্রাপ্তির উপায় অনেক। সবের মধ্যেই তারতম্য আছে।

"কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয়"॥

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যবৎ শ্রোতা, আর গুরুবৎ বক্তা রায় রামানন্দ। (

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে জানা যায়,এসব তথ্য তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকেই পেয়েছেন। শ্রীকবিরাজের কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ নেই তাতে। অতএব ভক্তবৃন্দও মনে করেন স্বরূপ দামোদর তাঁর প্রিয়তম গৌর সুন্দরকে এমনি ক'রে শিষ্যের আসনে বসিয়েছেন এবং গুরুর আসনে রামানন্দকে বসিয়ে ভাব নেত্রে সেই সব উক্তি প্রত্যুক্তিই ক'রছেন, তা দেখেছেন এবং শুনেছেন কিংবা শ্রীগৌর রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার দীর্ঘ দিন পরে, এমনি ক'রে স্বরূপ দামোদরকে ব'লেছেন—। অথবা রায় রামানন্দই বলেছিলেন, পরে স্বরূপ দামোদরকে।

রায় রামানন্দ আবার ব'ল্লেন—

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম॥

অর্থাৎ নিরপেক্ষ হ'য়ে বিচার ক'রলে ভাবের বা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের তর তম বুঝতে পারবে।

এই পংক্তি দু'টি কি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর মত বিজ্ঞ পণ্ডিতের লেখা? নাকি রায় রামানন্দের বলা? নাকি স্বরূপ দামোদরের মত বিজ্ঞের লেখা কড়চা নামক পুঁথি থেকে পাওয়া?

'ভাব' শব্দটির অর্থ কম্ সে কম ৪০ প্রকার অর্থ।

দার্শনিক, রসিক, বৈয়াকরণ, বিজ্ঞানী, নাট্যকার, পদার্থবিদ, ও ভক্ত প্রত্যেকেই ভাব শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ক'রেছেন, এখানে নিশ্চয়, যে কোনও একটি অর্থ-ই গ্রহণীয়, সেটি হোলো মনের বিকারের নাম 'ভাব' এই অর্থ-ই গ্রাহ্য হবে, তা হ'লে মনের বিকারও হবে, অথচ নিরপেক্ষ হবে এ কি রকম যুক্তি?

যদি বলা যায়, একজনের মনের বিকার বা ভাবকে অপর নিরপেক্ষ ব্যক্তি কি বিচার ক'রবে। সে আবার কি? অপেক্ষাও নেই, আবার মানস বিকার ছাড়া ভাবের অস্তিত্বও নেই, তা হ'লে নিরপেক্ষ অথচ ভাব, এরকম মানসিকতার উদয় এক কালে অথবা ভিন্ন কালে হয় কি?

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ যে কোনটীতেই ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য মনের ক্রিয়াবোধ, তাই হয় বিষয় জন্য জ্ঞান, আর তাতেই অপেক্ষা এবং তাতে জন্যজনকতা থাকবেই, সে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা থাকবে কি প্রক্রিয়ায় এবং কার?

এ রকম দুর্নিগ্রহবাচ্যতা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তি ব'লে কে চালালেন তা বোঝা মুস্কিল।

যাই হোক, ধরে নিতে হয় রায় রামানন্দ তাই ব'ল্লেন— ব'লে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর লিখিত উক্তিতে জনমান্যতা র'য়েছে।

কিন্তু এই উক্তিটী শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর-ই যোজনা? না রায় রামানন্দের? অথবা রূপ দামোদরের লিখিত কোনও কড়চায় ছিল?

এক্ষেত্রে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ এই যে, রামানন্দের ওই উক্তিটি সমর্থন করার জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হ'য়েছে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে—

যথোত্তর মসৌ স্বাদ বিশেষোল্লাস ময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বিভাসতে ক্বাপি কস্যচিৎ॥

অর্থাৎ—পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য বিশিষ্ট হ'লেও বাসনা ভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ রুচিকর হয়।

পণ্ডিতগণ, অনুগ্রহ ক'রে বিবেচনা করে দেখুন, শ্লোকটি কিন্তু ভক্তি রসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাব লহরীতে ৫।২১ এ।

ও গ্রন্থটি শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত। আর তার রচনার কাল তো পূর্বেই দেখিয়েছি রসামৃত সিন্ধু ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ।

তা হ'লে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন হোলো ১৫১১ খৃষ্টাব্দে, এবং তিনি বা স্বরূপ দামোদর উল্লেখ করছেন ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের তৈরী গ্রন্থের শ্লোক?

তা হ'লে এই অংশটি রামানন্দ মিলন অংশটি কার রচনা? শ্রীকবিরাজ গোস্বামীরই কি? অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্তকের?

আরও প্রমাণ দেখিয়ে ব'লতে পারি, রায় রামানন্দ মিলনটিই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব রচনা, কিন্তু তা অপ্রামাণ্য হবে জেনেই, তাকে চাপা দিতে এবং সেই পূর্তকের কীর্তিটিকে ঢাকা দিয়ে ওটি যে রায় রামানন্দের উক্তি এবং তা স্বরূপ দামোদরের কড়চায় লেখা ছিল, এইরকম ছাপ যাতে থেকে যায়; কিন্তু এটি ঐতিহাসিক সত্য যে ঐ প্রকার ব্যাখ্যা সত্যই নয়। হয়তো প্রক্ষেপ বা পরবর্তি কালের এটি রচনা, কারণ, এমন ভাষার প্রয়োজন যে কথাগুলি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দের উক্তি বলে চালান হ'য়েছে, সেই কথাগুলির একটু এদিক ওদিক ক'রে চরিতামৃতের আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব'লেছেন শ্রীকবিরাজ—অথচ সেই আদিলীলাটিতো কড়চ থেকে নেওয়া নয়, একথা তো কবিরাজ গোস্বামী নিজেই স্বীকার ক'রেছেন—

(১। আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৩৭ পয়ার থেকে—

এই মত ভক্ত ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর শৃঙ্গার।
চারিভাবের চতুর্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাব লহর্য্যাং—৫।২১
যথোত্তরমসৌ স্বাদ বিশেষোল্লাসময্যপি।'

০ ০ ০ ০

এর পরের পয়ারগুলির বক্তব্য ও সমর্থক শ্লোকগুলি ঠিক ঐ ভাবেই রায় রামানন্দে

উক্তি বলে বিবৃত হ'য়েছে।

এর উদ্দেশ্য কি তা পরে পরিষ্কার ক'রে জানাচ্ছি—

আবার রামানন্দ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

শ্রীগৌরসুন্দরকে রামানন্দ আরও ব'ললেন—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য় ॥

ইত্যাদি ক্রমে আরও কয়েকটি পয়ার রচনার দ্বারা বেদান্তের পঞ্চদশী গ্রন্থের পঞ্চী-করণটি রূপান্তরিত ক'রে [দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরৈ-র্দ্বিতীয়াংশৈঃ যোজয়েৎ পঞ্চ পঞ্চধা ॥] (ভক্তিভাবের নব পদ্ধতিতে) তাকেই সমর্থন ক'রতে শ্রীভাগবতের ১০।৮২।৪৪ শ্লোক এবং গীতার ৪।১১ শ্লোক [যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে···] এদুটির ভাবার্থকে বসান হ'য়েছে।

রায় রামানন্দের মুখে ভাগবত, গীতা ও ভক্তিরসামৃত (যদিও শেষেরটি তখনও রচিত হয় নাই) সিন্ধুর প্রমাণ প্রয়োগ সহ যখন কান্তাপ্রেমের মাধুর্য এবং সেই মাধুর্যের চরম প্রকাশ ব্রজদেবীদেরই সঙ্গে বেড়ে ওঠে ব'লে শুনলেন শ্রীগৌর সুন্দর, তখন আবার প্রশ্ন ক'রলেন—ওহে রামানন্দ ! আরও আগে যদি কিছু থাকে বল।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয় [চৈঃ চঃ ৮।৭৩]

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের উক্তিটি এইভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে যে, আলঙ্কারিক পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের মধ্যে শৃঙ্গার বা মধুর রসের যে চরম প্রকাশ নায়ক-নায়িকার মধ্যে, অর্থাৎ কান্তা প্রেমের মধ্যে ; সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁরা ধ'রে নেন, যে, কান্তা প্রেমে আলম্বন, উদ্দীপনাটি নায়ক-নায়িকার পটভূমিকায় অপরিহার্য।

কিন্তু সেই কান্তা প্রেম কি স্বকীয়া অথবা পরকীয়া অথবা সাধারণী কান্তায় প্রকাশ পায় ?

এমনি গূঢ়োক্তি রেখেই শ্রীচৈতন্যদেবকে দীনতা বনাম অজ্ঞতার আসনে ব'সিয়ে কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য কি ? এই প্রশ্নময় কৌতূহলটি ব্যাখ্যা করার জন্য, রায় রামানন্দকে বিস্ময়াবিষ্ট গুরুর আসনে বসান হ'য়েছে। অর্থাৎ—

স্বরূপ দামোদরের বাংলা ভাষায় রচিত (সত্যই কি তখন ঐ ধরণের বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল ?) কড়চাটিতে যেমনটি লেখা ছিল শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী অবিকল তাই উদ্ধৃত ক'রে ব'ললেন ? রামানন্দের উক্তি—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥

এখানে খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ব্রজরমণীগণের কৃষ্ণপ্রেমের কথা শ্রীভাগবত-গ্রন্থের দশম স্কন্ধের প্রসিদ্ধ আখ্যান, এবং শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরী, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ অবদান, সেটি শ্রীচৈতন্যেরও বহুপূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল, এবং ভাগবতীয় কৃষ্ণপ্রেমের সেই ভাবধারাটি ভারত তথা বাঙলায় অন্তত খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর আগে থেকেই

প্রবাহিত হয়েছিল ; কিন্তু সেই মহান্ কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ এতদিন একটুও জানতেন না ? তাই কি শ্রীগৌরাঙ্গও না জানি না শুনি ভাব দেখালেন এবং রায় রামানন্দও তেমনি বিস্মিত হ'য়ে উত্তর দিলেন ?

স্বরূপ দামোদরের বাংলা ভাষায় রচিত (?) সেই কড়চাটিতে এমন ক'রে ব্রজদেবী-বৃন্দের পরকীয় প্রেমের মাধুর্য্য প্রকাশের জন্য যে রীতি অবলম্বিত হ'য়েছিল, সেটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর মত পরম বিজ্ঞ বৈষ্ণব সেই রীতিটিই অবলম্বন ক'রে আরাধ্য পুরুষ ভগবান গৌরসুন্দরকে দৈন্যার্ত্তঅজ্ঞ বলে চিত্রিত করার মধ্যে এমন কি স্বাদ পেলেন ? এই কি বৈষ্ণবীয় দৈন্যের রীতি ?

তিনি যে স্বাদ পেলেন, তা হলো এই যে, কান্তাপ্রেমেই শৃঙ্গার রসের চরম বিকাশ সেই কান্তা যদি পরকীয়া হয়, তাতে আরও মাধুর্য্য হয়। সভ্য ভাগবত সমাজে সে প্রেমের প্রচার কি খুব ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় নয় ? কিন্তু ঈশ্বরে ও তাঁর নিত্য পরিকরে নিত্য লীলায় যেটি প্রকটিত, সেটি পবিত্র ও অপ্রাকৃত। এবং সেই পবিত্র ও অপ্রাকৃত পরকীয় কান্তা প্রেমের মধ্যেও আবার ব্রজরমণীগণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

সেই সীমার মধ্যে একটি বিশেষ কেন্দ্র আছে। যে কেন্দ্রের নাম শ্রীরাধা। শ্রীরাধা পরকীয়া কান্তা। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তায় যে প্রেমের মাধুর্য বিকশিত হয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সেই রাধাতেই চরম বিকাশ।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনন্যনিষ্ঠ প্রেমটিকে জ্ঞাপন ক'রতে গেলে, ঠিক প্রাকৃত জগতের পরকীয়া কান্তার সঙ্গে পরকীয় কান্তের তুলনা দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান এটিও রাখতে হবে, আবার তাঁকে প্রাকৃত শঠ লম্পট, মায়াবী ও পরকীয়া কান্তায় প্রেমিক এটিও দেখাতে হবে, আর যে প্রেমের পবিত্র স্বরূপ বাংলার বৈষ্ণব সাধক ভক্তদের উপাস্য বস্তু।

এক্ষেত্রে আরও সমস্যা, শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান এই ভাগবতীয় প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য নিরপেক্ষতার পূর্ণ মূর্তি, এটি রক্ষা ক'রতে ব্রজের পরকীয়া কান্তাগণের প্রতিও যে শ্রীকৃষ্ণের সমদৃষ্টি আছে, অথচ পরকীয়া কান্তার যে বিশেষ কেন্দ্র আছে, যেটি শ্রীরাধা সেটিও রাখতে হবে। তার জন্য যোগমায়া বা শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তির প্রভাবে রাসমণ্ডলী নামক ব্রজরমণীগণের বিশেষ নৃত্যের আসরে, প্রতিটি রমণী যখন দেখছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের কাছে কাছেই থেকে তাঁদের সঙ্গে নৃত্য ক'রছেন, আবার শ্রীরাধার কাছেও আছেন ঐশ্বর্য শক্তির প্রভাবে।

ওইখানেই শ্রীরাধার ভ্রম উৎপন্ন হ'য়েছে। তিনি প্রতিটি রমণীর পাশে শ্রীকৃষ্ণকে যখন দেখছেন, তখনই ভ্রম হ'য়েছে তাঁর, তার পরই নিজের কাছেও দেখছেন, ওতেই হ'য়েছে তাঁর অসূয়া বা ঈর্ষা, তার থেকেই মান হোলো তাঁর। অমনি সেই নৃত্যের আসর থেকে সরে গেলেন তিনি, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাচ্ছেন না বিরহে কাতর হ'চ্ছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কামবানের আঘাতেও জর্জরিত হয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতার মধ্যেও শ্রীরাধার প্রতি বিশেষ অপেক্ষা আছে, এই রূপটী ফোটান হয়েছে, তাতেই বোঝান হ'চ্ছে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের খুব বেশী প্রণয়। অন্য কোন পরকীয়া কান্তা ব্রজগোপীই শ্রীরাধার কাছে অত প্রেয়সী নন।

এইভাবে শ্রীরাধানিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিশেষ মাধুর্য দেখানর ক্ষেত্রটিই শ্রীচৈতন্যের শ্রোতব্য এবং রায় রামানন্দের বিস্ময় বোধের বক্তব্য। এইটিই স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে নেওয়া ব'লে শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের পাঠক যেন গ্রহণ করেন।

এই চিত্রটি প্রকাশ ক'রতে শ্রীকবিরাজের উক্তিতে যেরীতি অবলম্বিত হ'য়েছে, তাতে শ্রীগৌরাঙ্গ যেন ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিজ্ঞ হ'য়েও অজ্ঞ ছিলেন, তাঁর সেটি দীনতা-বশেই, অর্থাৎ যেন তিনি অজ্ঞ ছিলেন, এমনটি লোকে যেন বোঝে।

ভারী অদ্ভুত লাগে এইভাবে বাচন প্রকাশনের ভঙ্গী দেখে। কেননা এই গূঢ়োক্তিটি প্রকাশ ক'রতে. রায় রামানন্দর বক্তব্যকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের এক একটি শ্লোকের প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপিত ক'রেছেন, আর সেই শ্লোকের ভাষ্যও ক'রেছেন রায় রামানন্দ। আর ক'রেছেন পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক, যে শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতের ৪৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত ক'রেছেন।

রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের দীনতা বুঝতে পারেন নাই। রসজ্ঞানে ত'ার অজ্ঞতাই হয়েছে মনে ক'রেছেন। এমনি অবস্থাটি প্রকাশ ক'রেছেন 'কড়চাকার'? তাতে স্বরূপ দামোদর সুখীই হয়েছেন? অথবা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর এটি হার্দ্য? তাই তিনিই সুখী হয়েছেন? অথবা কবিরাজ গোস্বামীর ছদ্মবেশে কোনও সহজিয়া রসিক লেখক সুখী হ'য়েছেন, সে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ ক'রলেই ধরা যাবে।

রামানন্দ রায় ব'ললেন—

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।

তা যাই হোক্ শুনুন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥
কি কি শাস্ত্রে বাখানি?

পদ্ম পুরাণের একটি শ্লোক (যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ……) এখানে বিষ্ণুরই প্রিয়া রাধা, একথা ব'লা হ'য়েছে। (গৌড়ের বৈষ্ণব মতবাদে শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম, আর বিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি ত'ার অংশাবতার)।

আর একটি শাস্ত্র শ্রীভাগবত (১০।৩০।২৮)। এই ভাগবতে রাধার নাম না থাকলেও রামানন্দ ব'লছেন রাসের মাঝে যে রমণী মান ক'রে চলে গিয়েছিলেন, এবং যাঁকে খুঁজ্‌তে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন, তিনিই শ্রীরাধা, তাই রামানন্দ রায় ব'ল্লেন—

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের তুলনা॥
গোপী-গণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।

তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত কৃষ্ণ বিলাপের প্রমাণ দিলেন জয়দেবের গীত গোবিন্দের ৩।১।২ শ্লোকটি। রায় ব'ল্লেন—

ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।
শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপণ॥

রাধার গুণ শুনেই শ্রীচৈতন্য ব'ললেন—হ্যাঁ, আমার আশা পূর্ণ হ'য়েছে, এই রসতত্ত্ব জানতেই তোমার কাছে আসা।

প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমাস্থানে
সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥

তাছাড়া আরও জানলাম সেব্য কি? এবার সাধ্য কি তাই বল; তবে আরও কিছু শুনতে চাই। সেটি হোলো কৃষ্ণের স্বরূপ কি? রাধার স্বরূপ কি? রস কোন তত্ত্ব? প্রেম কোন্ তত্ত্ব? রায়! তুমি কৃপা করে এই তত্ত্বগুলি বল।

তাতে রায় বল্লেন—এসব আমি কীই বা জানি! তবে তুমি আমায় যা বলাও তাই বলি, তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত বস্তুই আমি পুনঃ পাঠ করছি মাত্র। এতো শুক পাখীর পাঠ বলা হবে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তোমার নাট্য বোঝে কে? তুমি হৃদয়ে প্রেরণ ক'রছো আমি প্রেরিত হ'য়ে তাই বলছি, ভালমন্দ কি হ'চ্ছে জানি না।

এর উত্তরে শ্রীচৈতন্য ব'ল্লেন, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী' ভক্তিতত্ত্ব জানি না। সার্বভৌমের সঙ্গে আমার মন নির্মল হোলো, কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ব'ল্লেন আমি জানি না। ওসব জানে রায় রামানন্দ, তাই তোমার কাছে এলাম। আর তুমি আমাকে স্তব স্তুতি ক'রে বঞ্চনা ক'রছো?

এই সব শুনে রায় রামানন্দের মন চঞ্চল হোলো। তারপর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণের স্বরূপ, (বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন) এবং এটিকে জানাতে ব্রহ্ম সংহিতার একটি শ্লোককে উপস্থাপিত করেছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

এখানেও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়েছেন কড়চা লেখক অথবা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী। কারণ, যখন রায় রামানন্দের সঙ্গে গৌর সুন্দরের এমনি আলাপন হ'চ্ছিল, তখনও তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে "ব্রহ্ম সংহিতা" গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন নাই। তার দীর্ঘ দিন পরে সেটি সংগ্রহ ক'রে, ওই দেশেই তা লিখিয়ে এনে ছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থটিও ওই সময়।) এ সংবাদ এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ৯ম পরিচ্ছেদে বলা হ'য়েছে।

অর্থাৎ মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের রায় রামানন্দ সংবাদের সার সংগ্রহ যা, তার প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি তখনও উদ্ভূত, বা রচিত বা সংগৃহীত হয় নাই।

এর ফলে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীপাদকে সেই ছদ্মবেশী সহজিয়া রসিক লেখকটি কালগত অনুচিত দোষে দুষ্ট ক'রেছেন।

এমনি ঘটিয়েছেন ১২৩ সংখ্যক পয়ারকে প্রামাণ্য ক'রতে উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে। অর্থাৎ রায় বলেছেন—

"প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ রাধা চন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতা কথনে—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈ রতি বরীয়সী॥

আবার সেই প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাকে বিদিত ক'রতে ব্রহ্ম সংহিতার ৫।৩৭ শ্লোকের উদ্ধৃতি, এতেও কাল অনুচিত দোষে দুষ্ট হ'য়েছেন; এবং সবচেয়ে বিচিত্র হ'য়েছে শ্রীরাধার গুণ গরিমার প্রকাশনের উদ্ধৃতি দিয়ে; রায় রামানন্দ বলেছেন—

সেই শ্রীরাধা

কৃষ্ণকে করায় শ্যামরসমধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥
তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে—১১।১২২
কা কৃষ্ণস্য প্রণয় জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপম গুণা রাধিকৈকানচান্যা।
জৈম্হ্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বংকুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছা পূর্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকানচান্যা॥

এইখানেও…সেই কালনৌচিত্য দোষ; কারণ—রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে, আর গোবিন্দ লীলামৃত রচিত হ'য়েছে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তা হলে কে বসালে রামানন্দের মুখে উক্ত শ্লোক? কে বসালে ব্রহ্মসংহিতা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক?

ঠিক ওই ভাবেই আবার পরবর্তী পয়ারের প্রামাণ্য স্থাপন ক'রতে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর শ্লোকের বসতি। তার দক্ষিণ বিভাগের ১।২৪ শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রেছেন। এ গ্রন্থও ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে রচিত।

এরপর কবিরাজ গোস্বামীর নামে সেই সহজিয়া রসিক লেখকটি তার আসল বক্তব্যের পথে অগ্রসর হ'য়েছেন অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে তিনি ব'ললেন—

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ রাধা প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব॥

তার উত্তরে—

রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর ললিত
নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত॥

প্রমাণ? ওই যে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগ।

তারপর—

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর॥
যেবা 'প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত' এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥
পহিল হি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
ইত্যাদি......

রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটকে বিন্যস্ত সেই শ্লোকটি শুন্‌তে শুন্‌তেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর মুখে হাত চাপা দিলেন।

প্রেমের বিলাস বিবর্ত্ত অবস্থাটির পরিণতিই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরুপণের ভিত্তি।

এই ভাবে দুই লীলার (আদি ও মধ্য লীলার) দুটি পরিচ্ছেদে একই বিষয়কে ভাষার পরিবর্তন সাধন করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কার (?) ব'লেছেন এ সব কথা আমার নয়, এসব স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে পাওয়া।

ভারী চমৎকার লাগে, শ্রীচরিতামৃতের যে যে স্থানটি বৌদ্ধ সহজিয়াদের (সৌত্রান্তিক দর্শন ভিত্তিক) সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল হয়, ঠিক সেই সেই স্থানটুকুই মহাকবি কর্ণপুরের গ্রন্থে নাই এবং শ্রীমুরারির গ্রন্থেও নাই, আর শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থেও নাই। কিন্তু যে যে স্থানে ওসব আছে, সেইগুলিকে অনুবাদ ক'রেও শ্রীকবিরাজের নামে বলান হ'য়েছে, এসব পাওয়া গিয়েছে "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" থেকে—কার্য্যত দেখা যাচ্ছে প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি কর্ণপুরকে অনুসরণ ক'রেই, কিন্তু তা তো লেখেন নি। লিখেছেন কড়চা থেকে পাওয়া, কিন্তু তিনি যে অনুবাদ ক'রেছেন তার নমুনা দিই—

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ মিলন লীলা করিল, প্রচারে ॥

চৈঃ চঃ ২।৮।২৬

কিন্তু কার্য্যতঃ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্টই ধারণা ক'রতে হয়, মহাকবি কর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের ৭ম অঙ্কের বিষয়টিরই অনুবাদ শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে পরিস্ফুট। সেখানে প্রথম যখন দেখা হোলো রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ব'ললেন—অয়ে ত্বমেব রামানন্দোঽসি রামানন্দ। সাশ্রু নয়নে ভগবানের চরণকমলদ্বয়ে পতিত হ'য়ে সবিনয়ে জানালেন আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীগৌর ব'ললেন, ওহে! সার্ব্বভৌমের অনুরোধে তোমায়, দেখবো ব'লে এখানে একটু ব'সেছি (গোদাবরী নদীর তীরে) কিন্তু তুমি নিজেই এসে প'ড়েছো, ভাল করেছো, যাক্, কিছু বলতো।

রামানন্দ কিন্তু পূর্ব্বে কিছুই শোনেন নি ইনি কে, এঁর রূপ কেমন, এঁর প্রভাব কত, এঁর আশয় কি, তবুও শ্রীগৌরের এমনি স্বাভাবিক আকর্ষণ যে, যেন চির পরিচিত বন্ধুর মতই ব'লে যেতে লাগলেন। প্রথমে রামানন্দ একটি বৈরাগ্যসূচক শ্লোক ব'ললেন। তাতে শ্রীগৌরসুন্দর ব'ললেন, আচ্ছা, আচ্ছা', কিন্তু এতো বাহ্য, বলতো বিদ্যা কাকে ব'লে? (বাহ্যমেতৎ, কা বিদ্যা ?')

রামানন্দ—হরিভক্তিরেব, ন পুনর্বেদাদি নিষ্ণাতভা,
চরিতামৃতে অনুবাদ—

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥

নাটকের গৌর—কীর্তিঃ কা?
নাটকের রামানন্দ—ভগবৎপরঃ অয়মিতি যা খ্যাতি ন দানাদিজা।
চৈঃ চঃ...অনু—কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি ॥

নাটকের গৌর—কা শ্রীঃ?
" রামানন্দ—তৎ প্রিয়তা, ন বৈ ধনজনগ্রামদিভূয়িষ্ঠতা।
চৈঃ চঃ অনু—সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥

নাটকের গৌর—কিং দুঃখম্—
" রামানন্দ—ভগবৎ প্রিয়স্য বিরহো, নো হৃদ্‌ব্রণাদি ব্যথা,
চৈঃ চঃ অনু—দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥

নাটকের গৌর—ভদ্রম্, কে মুক্তাঃ
" রামানন্দ—প্রত্যাসক্তি হরিচরণয়োঃ, সানুরাগে ন রাগে।
প্রীতিঃ, প্রেমাতি শর্মিনি হরের্ভক্তির্যোগে ন যোগে।
আস্থা তস্য প্রণয় রভস স্তোপদেহে ন দেহে।
যেষাং নূনং প্রকৃতি সরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীগৌর ব'ললেন, ভাল, বলতো মুক্ত কে?

রামানন্দ বললেন—কৃষ্ণানুরাগী জনের কাছে যাঁরা অবস্থান করেন, কিন্তু অন্যের প্রতি লুব্ধ নন, এবং বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি যোগে যাঁদের প্রীতি, কিন্তু যোগের প্রতি নয়, এবং প্রণয় যোগ্য সিদ্ধ দেহের প্রতি যাঁদের আস্থা, কিন্তু দেহের প্রতি নয়, এবং হরিনাম শ্রবণে যাঁদের হৃদয় গ'লে যায়, তাঁরাই মুক্ত, অন্যভাবে মুক্ত যাঁরা, তাঁরা মুক্ত নন।

এইটিকে সংক্ষেপে অনুবাদ করেছেন শ্রীকবিরাজ

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার, সেই মুক্ত শিরোমণি ॥

আবার নাটকের গৌর—ভবতু, কিংগেয়ং?
" " " রামানন্দঃ—ব্রজ-কেলিকর্ম—
" " " গৌরঃ—কিমিহ শ্রেয়ঃ?
" " " রামানন্দ—সত্যং সংগতিঃ

শ্রীকবিরাজের অনুবাদ—
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয় নাহি আর ॥
নাটকের গৌর—কিং স্মর্ত্তব্যম্ ?
„ রামানন্দ—অঘারি নাম
শ্রীকবিরাজের অনুবাদ—কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ ।
নাটকের গৌর—কিমনুধ্যেয়ম্ ?
„ রামানন্দ—মুরারেঃ পদম্
শ্রীকবিরাজের অনুবাদ—ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান ?
রাধা কৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥
নাটকের গৌর—ক স্থেয়ং
„ রামানন্দ—ব্রজ এব
শ্রীকবিরাজের অনুবাদ—সর্বত্যাগী জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস্ ?
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলারাস ॥

এখানে শ্রীকর্ণপূর ব'ললেন—ব্রজে বাসই জীবের কর্ত্তব্য, শ্রীকবিরাজ তার সঙ্গে পূর্ণ ক'রলেন বা জুড়ে দিলেন সেই ব্রজভূমি মানে যেখানে লীলারাস হয়। ব্রজভূমিতে কি শুধু রাসলীলারই ভূমি ? দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের কোন লীলা হয়নি ? শুধু শৃঙ্গার বা মধুর রসের ?

কবিরাজ ব'লেছেন এর পরে
স্বরূপ গোঁসাই আর রঘুনাথ দাস ।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥
সেই কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা কর্ত্তা রহে দূর দেশে ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন ।
সংক্ষেপে, বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকড়চা, রঘুনাথ বৃত্তিকার ।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকাকার ॥ চৈঃ চঃ ৩।১৪।৬-৭

কিন্তু অদ্যাবধি কেউ দেখাতে পারবেন না, যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বাংলা ভাষায় শ্রীগৌর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন, এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে রসের কথার মিলনটুকু যে লিখেছিলেন, তার একটুকু ইঙ্গিত কি তিনি কোথাও দিয়েছেন ? শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ তাঁর সংস্কৃত ভাষায় লেখা স্তবাবলীতে শ্রীচৈতন্যাষ্টক এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা "শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে" বারটি শ্লোক ছাড়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা চরিত্র বর্ণনা ক'রে অন্য কিছুই লেখেন নাই।

আর স্বরূপ দামোদরও বাঙলা ভাষায় যদি কিছু লিখতেন তবে শ্রীরঘুনাথ অবশ্যই

তার উল্লেখ ক'রতেন। কারণ "স্বরূপের রঘুনাথ" এ গৌরব তাঁর ছাড়া আর কারোর ভাগ্যে ঘটে নাই।

তাহ'লে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর উক্তির আকর কোথায়? যাতে ওই রসের কথার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে? আর কোথায় শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ববাদ প্রকাশ ক'রতে অমন ধরণের পরামর্শ? যেখানে শ্রীরাধা, কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্'লাদিনীশক্তিরস্মাৎ" এই ভক্তি সিদ্ধান্ত-বিরোধী শ্লোকটি? অর্থাৎ এমনভাবে দুইটি আত্মা এক। আবার দুটি আত্মা ভিন্ন, আবার দুটি দেহ এক, আবার দুটি দেহ ভিন্ন, এমন ধরণের উক্তি বা সিদ্ধান্ত কোথায় ক'রেছেন ষড়গোস্বামীবৃন্দ? তবে কি ওই ধরণের সিদ্ধান্ত করার জন্যই রামানন্দের সঙ্গে অমন রসের প্রসঙ্গ তুলেছেন শ্রীকবিরাজ? যার ফলে পয়ার লিখেছেন···

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

সর্বজনমান্য স্বরূপ দামোদরের এই যদি গৌরতত্ত্বের এবং লীলাবাদের সমন্বয় সিদ্ধান্ত হ'তো, তা'হলে ষড়গোস্বামী কি তা পরিত্যাগ ক'রতে পারতেন?

আর মহাকবি কর্ণপুরই বা করেন কি করে? স্বরূপ দামোদরের পরম প্রীতিভাজন ছিলেন কর্ণপুর। একথা তো কবিরাজ গোস্বামী নিজেই লিখেছেন।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের রামানন্দ মিলনে ওই যে "এহ বাহ্য ব'লে ব'লে শ্রীগৌরের উক্তি, তাও তো কর্ণপুরের মহাকাব্যেই পাওয়া যায়, তাতে তো চরিতামৃতের মত "বিবর্ত বিলাস" প্রেমের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু চরিতামৃতের প্রেম সম্পর্কের যে প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তা কিন্তু রামানন্দের লিখিত জগন্নাথবল্লভ নাটকেরই বিষয়বস্তু।

যিনি কবিরাজ গোস্বামীর নামে রামানন্দ মিলন বলে যে রস প্রসঙ্গটি লিখেছেন, সেটি কর্ণপুরের মহাকাব্যের তথ্যকে পাশ কাটিয়েই এক নূতন অতিরিক্ত বিষয়কে জুড়েছেন, এবং তা কাল অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট ক'রে, আর ঢের পরে রচিত গ্রন্থাবলীর শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে প্রামান্য করেছেন। ওটি কাঁচা হাতেই জুড়েছেন তিনি, এবং তা গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার বদলে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণনা মূলক ভাব-রাজিই জগন্নাথ বল্লভ নাটকের বিষয়বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা মূলক ভাবটিকে শ্রীচৈতন্যের জীবনেও বেশ খাটান যায় মনে করেই, তিনি ওই কর্মটি সাধন ক'রেছেন; তারপর সেই উৎকণ্ঠাময় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হ'লেন তখন দুটি দেহ প্রেমে গ'লে মিলিত হ'য়ে এক হ'য়ে গেল, কোনটি পুরুষ কোনটি রমণী তা আর চেনাই গেল না।

এই ভাবটি প্রকাশ ক'রেছেন রায় রামানন্দ তাঁর জগন্নাথবল্লভ নাটকের ৫ম অঙ্কের ২৪ শ্লোকে

রাধা মাধব কেলি ভরাদহমদ্ভুতমাকলয়ামি।
মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদম্।
বিরম শরাত্তগকীলিত মিলিতমিব সখি গলিত চিরন্তনখেদম্॥

নখর রদাবলি খণ্ডিতমপি গুরু নিশ্বসিতায়ত ভীতম্।
রুদ্র গজাধিপমুদমাতনুতাং রামানন্দ রায় সুগীতম্ ॥

অর্থাৎ দুই তনুর মিলন হ'য়ে গেল, কিছুমাত্র ভেদ রইলো না, প্রেমে গলে মিশে এক হ'য়ে গেল। এর থেকে আর অদ্ভুত কি হ'তে পারে। অদ্ভুত! অদ্ভুত। সে মিলন আর ভাঙলো না। দুটি বস্তুকে মদন এক করে দিলে। যদিও তাদের নখরের দশনের ক্ষতে উভয়তনু ক্ষত-বিক্ষত হ'য়েছিল, প্রবল শ্বাস ব'য়েছিল, কিন্তু মদনের অশিথিল একীকরণে উভয় তনুর চিরন্তন খেদ দূরে চলে গেল।" রামানন্দের এই গান প্রতাপ রুদ্রের আনন্দ বর্ধন করুক।

এই ভাবধারাটির সমর্থনে রামানন্দের "পহিল হি রাগ নয়ন ভঙ্গিম ভেল" কবিতাটির দ্বারা পূর্বরূপ থেকে সম্ভোগ এবং বসোদ্গার ক্রীড়া শ্রান্তি-জনিত রসালাপ প্রভৃতির সম্পূর্ণ করে রাধা কৃষ্ণের দ্বৈতাদ্বৈত রূপে মিলন বর্ণনা। এই ভাবধারাটির মধ্যে ঐভাবে অদ্বৈত মিলনটুকুই সহজিয়া পন্থীদের খুব আস্বাদ্য হ'য়ে আছে। ওটির ভিত্তি জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদ-পদাবলীতেও উল্লেখিত। এটির আকর "ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে" পাওয়া যায়। একথার সাক্ষ্য দিয়েছি এই গ্রন্থের প্রথম দিকে ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

অল্প পূর্বেই দেখালাম কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের কোন্ অংশটি (রায় রামানন্দ মিলন) অনূদিত হ'য়েছে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে। এবার দেখাচ্ছি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যের যে অংশটি অবিকল অনূদিত হ'য়েছে। মহাকাব্যের ১৩।৩৮।৪৭ শ্লোকের নিরূপিত বর্ণনায় দেখা যায়।

যে সময় গৌরসুন্দরের কাছে রায় রামানন্দ এসে পরিচিত হ'লেন, সে সেই সময়ই শ্রীগৌর ব'ললেন—ওহে রামানন্দ! কিছু ভাল কথা শোনাও; ভাল কবিতা বল।

উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্নু ধীরং
সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি।
তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ
পপাঠ বৈরাগ্য রসাঢ্য পদ্যম্।

রামানন্দ বৈরাগ্য উদ্দীপক কবিতা প'ড়লেন—

বৈরাগ্যং চেৎ জনয়তি তরাং পাপমেবাস্তু যস্মাৎ
সান্দ্রং রাগং জনয়তি নচেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ।
বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং
রাগেণ স্ত্রী জঠরকুহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণেঽপি ॥

ইতীদমাকর্ণ্য স গৌরচন্দ্রো
বাহ্যাতিবাহ্যং য়ত বাহ্যমেতৎ।
ইতিস্ফুরদ্রাগ বিভবোথতাপোদ্—
গমাত্ত কৃৎস্নাতিমুদং প্রপেদে।

বৈরাগ্যের মহিমা শুনে শ্রীগৌর ব'ললেন—এহ বাহ্য, এহ বাহ্য, আর একটু এগিয়ে

বল। রামানন্দ বললেন—

ততশ্চ সংশুদ্ধমতিঃ স রামানন্দো মহানন্দ পরিপ্লুতাঙ্গঃ
পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমেকান্ত কান্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্॥

বৈরাগ্যসূচক কবিতার পর ভক্তিপ্রতিপাদক কবিতা পড়লেন, সে কবিতা তাঁরই রচিত, এবং যা পদাবলী গ্রন্থে পরে গ্রন্থিত।

নানোপচারকৃত পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্নু ভক্ষ্য পেয়ে॥

এ শ্লোকটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ মিলনে উদ্ধৃত ক'রেছেন। কিন্তু বলেননি ওই শ্লোক রামানন্দের রচিত।

তারপর তাঁর ওই কবিতা শুনে শ্রীগৌর বললেন—এহ বাহ্য, এহ বাহ্য, আরও বল—তখন রামানন্দ ব'ললেন, শুধু ব'ললেনই না, মাথায় দীর্ঘ কেশ দিয়ে শ্রীগৌরের দুটি চরণকে বেষ্টিত ক'রে ভূমিতে প্রণাম ক'রলেন, আনন্দে অধীর হ'য়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা-জ্ঞাপক নিজের রচিত কবিতা পাঠ ক'রলেন।

সেই কবিতাটি হোলো—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁ করি মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥
অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেল দূতী॥
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

রামানন্দের সেই কবিতাটি শুনেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রলেন; তখন তিনি ভাবপ্রেমে উন্মত্তই হ'য়েছিলেন।

ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎ পরংস
প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণ পদ্মযুগ্মঃ।
প্রেম প্রভাব প্রচলান্তরাত্মা
গাঢ় প্রমোদোত্তমথালিলিঙ্গ॥

এই হ'ল কর্ণপুরের গ্রন্থে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন।

অপূর্ব বৈরাগ্য ও ভক্তি রসের প্রতিমা নির্মাণ ক'রেছেন কর্ণপুর শ্রীগৌরসুন্দরের।

বিবর্ত-বিলাসের "দু'হু তনু একই হৈল" এমন সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব কিছুমাত্র নেই তাতে।

আর রামানন্দ যেটি "পহিলহি রাগ" ব'লে কবিতা প'ড়লেন, সেটি কর্ণপুর তাঁর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম অঙ্কে ১৫ শ্লোকে ধ'রেছেন। ওখানে শ্রীরাধার মাথুর বিরহের বর্ণনাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকর্ষের বর্ণনা করা হ'য়েছে।

সেই বর্ণনা শুনতে শুনতেই শ্রীগৌরসুন্দর বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন কিন্তু যখনই শুনলেন শ্রীরাধা বলছেন হায়! এখন তুমি ভর্তা, আমি ভার্য্যা এমনি বিসদৃশ বুদ্ধি নিয়ে এখনও বেঁচে আছি এর চেয়ে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

এইভাবে বর্ণনার মধ্যে, মাঝখানে গৌরাঙ্গসুন্দর রামানন্দের মুখে হাতচাপা দিলেন। হাত-চাপা দেওয়াটি কবিরাজ গোস্বামীও উল্লেখ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন কর্ণপুর তা ক'রেন নাই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য অন্য ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

তিনি ব'লেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ যে রামানন্দের মুখে "পহিলগি রাগ" গানটি শুনেই তাঁর মুখে হাত চাপা দিলেন—তার অর্থ হোলো "শ্রীরাধার নিরুপাধি প্রেম কপটতা সহ ক'রতে পারে না। এই অর্থই রামানন্দের গানে পাওয়া যাচ্ছে অনুভব ক'রেও ওটিতে আবার কপটতার সাড়া পাওয়া যায়, তাই আর কিছু বলতে বারণ ক'রেছেন।

কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের পরিবেশন ভঙ্গীতে ওটি এমন হ'য়েছে যে, ভক্ত সাধকগণ ধ'রেই নিয়েছেন, ওই তো রাই কানুর 'বিবর্ত বিলাসের' অভিন্ন মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের তত্ত্বকথার পূর্বাভাস।

এবার বলি রায় রামানন্দের ঐ পহিলহি রাগ গানটিকে কর্ণপূর কিভাবে পরিবেশন ক'রেছেন তাঁর নাটক গ্রন্থের ৭ম অঙ্কে—

রামানন্দ—চরণৌ ধৃত্বা [এই স্থানটি মহাকাব্যে আছে সংবেষ্ট্য নাথস্য পাদৌ—

সখি ন স রমণো নাহং রমণী ইতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেণ উভয় মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

অথবা "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ
মনোবৃত্তি লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিঃ
তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্।

এরপর নাটকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য আবার প্রশ্ন ক'রলেন প্রেরিত সেই দূত ব্রাহ্মণকে—ওহে ব্রাহ্মণ! এই শ্লোক শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি ব'ললেন?

[ততো ভগবতা কিমুদিতম্]

বিপ্র ব'ল্লেন—বিষধর সাপ যেমন ফণা তোলা মাত্র সাপুড়ের গান শুনে তৎখুনি স্থির হ'য়ে যায়, তেমনিভাবে অনুরাগের সঙ্গে রামানন্দের গান শুনে বিহ্বল হ'লেন গৌর ভগবান।

আর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের মুখে নিজের হাতটি অর্পণ ক'রে চাপা দিলেন—

(তদা যদবলোকিতং তদাকলয়)

ধৃত ফণইব ভোগী গারুড়ায়স্য গানং

তদুদিত মতি রত্যা কর্ণয়ন্ সাবধানম্
ব্যধিকরণতয়া বা নন্দবৈবশ্যতো বা ॥
প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপ্যধত্ত ॥

নাটকের ভট্টাচার্য্য উক্ত কথা শুনেই যা বুঝলেন, তা প্রতাপরুদ্রের প্রশ্নের অপেক্ষায় ইলেন। প্রতাপরুদ্র তখুনি জিজ্ঞাসা করলেন—

ভট্টাচার্য্য ! কোঽয়ং সন্দর্ভঃ ?

(ভট্চাজ্ মশায় ! একি ব্যাপার ? সারোক্তি কি ?)

ভট্টাচার্য্য ব'ল্লেন—মহারাজ ! সুনির্মল প্রেম কখনই কপটতা সহ্য ক'রতে পারে া। রাধামাধবের বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শোনবা মাত্রই, তাকেই পরম পুরুষার্থ ব'লে নির্ণয় রা হোলো, কিন্তু আবার তারপরেই "অহং কান্তা কান্ত" এই অংশ শুনতেই ভগবান গীরাজ সেটিতে কপটতার আভাস পেলেন। (এখানে সত্যই রস দোষ) তাই ামানন্দের মুখে হাত চাপা দিলেন।

এর পরেই রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পতিত হ'য়ে নিজের দীর্ঘ কেশ কলাপকে দুই াগ ক'রে তাঁর চরণ দুটিকে বেষ্টন ক'রে স্তব ক'রতে লাগলেন—

হে প্রভো রসিক শেখর ! রসময় ! সুমধুর লীলার গুরু ! তুমি আমার হৃদয়নাথ, ামরা ক্ষুদ্র, তোমাকে কি ব'লে স্তব ক'রবো, তোমার বিবিধ ভূমিকা সাহজিক নয় এই সন্ন্যাসীবেশ আমাদিগকে চমৎকৃত ক'রেছে।

মহারসিক শেখরঃ সরস নাট্যলীলা গুরুঃ
স এব হৃদয়েশ্বর স্ত্বমসি কে কিমুত্বাং স্তুমঃ।
তবৈবৈতদপি সাহজং বিবিধ ভূমিকা স্বীকৃতিঃ
ন মে তেন যতি ভূমিকা ভবতি নোঽতি বিস্মাপনী ॥

এই শ্লোকটিকেই অনুশীলন ক'রে সহজ প্রেম, সহজ রস, সহজ রসিকের ব্যাখ্যার আগম হ'য়েছে। আসলে সত্যই রামানন্দ ছিলেন "সহজ রসিক" বৈষ্ণব। তাই তাঁর সহজ স্বভাব বশেই ওই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের স্তুতি ক'রেছেন।

সহজ রসিকদের রসের ব্যাখ্যা এত সূক্ষ্ম ইংগিত করে করে এক অব্যক্ত ধারায় নিয়ে যায় যে, প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিত ছাড়া তা ধ'রতেই পারেন না।

কথাটা খুলে বলি—

এই ভারতে রস সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দুটি ধারায় চ'লে আসছে, একটি বৈদিক, একটি তান্ত্রিক। বৈদিক ধারায় রস্যতে ইতি রসঃ, আর তান্ত্রিক ধারায় 'রসয়তি ইতি রসঃ'।

বৈদিক ধারায় বলা হ'য়েছে—

ব্রহ্মই আনন্দ, ব্রহ্মই আত্মা, ব্রহ্মই রস, ব্রহ্মই ভগবান।

সেই রস স্বরূপ ব্রহ্মকে ঋক্বেদীগণ পঠনীয় রস ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। সামবেদীগণ তরস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যজুর্বেদীগণ অভিনয় রস ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। আর থর্ববেদীগণ শ্রুতি (শ্রবণ জনিত আস্বাদ) অনুশীলনকেই রস ব'ল ব্যাখ্যা করেছেন।

জগ্রাহ পাঠ্য মৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাৎ অভিনয়ং রসমার্থবণাৎ শ্রুতিঃ ॥ ভরত নাট্যশাস্ত্র ১।১৭

চারটি বেদের এই চারটি ধারায় রস অনুশীলন ক'রতে গিয়েই—ভারতে সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

(১) ভরতের নাট্য রসিক সম্প্রদায়।
(২) ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রের আলংকারিক সম্প্রদায়।
(৩) দণ্ডী ও বামনের রীতি সম্প্রদায়।
(৪) কুন্তকের বক্রোক্তি সম্প্রদায়।
(৫) আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তের ধ্বনি সম্প্রদায়।
(৬) ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য সম্প্রদায়।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন ভরতাশ্রয়ী রসিক। (এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিস্তৃত নিবন্ধ লিখেছি খড়দহ থেকে প্রকাশিত 'উজ্জীবন' পত্রিকায় ভারতের ৩৬ জন রসিকের কথা প্রসংগে।)

এই ছ'টি সম্প্রদায়ের মৌলিক দৃষ্টি হোলো চারটি কেন্দ্রে। (১) রসের উৎপত্তি বাদ (২) অনুমিতি বাদ (৩) ভুক্তিবাদ (৪) অভিব্যক্তি বাদ। যারা তান্ত্রিক তাঁরা সহজ রসবাদী, তাঁদের প্রথম বক্তব্য 'রসয়তি ইতি রসঃ'।

তিনি রস রূপেও এবং রসিক রূপেও। যখন তিনি রস, তখন সেটি আস্বাদ্য, যখন তিনি রসিক তখন আস্বাদক। যদি কেউ প্রশ্ন করেন রসিক কি আস্বাদন করেন? তান্ত্রিক সহজ রসিকগণ বলেন লীলা রস।

প্রশ্ন—কার লীলা রস?

উত্তর—আত্মলীলা রস। নিজেকেই তিনি দুইভাগে ভাগ করেন, একটি আস্বাদ্য, একটি আস্বাদক।

কৃষ্ণই হ'লেন লীলা পুরুষোত্তম। যা তন্ত্রে বলে তাই আছে বেদে—"কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্" (গোপাল তাপনী,/পূঃ) দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা এবং অন্তরীক্ষ দৈবতম্ মানে লীলা পরায়ণ। সেই লীলা এক হয় না। পরিকর চাই। তাই আত্মারাম হয়েও, পূর্ণকাম হয়েও, লীলা করার সময় নিজেকেই ভাগ করেন। নিজেকেই দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা অনেকধা ক'রে নিজেকে ভাগ করেন এবং ভোগ করেন। এতেই বুঝতে হয়, তাঁর লীলা পরিকরগণ কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র নন। তাঁরা অংশ বা শক্তি।

এইজন্যই লীলা রসময়ের এক আত্মাকেই দুই ভাগ করে, অথবা বহু ভাগে বিভক্ত করে নিরতই তিনি রমণ ক'রছেন। এই তাঁর নিত্য লীলা। এ লীলা অনাদি কাল থেকে চ'লে আসছে।

লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাই ব'লেছেন "মানুষীং তনুমাশ্রিত্য করোতি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"। (শ্রীভাগবত)

ভাগবতে বর্ণিত সেই ক্রিয়াই তাঁর ক্রীড়া। সেই ক্রীড়াই কাম ক্রীড়া। ও ক্রীড়া অপূর্ণ থাকে, আবার পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। নিজেতে নিজেই রমণ করেন। "বীক্ষ্যরন্তুং মনঃ চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।"

সেই রমণ ক্রিয়া শুনেই লোক তাঁতে—অর্থাৎ আত্মাতে মগ্ন হয়। "যৎ শ্রুত্বা তৎ পরো ভবেৎ"।

তাই না শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই'॥ চৈ চঃ ১৷২৷৬

এই পয়ারেই শ্রীকবিরাজ লিখেছেন যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ তিনি নন্দসুত। যিনি ভগবান তিনি আত্মারাম হ'য়েও নন্দের অপেক্ষা রেখেছেন। সেই অপেক্ষাটি নরতনু ধারণের জন্য।

আবার সেই শচীসুতও তাই। তিনি পূর্ণ কাম হ'য়েও অপূর্ণ কাম। সেই কামই তাঁর লীলা। কবিরাজ গোস্বামী তাই রামানন্দের মুখে বসিয়েছেন—

নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত। চৈঃ চঃ ২৷৮৷১৪৭

এই ভাবে তত্ত্ববিশ্লেষণ যাঁরা করেছেন তাঁরা 'সহজ রসিক' সম্প্রদায়ের মানুষ। এ সম্প্রদায়ে প্রচুর গ্রন্থ। 'বিন্দুপ্রকাশ নামে যে বইটি রসিক পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত, তার দ্বিতীয় প্রকাশের চতুর্থ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে" —

স্বাত্মানমেব প্রকৃতিং পুরুষং বিধায়
বিন্দুর্বিবর্ত্তয়তি যঃ সহজ শ্রয়েণ।
মাধুর্য্য কর্ম রমণায়ক চিত্তমিশ্রং
পশ্যন্ স এব সততং প্রণয়েণ মুগ্ধঃ॥

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আত্মা নিজেকেই পুরুষ এবং নিজেকেই প্রকৃতি রূপে বিবর্ত্তিত করেন। এই-টি তাঁর সহজ ধর্ম। এই ধর্ম প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব কালে তিনি প্রাকৃত রূপের কাছে (অর্থাৎ মাতা পিতার কাছে) বিন্দুরূপে আবির্ভূত হন (শুক্র ও রেতঃ কণারূপে) তাতেই তিনি চিত্ত সৃজন করেন, মাধুর্য্য প্রকাশ করেন, নিজেতে নিজেই ভালবাসায় বাঁধা পড়েন, আবার নিজেই নিজেকে প্রাপ্ত হন।

এই মতবাদ যাঁরা প্রচার করেন বা করেছেন তাঁরা সহজ রসিক। এঁরা সহজধর্মী শৈবরসিক। সহজ বৈষ্ণব রসিক। এবং সহজ শাক্ত রসিক। এঁরা বিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই ব্রহ্মবিবর্ত্তিত বিন্দুর সহজ রসের খেলা চ'লছে বলে অনুভব করেন।

এই সহজ রসিকগণকে বাতুল বা বাউলও বলে, বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ ক'রলে তাঁদিকে বাতুল বা বাউল বৈষ্ণবও বলে, অবধুত বলে, ভগবত পরমহংসও বলে, সুফী, ফকির, সাঁই, দরবেশ, সিদ্ধ, গোঁসাই, যোগী, তান্ত্রিক, সহজিয়া, নাদবন্দী, নাথ প্রভৃতি যে যা বলতে পারেন কিন্তু এঁদের রসতত্ত্বের দর্শন মহকবি আত্মরতিতে, আত্মরমণে, আত্ম-লীলায়। ভাগবত রসিক ব'লেও এঁরা আখ্যায়িত হ'ন। বিংশ শতকের তত্ত্বগবেষক-দের মতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথও এই মতের পোষক।

যাঁরা বৈদিক রসধারায় রস আস্বাদন করেন, তাঁরাও অনেক সময় এঁদের সূক্ষ্ম রস বিচার পদ্ধতির কারিগরি ধ'রতে না পেরে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

সহজ রসিক যাঁরা, তাঁরা কিন্তু শূন্যবাদী নন। তাঁরা ক্ষণিকবাদীও নন। তাঁরা আত্মরতিবাদী, এবং দেহের বর্ত্তমানতায় পঞ্চবিধ ভাবনাবাদী।

এঁদের দার্শনিক মতবাদ 'আর্হ'ত' দর্শনেও প্রতিফলিত হয়, আবার বৌদ্ধদের শূন্য-বাদ, প্রতীত্যসমুৎপত্তিবাদ, এবং বৈশেষিকবাদের সঙ্গেও অনেকটা মিলে যায়। সহজ

রসিকদের মধ্যে যাঁরা দার্শনিকতা নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের প্রামাণ্য তথ্যের উদ্ধৃতি যা, তা আর্হত দর্শনে মেলে ; ওঁরা বলেন—

ভাবনাভির্ভাবিতানি পঞ্চভিঃ পঞ্চধা ক্রমাৎ।
মহাব্রতানি লোকস্য সাধয়ন্ত্যব্যয়ং পদম্ ॥ (আর্হত দর্শন ৩৭ শ্লোক)

আবার গুরুই এঁদের একমাত্র ভরসা, গুরুর উপদেশই আচার, গুরুর অঙ্গীকারই ঈশ্বরের অঙ্গীকার, এই দৃঢ়তাটি সহজ রসিকদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আবার তাঁদের দার্শনিকতাটি মেলে বৌদ্ধ দর্শনের ১৭ গুচ্ছের বক্তব্যে—

"শিষ্যৈ স্তাবদ যোগশ্চাচারশ্চেতি দ্বয়ং
করণীয়ম্। তত্রাপ্রাপ্তস্যার্থস্য প্রাপ্তয়ে
পর্য্যনুযোগো যোগঃ গুরূক্তস্যার্থস্য
অঙ্গীকরণ মাচারঃ, গুরূক্তস্যাঙ্গীকরণা-
দুত্তমাঃ, পর্য্যনুযোগস্য অকরণাৎ অধমাঃ।
ইত্যাদি।

যাক্ এখন প্রসঙ্গে আসা যাক।

রামানন্দ রায় ছিলেন 'সহজ রসিক বৈষ্ণব'। এ সংবাদ পাই মহাকবি কর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের সপ্তম অঙ্কে ৪র্থ শ্লোক থেকে। ওখানে বলা হ'য়েছে—প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজধানী পুরীতে ফিরে এসেই শুনলেন, গৌড়দেশ থেকে একজন মহা প্রতাপশালী পরম কারুণিক সন্ন্যাসী এসেছেন। কিন্তু তাঁর দর্শন তখনওতিনি পান নাই। তাই তাঁর চরণ বন্দনা করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালেন। ভট্টাচার্য্য এলেন। প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা ক'রলেন, সেই গৌড়ের সন্ন্যাসীটি জগন্নাথের স্থান ত্যাগ ক'রে কোথায় গেলেন ? ভট্টাচার্য্য ব'ল-লেন—'মহান ব্যক্তিদের স্বভাবই হোলো, তীর্থ যাত্রার ছলে তীর্থগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করা এবং পবিত্র করা। সেই ছলেই তিনি দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ ক'রতে গিয়েছেন।

প্রতাপরুদ্র—তিনি আবার এখানে আসবেন তো ?

সার্বভৌম—হ্যাঁ আসবেন বৈকি। তাঁর সঙ্গিরা এখানে আছেন।

রাজা—তিনি তাহলে একাই গিয়েছেন ?

সার্বভৌম—না না, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক জন ব্রাহ্মণকে পাঠিয়েছি। কিন্তু তাঁরা গোদাবরী পর্যন্ত যাবেন। আর ভগবান সেতুবন্ধ তক্ যাবেন।

রাজা—কেন তাঁদিকেও সেতুবন্ধ পর্যন্ত পাঠালেন না ?

সার্বভৌম—হ্যাঁ, কিন্তু ভগবানের অনুমতি ছিল না, তিনি রামানন্দের অনুরোধে ঐ গোদাবরী পর্যন্তই সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

রাজা—রামানন্দের কি অনুরোধ ? (কস্তাবৎ তস্য অনুরোধঃ ?)

সার্বভৌমঃ—তিনি যখন রওনা হন, সেই সময় আমি ব'লেছিলাম, গোদাবরী তীরে রামানন্দ আছেন, আপনি তাঁকে অনুগ্রহ ক'রবেন। "গোদাবরী তীরে রামানন্দো বর্ত্ততে সোহবশ্যমেব অনুগ্রাহ্যঃ")

রাজা—এমন সৌভাগ্য তাঁর হোলো কি ক'রে ? (কথং তস্যেদং সৌভাগ্যম্ ?)

ভট্টাচার্য্য—মহারাজ ! রামানন্দ একজন 'সহজ বৈষ্ণব', পূর্বে আমরা তাঁকে কত ঠাট্টা তামাসা ক'রেছি। কিন্তু সম্প্রতি ভগবানের কৃপার উদয় হওয়াতে তাঁর মহিমা জান্‌তে পেরেছি (সখলু সহজবৈষ্ণবো ভবতি। পূর্বং অয়ং অস্মাকং উপহাসপাত্রং আসীৎ, সম্প্রতি ভগবদ্ অনুগ্রহে জাতে তৎ-মহিমজ্ঞতা নো জাতা)

এতে পরিষ্কার বোঝা গেল, রামানন্দ রায় সহজসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তৎকালের পণ্ডিত সমাজে সেই সহজ বৈষ্ণবরা উপহাসের ব্যক্তি ব'লেই পরিচিত হ'তেন।

এখন দেখা যাক, সেই সহজ বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের পরিচয় তাঁর কাজের দ্বারা কিভাবে পাওয়া যায়। আর সেই কাজ শ্রীগৌর সুন্দরের অনুমোদিত হয়েছিল কি না !

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পরিচয়ের আগেই তিনি একখানি সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচনা করেন। নাম "জগন্নাথ বল্লভ নাটকম" ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানিয়েছেন শ্রীগৌরসুন্দর রামানন্দের সেই নাটক খানির বিষয়বস্তু তৃপ্তির সঙ্গে শুনতেন। নাটকের শব্দলালিত্য, ভাবমাধুর্য্য, এবং অলংকারের প্রয়োগগুলি খুব উচ্চস্তরের।

সেই নাটকটি লিখেছিলেন উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রীতি উৎপাদনের জন্য। তাই নাটকের প্রায় অনেক গানের অন্তে প্রতাপরুদ্রের নাম উল্লেখ করা আছে এবং রামানন্দ নিজেকে রসিক বলেও পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের রচনা ভঙ্গীতে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রসিকবৃন্দ খুব আনন্দ পান। রামানন্দের সময়ে শ্রীসম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের দল দাক্ষিণাত্যে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছিলেন।

কিন্তু তাঁদিকে "সহজ বৈষ্ণব" বলে খ্যাত করেন নি কেউ। সার্বভৌমের কাছে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয় তো অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু যেসব সম্প্রদায়ে রামানন্দ রায়ের নাম চিহ্নিত হয় নাই। নিশ্চয় বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল রায়ের। যার জন্য প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করেন নি সার্ব্বভৌম। কিন্তু চিহ্নিত ক'রেছেন "সহজ বৈষ্ণব" বলেই।

সহজ রসিক বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ে জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামানন্দ রায়ের নাম পঠিত হয়। এদের রচিত বহু পদ-পদাবলি নিয়েই বাংলায় কীর্তনীয়ার দল গঠিত হয়। এ সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রমণী সংযোগে সাধন-ভজন, উপাসনা, কাব্যরচনা, কাব্যাস্বাদ গ্রহণ। এ সম্প্রদায়ে বৌদ্ধবাদ, অহর্তবাদ, তন্ত্রবাদ, ভাগবত বাদ, শ্রৌতচিন্তার অদ্বয় সংশয়বাদ প্রভৃতির সম্মেলন দেখা যায়। তাঁদের প্রত্যেকেরই রচনায় "রসিক" শব্দটি কিংবা রস শব্দটীও চিহ্নিত করা থাকবে। তার সঙ্গে আত্মিক দর্শনে অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তও জড়িত থাকবে।

রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

১ম অঙ্ক – ৪র্থ শ্লোক

...গজপতি প্রতাপরুদ্র হৃদয়ানুগতমহুদিনম্, সরসং রচয়তি রামানন্দ রায় ইতি চারু।

১ম অঙ্ক—২৮ শ্লোক

রামানন্দ রায় কবি রচিতং রসিকজনং সুবিধানম্।

২য় অঙ্কে—২০ শ্লোকে—

গজপতি রুদ্র মনোহরমহরহরিদং অনু রসিক সমাজম্।
রামানন্দ রায় কবিভণিতং বিহরতু হরিপদ ভাজম্॥

২য় অঙ্কে ৩৫ শ্লোকে—

গজপতি রুদ্র মুদে মধুসূদন বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥

৫ম অঙ্কে ৫০ শ্লোকে—

রামানন্দ রায় কবি ভণিতং বিলসতি রসিকজনেষু।

৫ম অঙ্কে ৩৫ শ্লোকে—

গজপতি রুদ্র নরাধিপ বিদিতে
রসিক জনৈর্হিত তোষে।
রামানন্দ রায় কবি ভণিতে
হৃদয়ং কুরুতে বিদোষে॥

এই সব নজির দেখেই বোঝা যায়, বৈদিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়া আর একটি সম্প্রদায় ছিল, যার নাম রসিক সম্প্রদায়।

শ্রীভাগবত গ্রন্থেও রসিকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।—ভাঃ ১।

রামানন্দ রায়ের সহজিয়া রসিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তকেই শুদ্ধাভক্তি সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বলে প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে রায় রামানন্দের কথোপকথনও সেই প্রসঙ্গে একটি পয়ারও ঢুকে পড়েছে—

রায় কহে "কহ সহজ প্রেমের" লক্ষণ।
রূপ গোঁসাই কহে সাহজিক প্রেমধর্ম॥

ওখানেও কাল অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট ক'রে বিদগ্ধ মাধবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হ'য়েছে। কিন্তু ওসময় বিদগ্ধ মাধবের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তখনও নাটকটি পূর্ণ হয় নাই এবং স্বরূপ দামোদর কড়চায় বা ডাইরিতে তা উল্লেখিত হবার সময়ও হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জবানীতে যে ওই (নিক্ষিপ্ত) করা পয়ারটি পাওয়া গেল, তাতে তো মনে করার শঙ্কাই এনে দেয় যে, হয়তো শ্রীরূপ গোস্বামীও সহজিয়া রসিক বৈষ্ণব ছিলেন? প্রবাদও তাই।

কিন্তু ওটি যে পরে নিক্ষপ্ত পয়ার, তা তো রামানন্দ রায়ের জীবন চর্য্যা ও শ্রীরূপের জীবন চর্য্যা এবং শ্রীগৌরসুন্দর যে রামানন্দের জন্য যা অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন তা থেকেই বোঝা যাবে ওটি পরে নিক্ষিপ্ত। রায় রামানন্দ সহজ রসিক বা সহজিয়া রসিক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন; শ্রীরূপ তা মোটেই নন। শ্রীরূপ কঠোর বৈরাগ্যবান, আদর্শ তপস্বী পুরুষও বৈদিক বৈষ্ণবধর্মের আচারসম্পূর্ণ একটি মনোরম বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্মের শাখার পুনরুজ্জীবক এবং শ্রীগৌরসুন্দরের মনোমুকুর। রামানন্দ ঠিক উল্টো।

রামানন্দ রায়ের সহজ রসিক জীবনের পরিচয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৫ম পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়। "প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে এক সরল ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন

কৃষ্ণকথা শুনতে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে, শ্রীগৌরসুন্দর জানতেন রায় রামানন্দের জীবনচর্য্যা। তবুও পাঠিয়েছিলেন কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য পোষণ করে। [অবশ্য চরিতামৃতের পরিবেশনের ভঙ্গীতেই এটি প্রকাশিত] প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের কাছে সেদিন কৃষ্ণকথা শুনতে পাননি। রামানন্দের বাড়ির অন্দরের বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেছিলেন। সেই সময়টায় রামানন্দের সেবকের কাছে যা-শুনেছিলেন, মিশ্র সেকথা গৌরাঙ্গকে এসে বলেন। সেদিন উঠে আসার আগে অল্পক্ষণের জন্য রামানন্দের সঙ্গে মিশ্রের দেখা হয়েছিল, তবে সেদিন এমনি সাধারণ পরিচয় মাত্র হয়েছিল। কোন প্রশ্ন করেন নি মিশ্র।

কিন্তু সেদিন তাঁর সেবকের কাছে যা সংগ্রহ করেছিলেন—

"রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল।
দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী।
তাঁহা দোহে লইয়া রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীত শিখায় নর্তনে ॥

এরপর মিশ্র নিজেই হয়তো দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন—

রামানন্দ রায় সেই দুইজন লইয়া।
স্বহস্তে করেন তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন ॥
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জন।
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ মণ্ডন ॥

এই ব্যাপারে চরিতামৃতকারের মন্তব্য—

তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে রায়ের তৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব।

আরও গভীরভাবে চরিতামৃতকারের মন্তব্য—

সেবা বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ।

এই মন্তব্য করার ভিতর দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সমকালীন ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে নানা আচার থাকলেও, এবং তাঁদের যে সেই সব আচারের মধ্যেও অপার মহিমা লুকান আছে, সে সম্বন্ধে চরিতামৃত-কার মন্তব্য ক'রে ব'লেছেন—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেমসীমা ॥ ইত্যাদি

তারপর প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমন সংবাদ পেয়ে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলেন বৈঠকখানায় অথবা যে ঘরে পাঁচজনের আসরে বিনীত রামানন্দ ছিলেন, তিনি জানালেন, আমার অপরাধ নেবেন না। বলুন কি আদেশ? আজ ধন্য হ'লাম আপনার আগমনে। ইত্যাদি পূর্ব আলাপের পরও সেদিন মিশ্র ফিরে এলেন। কিন্তু তার পরে সেই রামানন্দের ওইসব ব্যাপার স্যাপার জানালেন শ্রীগৌরাঙ্গকে। তাতে শ্রীচৈতন্য ব'ললেন—

শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিল।

আমি ও সন্ন্যাসী আপনি বিরক্ত করি মানি।
দর্শন তো দূরে থাক প্রকৃতি নাম যদি শুনি।
তবঁহি বিকার পায় মোর তনুমন॥
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?

এই পর্যন্ত বলেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব রায় রামানন্দের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য ব'লেছিলেন সে সম্বন্ধে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নয় আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী॥
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ॥
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম॥
আশ্চর্য, তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীগৌরাঙ্গের মত পুরুষরত্নের মুখে ওই ধরণের খোলাখুলি কথা বসানর আগে, প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরই কথার পুনরুক্তি এবং অভব্য জনোচিত বাক্ চিত্রের দ্বারা গৌর প্রতিমা গড়ার জন্য স্বরূপ দামোদরের কড়চাটিকে হস্তগত করেছিলেন, এ কেমন কথা? বিশুদ্ধ সাধু বৈষ্ণবের উপাসনা রাজ্যে একেও কি এক প্রামাণ্য দলিল ব'লতে হবে?

তারপর সেই কড়চাটিতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যা পেয়েছেন তাকেও গৌরের উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥

গৌরের কি স্বরূপ? অপ্রাকৃত কাকে বলে জানতেন না? এক্ষেত্রে ভারি অদ্ভুত লাগে স্বরূপ দামোদরের কড়চায় এই উক্তিগুলিকে পয়ারে বসালেন শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি ব'লে? শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মত ব্যক্তি সাগ্রহে তাই পরিবেশন ক'রেছেন; সহজিয়া রসিক ভক্তের দেহকে অপ্রাকৃত বলে শ্রীগৌরাঙ্গ বর্ণনা ক'রে আবার তাকেই শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে ব'লেছেন—

তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টি করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজ-বধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥

হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ* ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়।
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি হয়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরমণীগণের সঙ্গে বিলাসাদি ক'রে যে যে লীলা ক'রেছেন, সেই সেই লীলার কথা শ্রবণ করলে যেমন হৃদ্‌রোগ কাম আশু দূর হয়, তেমনি এই রামানন্দ রায়ের দেবদাসীগণের গুহ্য অঙ্গ সেবার কথা শুনলেও হৃদয়ের কাম রোগ দূর হয়। তবে রায় রামানন্দের তুলনা রামরায়ই।

এই ব'লেই তিনি শ্রীভাগবতের ১০/৩৩/৩৯ শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি ॥

রসিক ভক্তরা এইজন্যই বোধ হয় বলেন "নরতনু তাঁহার স্বরূপ।" অর্থাৎ রাগানুগা-মার্গে রামানন্দ রায়ের মত রমণী সংসর্গে থেকেও ভজন সাধন করতে পারলে তিনি সিদ্ধ-দেহ হন, তাঁর মন আর প্রাকৃত থাকে না। এই রকম অপ্রাকৃত তনু জয়দেবেরও ছিল. তাই "দেহিপদপল্লবমুদারম্"। এই জন্যই যা লিখে গিয়েছিলেন জয়দেব, তাঁর সেই অসমাপ্ত রচনাকে পূর্ণ ক'রেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এইজন্যই"রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়" ব'লে রসিক সম্প্রদায় ঘোষণা করেন শ্রীচণ্ডীদাসেরাও অপ্রাকৃত মনের বাণীকে। ওঁরা জীবন্তেই মৃত ছিলেন? এইখানে কবিরাজ গোস্বামীর আরও লেখা ছিল, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে মনে করলে দোষ কোথায়? অর্থাৎ ওই যে কৃষ্ণের রাস ক্রীড়ার প্রায় অবসান যখন হয় হয় তার পূর্ব মুহূর্তে—

বাহু প্রসার পরিরম্ভকরাল কৌরানিবি স্তনালম্ভন নর্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষেল্যাবলোক হসিতে ব্রজ সুন্দরীণাং উত্তম্ভয়ন রতিপতিংরময়াঞ্চকার।।

১০।২৯।৪৬।

এই জীবন্মুক্ত বা জীবন্মৃত অপ্রাকৃত দেহ মনের অধিকারী ছিলেন রায় রামানন্দ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মত দিব্যজীবন পুরুষও বল্লেন?

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব? কহন না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পরিবেশিত স্বরূপ দামোদরের কড়চায় রমণী সংসর্গে থেকে রাগমার্গে রায় রামানন্দের ভজন উপাখ্যানটি আর যোগাচারী বৌদ্ধ সহজিয়াদের এবং বজ্রযানী, কাল চক্রযানী, নাথ সম্প্রদায়,ঔঘর সম্প্রদায়ের "উত্তর-সাধিকা" নিয়ে উপাসনার সঙ্গে কতখানি প্রভেদ, তা কাউকে বুঝতেও দেননি।

---

* সত্ত্ব, রজ, তম।

এইভাবে রাগমার্গে অবস্থিত রায় রামানন্দেরই সিদ্ধান্ত রাই কানুর বিলাসের চরম অবস্থায় দুটি দেহ মদন অনলে গলে গিয়ে মিশে গিয়ে এক হয়ে গেল, সে এক অপূর্ব রূপ প্রকটিত হোলো।

রাধামাধব কেলিভয়াৎ অহমন্তুতমাকলয়ামি ॥
মিলিতমিদং কিল তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চনভেদম্।
বিষম শরাশুগা কীলিতমিব সখি গলিত চিরন্তন খেদম্ ॥

[এর অনুবাদ পূর্ব্বেই দিয়েছি] জগন্নাথ বল্লভ ৫/২৪

এই রাগমার্গে অবস্থিত সহজ রসিক (সহজিয়া) রায় রামানন্দের কাছেই শ্রীগৌর-সুন্দর ব'লেছিলেন—

মোর তত্ত্বলীলা রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৮

অতএব শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পরিবেশনের ভঙ্গীতে পরিষ্কার বোঝা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় সৃষ্টি ক'রে যে শ্লোকটি আদিলীলায় বিন্যস্ত করা হ'য়েছে, সেটি শ্রীগৌরাঙ্গের 'অনুমোদিত এবং রায় রামানন্দ কর্তৃক সিদ্ধান্তিত এবং স্বরূপ দামোদর কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিলিখিত এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ কতৃ'ক পরিবেশিত ?

যাঁরা রাগমার্গের এক বিশেষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ রমণী সম্পর্ক হ'য়েও নির্বিকার চিত্তে রায় রামানন্দের মত সহজিয়া রসিক হ'য়ে ভজন করেন, তাঁরাই শ্রীগৌরাঙ্গের ঐ তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় বাদটি আস্বাদন ক'রবেন। তাঁরাই শ্রীগৌরাঙ্গকে উপায় বা আশ্রয় ভাববেন এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম সেবাকেই উপেয় ব'লে মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করবেন যে, স্বরূপ দামোদরই তাঁর পরম আদরের যে গৌরসুন্দর, যিনি প্রকৃতি বা রমণীর নাম শুনলেও চিত্ত বিকারের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন, তা হোন, কিন্তু রাগমার্গে অবস্থিত সহজিয়া বৈষ্ণব যে রায় রামানন্দ, এবং তিনি যে সুন্দরী তরুণীর গুহ্য অঙ্গ সেবা করেও নির্বিকারচিত্তে অপ্রাকৃত দেহ নিয়ে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সাধনা ক'রেছিলেন, সেইটি-কেই আদর্শ করতে হবে এবং তাঁরই নির্দ্ধারিত শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ববাদটি গ্রহণ ক'রতে হবে, আর তাঁরই প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব ও লীলাবাদটিই যে স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই সত্য, আর তাই শ্রীকবিরাজ—

রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার স্বরূপই তো শ্রীরাধা, এবং তিনিই তো শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁরা এক আত্মা হ'য়েও দেহভেদে দুটি ভাগে অবস্থান ক'রেছিলেন। আবার সেই দু'টি দেহ এক হ'য়ে শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হ'য়েছেন। সেই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনুবাদ—

রাধা, কৃষ্ণ, এক আত্মা দুটি দেহ ধরি।
অনন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই॥

রায় রামানন্দ সিদ্ধান্তিত, চিরকালের অদৃষ্ট, অশ্রুত সেই তত্ত্বটিই স্বরূপ দামো-রের কড়চায় বিধৃত এবং সেই তত্ত্বটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে, ও অনূদিত হয়েছে; এই ধরণের শ্রীচৈতন্যবন্দনাটি দ্বারা বিশ্বের প্রাণ ভারতের লোক সংস্কৃতির জীবন তথা বাংলার অমিয় পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপটি হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর তা অস্তিত্বই নাই, ও তো সহজিয়া বৈষ্ণব রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি শ্লোকে উদিত রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব—

মিলিতমিদং তনুযুগলং পুনরপি ন কঞ্চন ভেদম্।

এই তত্ত্ব জানাতেই কি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতির মত দার্শনিক ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের উজ্জীবক সেই ষড় গোস্বামীর শ্রীগৌর আরাধনা? এই কি শ্রীগৌরের স্বরূপ তত্ত্ববাদ? এইভাবে যা মূলতঃ নাস্তি সেই শ্রীগৌরই কি ভারতে অবহেলিত, অত্যাচারিত, বিধর্মীগণ পীড়িত হতভাগ্য মানব শ্রেণীর উন্নেতা? এই গৌরেরই কি নাম গেয়ে গেয়ে বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধ'রে "হা গৌর" ব'লে পতিতের পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস কেউ করবে? না দাঁড়াবে? তবে যে শ্রীরূপ গোস্বামী বল্লেন—

'দেহ দেহি বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ'

লঘুভাগবতামৃত। পূর্ব। ৯ম অঙ্ক

আর শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও তো একবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের ঐ সিদ্ধান্তকে অনুবাদ করতে করতে বঙ্গদেশীয় বিপ্রের প্রসঙ্গে ব'লেছেন—

আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

তাছাড়া মধ্যলীলায় ১৭দশ পরিচ্ছেদেও ব'লেছেন—

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ॥

তাহলে রাধাকৃষ্ণের দেহ ভেদ, আত্মা অভেদ এসব উৎকট সিদ্ধান্ত কার?

এই সব যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখা যায় যে, সহজিয়া রসিক সম্প্রদায়ের কোন লোক "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" নামক একটি স্ব-কল্পিত দলিল খাড়া করার অন্তরালে বজ্রযান সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের অভিন্নতা খাড়া করতে বিশ্ববন্দিত বৈষ্ণব গুরু শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনীতে সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটির প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে, সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের পতাকা পুঁতেছেন এবং বৈদিক আচার সংবলিত বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ প্রবর্তিত বাংলার পবিত্র ও

অভিনব বৈষ্ণব ধর্মটির অন্তঃস্থলে একটি কীলক পুঁতেছেন।

আর ঈশ্বরের স্বরূপকে গৌণ করে তার তত্ত্বকে মুখ্য করেছেন। এবং অপৌরুষে বেদবাদ প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের স্বরূপকে গৌণ করে "বিশ্বাস" নামক এক প্রকার মান প্রক্রিয়ার তত্ত্ববাদকে মুখ্য করে. বৌদ্ধতান্ত্রিক মানস সংস্কারের তত্ত্ববাদকে মুখ্য করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যই স্থাপন করেছেন।

এইজন্যই কি কবিরাজ গোস্বামীর নামে তিনি মন্তব্য করেছেন—

চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর। চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম।

সহজিয়াদের, এই মতবাদটি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কিছু পরেই সংযোজিত। এই সব অংশ বিদূরিত করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন গৌরাংগের চরিত্র সংবলিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের পুনর্লিখনের প্রয়োজন এসেছে। যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে।
দরিদ্র, পতিত, মূর্খ, ভাসাব প্রেমসুখে॥"

যিনি সবার তরে কাঙাল সেই গৌরাংগের মর্মসংগী কি এই সহজিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিক রায় রামানন্দ ?

(প্রক্ষিপ্তাংশ)

বিতর্কিত হ'লেও চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠতম ভাষাকবি শ্রীকৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনাটি যেমন বাংলার সাহিত্য ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা দখল ক'রে আছে, তেমনি রয়েছে বাংলার অন্যতম বৈষ্ণব মহাকবি গোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্যের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত বলে প্রচারিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।"

এ গ্রন্থের রচনা পারিপাট্য ভাবে, রসে, অলংকারে এবং সুষ্ঠু শব্দচয়নে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি পরিপুষ্ট হ'য়ে আছে তৎকালীন বাংলায় সমুদ্ভূত অভিনব প্রকৃতির সমুজ্জ্বল বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক চিন্তাধারায়। অপর ভাষায় বলা যায়, বাঙ্গালীর হৃদয়ভাবে মজ্জন ক'রে যে যুগন্ধর পুরুষ যুগল শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হ'য়েছিল, তাঁদেরই আচরণ তাঁদেরই বিশ্বজনীন প্রেমাবদানের সংবাদ সম্পর্কে মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যা কিছু সংগ্রহ ক'রেছিলেন সেই সবেরই মঞ্জুষা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এ গ্রন্থটির সংকলন আরম্ভ করেন ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্ত করেন ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রন্থ রচনার স্থান শ্রীবৃন্দাবন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই সাক্ষ্য দিয়াছেন—

(১) প্রভু আজ্ঞা হইল বৃন্দাবনে যাইবার।
(২) সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥ চৈঃ। চঃ। আদি ৫ম।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন, তখন শ্রীগোবিন্দের বিশাল ন্দির নির্মিত হ'য়ে গিয়েছে এবং সে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের রাজোচিত সেবা ারও প্রচলন করা হ'য়েছে।

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শ্রীগোবিন্দ দেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলংকার॥
সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥ চৈঃ। চঃ। আদি। ৮ম।

এই পয়ারগুলিতে দুটি কথা লক্ষ্য করার মত। একটি হোলো, তখন শ্রীগোবিন্দের ান্দিরটি নির্মিত হ'য়েছে, দ্বিতীয়টি হোলো শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের পাশে শ্রীরাধিকা বিগ্রহের উপস্থিতি হয় নাই। প্রাচীন শ্রীবিগ্রহটি সেই জয়পুর রাজের আলয়ে আছেন, সেখানে শ্রীমতী শ্রীরাধার বিগ্রহ নাই।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের এই মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে। এ সংবাদটি জানা যায় ঐ শ্রীমন্দিরের প্রস্তর ফলক থেকেই। মহারাজ মানসিংহের তত্ত্বাবধানে ঐ ময়েই ঐ বিখ্যাত মন্দিরটি স্থাপিত হয়। ওই সময়টি হোলো বাদশাহ আকবরের ৩৪ বৎসর রাজ্যকালের আরম্ভে বা শেষে।

সেই সময়েই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী আদিষ্ট হন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করার জন্য। সে আদেশটি আসে তৎকালীন শ্রীবৃন্দাবনের অধিবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছ থেকে এবং বিশেষ ক'রে শ্রীগোবিন্দের পূজারী সেবকদের কাছ থেকে।

কেন আদেশ ক'রেছিলেন তাঁরা, সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন—

তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥
চৈঃ। চঃ। আঃ। ৮ম।

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র ও লীলার স্মরণ যাঁরা ক'রতেন, তাঁরা শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকবি কর্ণপুর এবং শ্রীবৃন্দাবন দাসের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে। কিন্তু সে সব গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের নীলাচল লীলার বিস্তৃত তথ্য ও কাহিনী নাই অথচ সেই নীলাচলে অবস্থানের লীলাটিই তাঁর শেষ লীলা।

আর যত বৃন্দাবন বাসী ভক্তগণ।
শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥

তাই তাঁরা = মোরে আজ্ঞা করিলে সভে করুণা করিয়া।
সেইজন্যই = তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥

এঁদের আজ্ঞা পেয়ে শ্রীকবিরাজ বেশ চিন্তিত হ'য়েছেন, কেমন করে এ গ্রন্থ তিনি লিখবেন। কিন্তু অচিরেই হৃদয়ে প্রেরণা পেয়ে গেলেন এবং শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন বা শ্রীমদনগোপাল মন্দিরে, শ্রীবিগ্রহেরই ইঙ্গিত করুণা লাভ ক'রতে।

শ্রীকবিরাজ আরও পরিষ্কার ক'রে বলেছেন—যাঁরা যাঁরা এ গ্রন্থ রচনা করতে আদেশ ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবার অধ্যক্ষ -- শ্রীহরিদাস পণ্ডিত। এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হোলো, ইনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নাতি শিষ্য। অর্থাৎ শ্রীগদাধরের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। তাঁরই শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি গোবিন্দ গোস্বামী। এঁর পরিচয়—ইনি কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য।

তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীযাদবাচার্য্য। এঁর পরিচয়—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্যালক এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাছাড়া অন্যান্য কয়েকজন—

তাঁরা হলেন ঐ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী তাঁর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস (ইনি শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের অন্যতম সেবক ছিলেন) এঁর খ্যাতি পূজারী গোস্বামী। ইনিই শ্রীজয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ নামক একখানি খণ্ডকাব্যের টীকাকার। এঁর টীকাটি পূজারী গোস্বামীর 'বালতোষিণী' নামে খ্যাত। এঁর অপর একটি টীকা 'সুবোধিনী' নামে যেটি প্রচারিত, সেটি অন্য খণ্ডকাব্য "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" নামে গ্রন্থের ওপর।

এঁর সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানকার ৺হরিদাস দাসের এবং প্রাচীন প্রবাদে প্রচার যে পূজারী গোস্বামীর বা শ্রীচৈতন্য দাসের অপর একটি ব্যক্তি নাম ছিল 'আউল মনোহর দাস'। ইনি সহজিয়া মতবাদের পোষক ছিলেন এবং সুদীর্ঘ জীবন-আয়ু লাভ ক'রেছিলেন। এঁর দ্বারাই নাকি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পরকীয়াবাদের প্রবেশ ঘটেছে এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের দ্বারা তা সমর্থিত হ'য়ে বর্ত্তমান শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থটি প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ সম্বন্ধে এই সন্দর্ভে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হ'য়েছে।

আর যাঁরা, তাঁরা হ'লেন, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী। প্রেমিক কৃষ্ণদাস। আর শ্রীপাদ শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী। চৈঃ চঃ আদি ৮ম

এঁদেরই আদেশ বা আজ্ঞা লাভ ক'রে শ্রীকবিরাজ গিয়েছিলেন—শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে। সেখানের শ্রীবিগ্রহের সেবা করতেন তখন গোঁসাই দাস।

যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার জন্য সেখানে শ্রীবিগ্রহের কাছে মনে মনে প্রার্থনা ক'রছিলেন, তখনই শ্রীবিগ্রহের কণ্ঠ থেকে একখানি মালা খ'সে পড়ে ভূমিতে। এইভাবে হঠাৎ মালাটি খসে পড়ার ভিতর দিয়েই শ্রীকবিরাজ মনে ক'রলেন শ্রীবিগ্রহের আজ্ঞা পেলাম। আর সেই আকস্মিক ঘটনাটি দেখেই সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ উল্লাস ক'রতে ক'রতে হরিধ্বনি ক'রলেন, এবং পূজারী গোস্বামীও সেই মালাটি কুড়িয়ে এনে শ্রীকবিরাজের গলায় পরিয়ে দিলেন।

মদন গোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥
দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোঁসাই দাস পূজারী করেন চরণ সেবন ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোঁসাই দাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥
আজ্ঞা পাইয়া মোর হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ চৈঃ চঃ। আদি ৮ম।

অতএব এইভাবে [illegible] কথার [illegible] দিয়েই এ গ্রন্থটি লেখার আদেশটি শুধু বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদেরই নয়, শ্রীমদনমোহনেরও আদেশ। তার আজ্ঞাটিকে সর্ব্বাগ্রগণ্য ক'রে শ্রীকবিরাজের দৃঢ় ধারণা যে [illegible] এ গ্রন্থ শ্রীমদন মোহনেরই লেখান। এতে আমি লিখি এটা নয়।

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন।
আমার লেখন যেন শুকের পঠন ॥
সেই লিখি মদন গোপাল যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ চৈঃ চঃ। আদি ৮ম।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পয়ারের এইসব স্তবকের দ্বারা বোঝা গেল, এই গ্রন্থ রচনার সময় গৌড়ের বৈষ্ণব আচার্য্যদের কেউই প্রকট ছিলেন না বা জীবিত ছিলেন না। (এই সংগে যদি কোন পাঠক বলেন, নানাস্থানে গালিগালাজের উক্তিও তাহলে মদনমোহনের)।

এ কথা আরও পরিষ্কার ভাবে জানা যায়, আরও কতকগুলি পয়ারের দ্বারা। যে সব পয়ারের মাধ্যমে স্পষ্ট উক্তি ক'রেছেন যে, সেইসব আচার্য্যের স্মরণ ক'রেই শ্রীকবিরাজ এই গ্রন্থ রচনার বলও সঞ্চয় ক'রেছেন। কারণ, তখন সকলেই ছিলেন তাঁর স্মরণীয় পুরুষ। এরই দ্বারা বোঝালেন যে একই পয়ারে জীবিত ও লোকান্তরিত পুরুষের স্মরণ তো কেউ করে না। ওটা ব্যবহার সিদ্ধও নয়, ভক্তিপথের পথিকেরও তা কর্তব্য নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মরণীয় যাঁরা =

কুলাধি দেবতা মোর মদনমোহন। ০
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন।
বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥
তাঁদের আজ্ঞা লইয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
শ্রীরূপ, রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁদের স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ চৈঃ চঃ। আদি ৮ম।

ঐ সময় শ্রীজীব গোস্বামীও প্রকটিত ছিলেন না। সেইজন্য অমনি ভাবে তাঁকেও স্মরণ ক'রে লিখলেন—

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস, আর শ্রীজীব চরণ॥
শিরে ধরি বন্দো নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ চৈঃ চঃ। আদি ১৭।

অতএব ঐসব পয়ারের দ্বারা নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও লীলা সহচরদের কেউই জীবিত ছিলেন না।

তাঁরা জীবিত না থাকলেও তাঁদের বৈষ্ণব আচরণের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের দৈন্যা-চরণের সংস্কারটি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লাভ ক'রেছিলেন, তাই শ্রীচরিতামৃতের স্থানে স্থানে তিনি সেটি প্রকাশ করেছেন।

ঐতিহাসিক তারিখগুলির দ্বারাও জানা যায় শ্রীচরিতামৃত রচনার সময় ব্রজের আচার্য্যদের কেউই জীবিত ছিলেন না। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পূর্বেই লিখেছি) এখানে সংক্ষেপে জানাই—

১৫৩৩	,,	শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর	লোকান্তর
১৫৩৪	,,	শ্রীগদাধর পণ্ডিতের	,,
১৫৬৩	,,	শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর	,,
১৫৮৫	,,	শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর	,,
১৫৮৬	,,	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর	,,
১৫৯১	খৃষ্টাব্দে—	আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের	,,
১৫৯১	,,	শ্রাবণী দ্বাদশীতে শ্রীরূপের	,,
১৫৯৬	,,	শ্রীজীব গোস্বামীর	,,

এইসব প্রখ্যাত তিথি ও তারিখের দিক থেকে বলা যায়, কেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এ গ্রন্থ রচনার সময় ঐ সব আচার্য্যকে স্মরণ ক'রে মনোবল ও সাহস সঞ্চয় করার সঙ্কেত রেখেছেন। এবং কেন ব'লেছেন—এ গ্রন্থ রচনার আদেশ যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা কে কে।

দীনতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সঙ্গে এমন ক'রে সাক্ষ্য দেবার পদ্ধতিটি এর আগেও তিনি করেছেন। অর্থাৎ—১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্য" লেখেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা যে ধরণের ছিল—অর্থাৎ যা সাধারণ মহাকবি কবিদের গ্রন্থাবলীর স্বক্তিকা বা পুষ্পিকায় পাওয়া যায়, তা থেকেও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার সময়ে আরও বেশী দৈন্য প্রকাশ করেছেন। একটু নমুনা দিই

অপটু রতি তটস্থ স্বচ্ছ বুদ্ধ্যা মৃপাত্রঃ
পুর রস কলনেচ্ছুঃ কৃষ্ণলীলামৃতাব্ধেঃ।

---

০ † † তখনও এই শ্রীবিগ্রহের পাশে শ্রীরাধার বিগ্রহ স্থাপিত হয় নাই?

নিরবধি হি তদন্তঃ ক্রীড়তাং বৈষ্ণবানাং
কিমু নহি ভবিতাহং হাস্যহেতু র্গরীয়ান্ ॥

অর্থাৎ—আমি অল্পবুদ্ধি, চঞ্চল, অপাত্র ও অপটু ; তবুও কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধুর প্রচুর বর্ণনা ক'রতে প্রবৃত্ত হ'য়েছি ; তাতে বোধ করি আমার চেষ্টায় বৈষ্ণবগণ আমাকে হাস ক'রবেন ; কেননা তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসাগরের অন্তশ্চর পুরুষ।

(এখানে দৈন্যের সঙ্গে একটু আত্মতৃপ্তির কথাও যেন লিখেছেন ?)

শ্রীরূপ-সন্নট-বিকাশিত-কৃষ্ণলীলা-
লাস্যমৃতা প্লুত ধিয়াং ব্রজ বৈষ্ণবানাম্।
হাস-প্রকাশন করীপ্রমদপ্রদা বাঙ্
মন্দস্য মে ভবতু ভগুতরস্য যদ্বৎ ॥

হায় ? যে সব ব্রজবাসী বৈষ্ণব সেই রসশালার শ্রেষ্ঠ নট শ্রীরূপের বিদগ্ধ মাধব, ।ত মাধব প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ক'রেছেন, তাঁরা হয়তো আমার এই গ্রন্থ দেখে আমাকে । ব'লে ক'ত ঠাট্টা তামাসাই না ক'রবেন !

এরপর শ্রীভাগবতের ছাঁদে একটি শ্লোকে ব'লেছেন—

তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘ বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতীত্যাদি সদুক্তি নোদিতঃ।
মন্দোঽপি গোবিন্দ বিলাস বর্ণনৈঃ
মন্দাং গিরং স্বাং বিদধে সদাদৃতাম্ ॥

অর্থাৎ—শুনেছি সাধুদের কথা—তাঁরা বলেন—ভগবৎ প্রসঙ্গের আলাপ ক'রলেও রকমের পাপ বিদূরিত হয়, তাই সেই কথার উদ্ধৃতি ক'রে উৎসাহ পাচ্ছি, এবং এই ।বিন্দ লীলামৃত বর্ণনা ক'রতে উৎসুক হ'য়েছি। অতএব আমি মন্দ হ'লেও আমার ।য় সাধুরা নিশ্চয় আদর ক'রবেন।

আরও একটি কথা—

মন্দাস্য মরু সঞ্চার খিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীম্।
সন্তঃ পুষ্ণন্তিমাং স্নিগ্ধাং কর্ণ কাসার সন্নিধৌ ॥

শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ১।৬—৯।

অর্থাৎ—মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে গাভীরা যখন ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ে, তখন যদি নিকটে রাবর পায়, তাতে যেমন তারা তৃপ্ত হয় অথবা পক্ষে সেই সরোবরই যেমন তাদের া ও ক্লান্তি দূর ক'রে তৃপ্তি দেয়, তেমনি শুকনো মরুভূমির মত আমার মুখ বিবরে ।রিণী বাণীও এখন গোকুলোন্মুখী হ'তে চলেছে—সাধুরা সেই তৃষ্ণার্ত্ত বাণীকে তাঁদের কুহর সরোবরে একটু স্থান দেবেন।

এইসব শ্লোকে স্পষ্ট বোঝা যায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে এসে বাচনভংগী রূপান্তরিত হ'য়েছিল। ০১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪১ বৎসরের ব্যবধানে তাঁর মন আরও দৈন্যাচরণে নিবিষ্ট হ'য়ে- ল। সেটি ব্রজের আচার্য্য গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণেরই ফল ব'লতে হয়।

কারণ যখন শ্রীগোস্বামীবৃন্দ ব্রজে অবস্থান ক'রছেন, তাঁদের সকলের না হোক

অনেকেরই সঙ্গ লাভ করেছিলেন বলেই শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্যে তা স্বীকার করেছেন—

এই মহাকাব্যটির প্রতিসর্গের শেষে এই শ্লোকটি বসিয়ে সেই স্বীকৃতি জ্ঞাপন ক'রেছেন—

শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ শ্রীরূপ সেবাফলে-
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাস কৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বরজে গোবিন্দ লীলামৃতে—
সর্গঃ .... ।

অর্থাৎ—শ্রীচৈতন্যের চরণ কমলের মধুপ শ্রীরূপের সেবার ফলে, শ্রীরঘুনাথ দাসের প্রেরণায়, শ্রীজীবের সঙ্গ লাভে, এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বরদানে (এখানে শ্রীসনাতন শ্রীগোপাল ভট্ট এবং অন্য আচার্য্যের নাম নাই) এই গ্রন্থ রচিত হোলো।

এইসব স্পষ্ট প্রমাণ থেকে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রচনা করেন, তার দীর্ঘদিন পরে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন।

তবুও বাংলার বৈষ্ণব সমাজে এমন একটি কিংবদন্তির প্রচলন হ'য়ে আছে. যে, (কে কিংবদন্তি) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটি নাকি শ্রীবৃন্দাবনের আচার্য্য গোস্বামীদের বর্ত-মানেই পশ্চিমবংগের বন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর চুরি ক'রেছিলেন অর্থাৎ—শ্রীজীবের, শ্রীরঘুনাথ দাসের জীবিতকালেই তাঁদের গ্রন্থাবলী যখন বাংলায় প্রচারের জন্য পাঠান হয়, তখন পথিমধ্যে বাঁকুড়া বন বিষ্ণুপুরে চুরি হ'য়ে যায়। চোরটি হলেন সেখানের রাজা বীর হাম্বীর।

এই সংবাদ শুনেই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

কি উদ্ভট অনৈতিহাসিক কাণ্ড কারখানা।

বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে রাজা হন নাই। তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজ্য পান এবং ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

আর গ্রন্থ চুরি করেছিলেন বলে যে রটনার অস্তিত্ব তাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছা-কাছি কোনও এক সময়। তাহলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতটি চুরি হোলো কি ক'রে? তখনও তো এ গ্রন্থের জন্মই হয় নাই।

ঐ উৎকট প্রবাদ সৃষ্টির মূলে যে সব গ্রন্থ তাদের মধ্যে প্রেম বিলাস। কর্ণানন্দ। এবং ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থই সবার ওপরে।

সরল সাধু বৈষ্ণবগণ কিন্তু ঐ সব গ্রন্থের আখ্যানে আজও বেশ নিষ্ঠা পোষণ করেন।

১। প্রেম বিলাস এর রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দ দাস। নিবাস বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রাম। বৈদিক ব্রাহ্মণ বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষ তিনি।

গ্রন্থটির যে কয়টি সংস্করণ অদ্যাবধি হ'য়েছে তাদের মধ্যে ১৬টি অধ্যায় বা বিলাস। কোনটির ১৮টি। কোনটির উনিশটি। কোনটির ২০টি অধ্যায় বা বিলাস সাজান আছে।

আবার সন্দিগ্ধ আর একটি সংস্করণে ২৪টি অধ্যায়ও দেখা যায়।

সমগ্র গ্রন্থটিতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কথা প্রসঙ্গ বিধৃত করা হ'য়েছে।

কিন্তু এমন কোন প্রসঙ্গ নাই যেগুলি গ্রন্থকারের চোখে দেখা ঘটনার ভিত্তিতে । কিংবা এমনও বলেন নাই যে, এসব ঘটনা অমুক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শোনা । প্রেম বিলাসের সব অধ্যায়ের সব ঘটনাই গ্রন্থকারের স্বপ্নসন্ধানে এবং দৈব বাণী সমুদ্ভুত ।

প্রথমে আছে পাঁচটি স্বপ্নের কথা—
দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে দুটি

চতুর্থে পাঁচটি । তাছাড়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে লোকান্তরিত শ্রীঅদ্বৈত র্য্যের স্বপ্ন সাক্ষাৎকার ।

পঞ্চমে একটি । ষষ্ঠে তিনটি । সপ্তম, অষ্টম, নবমে দুটি ক'রে স্বপ্ন এবং তার সঙ্গে াণীও আছে । দশমে দুটি, একাদশে একটি, দ্বাদশ ত্রয়োদশে একটি ক'রে স্বপ্ন । এবং শে একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত ।

গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে ১৫২২ শকাব্দে বা ১৬০০ খৃষ্টাব্দে । অর্থাৎ "শ্রীচরিতামৃত" চুরি উপকথায় গ্রন্থটি তখনও রচিত হয় নাই । গ্রন্থটি লেখার ধরণ-ধারণটি স্বপ্ন-জন্য বলেই নামকরণ করা উচিত ছিল 'স্বপ্ন প্রেম বিলাস" ।

এতেই আছে শ্রীচরিতামৃত চুরি যাওয়ার পরই—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধা কুণ্ডে দিয়ে দেহত্যাগ করেন । এবং তাঁর হাত ধ'রে শ্রীরঘুনাথ দাস কাঁদতে থাকেন ।

মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ ॥
আরও একটি কাহিনী এতে বিবৃত, যা অনৈতিহাসিক
কাজীর প্রেরিত বেশ্যা তথায় আসিলা ।
মোগল বংশীয়া বেশ্যা পরমা সুন্দরী ।

প্রেমবিলাস । ২৩৫

শ্রীহরিদাসকে বিড়ম্বনায় ফেলার জন্য রামচন্দ্রখাঁরই এই অপকীর্ত্তি ব'লে প্রসিদ্ধ দ । কিন্তু এখানে আছে কাজীর অপকীর্ত্তি, তাও আবার মোগল বংশীয়া বেশ্যা । কি পাঠানের কাল ? মোগলের কোন কন্যা সেইকালেই বেশ্যাবৃত্তি করেছে ?

দ্বিতীয় গ্রন্থ কর্ণানন্দ ।

এর রচয়িতা যদুনন্দন দাস । গ্রন্থের রচনাসমাপ্তিতে লেখা আছে—১৫২৯ শকাব্দ । ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

এ গ্রন্থের রচনার উৎস শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশ । ৎ তখনও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের জন্ম হয় নাই ।

এতেও আছে গ্রন্থ চুরির সংবাদ ।

এ গ্রন্থ চুরি হয়েছে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, আর সে সংবাদ বিধৃত হ'য়েছে ০৭ খৃষ্টাব্দে এবং শ্রীচরিতামৃতের রচনা আরম্ভ হোলো ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে, কি অদ্ভুত গুস্ত ।

এছাড়া কর্ণানন্দের পঞ্চম বা ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় যেটি বর্ণিত হয়েছে সেটি যে ভক্তিরত্নাকরের ০-৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনার ভাষা ও ভাব অবিকল উদ্ধৃত, তা কি গ্রন্থকার ঘরের অগোচরে উ বসিয়েছে ? না কি এ ধরণের অনুহরণও পরমার্থ সাধনের আর এক ধাপ ?

আর একটি গ্রন্থ ভক্তি রত্নাকর।

এর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী। তাঁর আর এক নাম ঘনশ্যাম দাস। ইনি নিজে পরিচয় নিজেই দিয়েছেন গ্রন্থের গোড়ায়। গ্রন্থটি শ্রীগৌর সুন্দরের অন্তর্ধানের দেড়শ বৎসর পরে লেখা ; এবং "অনুরাগবল্লীর"ও পরে লেখা।

কারণ ভক্তি রত্নাকরে এমন অনেক উদ্ধৃতি র'য়েছে যা অনুরাগ বল্লী থেকেই নেও ব'লে স্পষ্ট সাক্ষ্য র'য়েছে। অনুরাগবল্লীটি লেখা হয়েছে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে। তখন শ্রীবিশ্বনা চক্রবর্ত্তীর জীবিত কাল।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীভাগবতের টীকাটি সমাপ্ত ক'রেছেন। ভ রত্নাকরের লেখক ছিলেন শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের রন্ধন কাজের অধিকারী।

তিনি ভক্তি রত্নাকরে যে সব ঘটনা লিখেছেন, তাতে বোঝাতে চেয়েছেন শ্রীনিবাসে ব্রজ ভ্রমণের সমস্ত ঘটনাই তাঁর অবগতিতে এসেছে এক অজ্ঞাত কুলশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মু থেকে শুনে।

কিন্তু রচনার পরিবেশন ভঙ্গীতে এমন কথাও লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে যে, শ্রীচৈতন্যে অন্তর্ধানের দুই এক বৎসরের মধ্যেই শ্রীগদাধর, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের তিরোভ ঘ'টেছে।

বিচিত্র তথ্য সংগ্রহই ব'লতে হবে।

এমন কয়েকটি বিচিত্র বার্ত্তা বাহক গ্রন্থের উক্তিকে ভরসা ক'রে, বাংলার বৈষ্ণব সমা আজও এই সব গ্রন্থের ভাষণ কথনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

তাঁদের মনে যে কোনও এক সম্প্রদায়ের—বিশেষ উদ্দেশ্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়াসেই এই সব কাহিনী প্রচার করা হ'য়েছে যেটি সুস্পষ্ট অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চরিত মৃতের এবং তার গ্রন্থকারের প্রতি যে একটি অবিমিশ্রিত মাহাত্ম্য প্রচার করা হ'য়ে এটা ধরা যাবে কি। কিন্তু সে তথ্যের প্রতিফলন স্পষ্টতঃ হয় কি ?

বাহ্যতঃ যেমন হয় না এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেরই মূল বক্তব্যের উদ্দে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং সেটি প্রচারের জন্যই এবং গৌড়ের বিশুদ্ধ বৈষ্ণ ধর্মের বক্তব্যকে চাপা, তা কজন করতে পারে ? এবং বৈষ্ণব তার ছায়া অবলম্বন ক' ঠিক যেন বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্তবাদকেই বলা হ'চ্ছে ; এমনি একটি কৌশল অবলম্বন কর হ'য়েছে এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে।

এর জন্য খাড়া করা হ'য়েছে

"স্বরূপ দামোদরের" কড়চা নামক এক কল্পিত পুঁথি, এবং রায় রামানন্দের স শ্রীচৈতন্যের মিলনের মাধ্যমে বৈষ্ণব রস সিদ্ধান্তের মধ্যে নূতন এক রহস্যবাদ। আবা এই দুটিকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় বাদের এক অভিন ও অবৈষ্ণবোচিত তত্ত্ব বাদের প্রচারও শ্রীচরিতামৃতে স্পষ্ট।

তাকে মূলতঃ জানাবার জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাংশগুলিকে বলা হয় এবং প্রচার করা হয় "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" মানেই ব্রজের গোস্বামী আচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর সার মর্ম এই "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।"

আরও বলা হয় তাঁদের গ্রন্থাবলীর সিদ্ধান্তবাদ যত জটিল রহস্যে ভরা, সেগু

ায়ত্ব ক'রতে গেলে যে পাণ্ডিত্য, যে ভগবৎ করুণা, এবং যে অনুশীলনের প্রয়োজন, তা াজ আর সকলের ভাগ্যে এবং আয়ুতে কুলায় না, অতএব একমাত্র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নুশীলন ক'রলেই আচার্য্য গোস্বামীদের সিদ্ধান্তমর্ম সব জানা যায়।

কারণ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন ব্রজের গোস্বামীদের সঙ্গ লাভে ধন্যতম পুরুষ, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রিয় সেবক, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নামক মহাকাব্যের রচয়িতা ৎ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আনীত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মত অমূল্য লীলাকাব্য গ্রন্থের কাকার।

সে ক্ষেত্রে শ্রীগৌর সুন্দরের সর্ব্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি ক'রে যে ভিনব বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরস বাদের প্রবর্তন, তাকেই সুরক্ষিত করার জন্য শ্রীরূপ সনাতনকে যে ভক্তিবাদের উপদেশ এবং তাঁদের অব্যবহিত কালে শ্রীশ্রীজীবের দ্বারা ষ্ণব ধর্মের অভিনব "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" বাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা সবই পাওয়া যায় কমাত্র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের দ্বারা।

অতএব গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের ভাগবতীয় মতবাদের আকরত্ব এবং ব্যাখ্যান যখন চৈতন্যদেবের জীবনের শেষ লীলায় তা পূর্ণ প্রকটিত হ'য়েছিল, তখন সেই শ্রীচৈতন্য-বের লীলা চরিত্রের মাধ্যমেই যা তথ্য ও তত্ত্ব বাদের সমাবেশের কাহিনী সম্ভার হিত র'য়েছে তা এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, তখন অবশ্যই ধ'রে নিতে হবে, ব্রজের গাস্বামীদের সমস্ত সিদ্ধান্তের পূর্ণ লক্ষ্য শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত ভক্তিতত্ত্ব-দের মঞ্জুষা এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এইভাবে প্রচার কাহিনীটি কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, নিবাস প্রভৃতি মহাত্মগণের আবির্ভাবের পূর্বে হয়েছিল ব'লে কোনও সংবাদে পাওয়া য় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর সহচর বৃন্দের জীবন কথা এবং তাঁদের প্রদত্ত উপদেশ কি ছিল া জানা যায় শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত) শ্রীকবি কর্ণপুরের ন্থে (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য ও শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক) এবং শ্রীবৃন্দাবন াসের শ্রীচৈতন্য ভাগবতে। তাছাড়া পাওয়া যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ও ীবের রচিত বহু স্তব ও প্রশস্তি বচনের মাধ্যমে।

তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর সহচরবৃন্দ যে ভাবে চিত্রিত হ'য়েছেন, তা কে একেবারে ভিন্ন আস্বাদনে চিত্রিত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য রিতামৃতে।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীগৌরাংগের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টৃবৃন্দ যে সব দ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয়বাদ াপন ক'রেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'। অর্থাৎ চরিতামৃতের হজিয়াবাদটি শ্রীগৌরাংগদেবেরও নয় এবং ষড় গোস্বামীদেরও নয়।

সর্বাধিক পৃথক হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট ভাগবতীয় তত্ত্বাদের রহস্যটি এই চৈতন্য চরিতামৃতে। শ্রীভাগবতীয় ভক্তি রহস্যবাদটিকে সাহিত্যে রসে অলংকারে ও র্শনিকতায় যে দৃষ্টিতে দেখে, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব তাঁদের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তার

রহস্যানুবাদ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, তা থেকে কোথায় স'রে গিয়ে এক উৎকট সহজিয়া পরকীয়া বাদের আশ্রয়ে তাকে ব্যাখ্যান করার কৌশল সূত্র স্থাপন করা হ'য়েছে এ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে।

এই কৌশল সূত্রগুলিই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন লীলার মাধ্যমে এক নূতনতর পদ্ধতি স্থাপন করা হ'য়েছে এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে।

এমন তীক্ষ্ম কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আগেই যদি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের রচি গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির নানান্ কাহিনীর উদ্ভাবন করা যায়, তাহলে তো সেই হ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাই শ্রীচরিতামৃতের মাহাত্ম্য প্রচার করার পিছনে এ অন্যান্য গ্রন্থের এই উদ্দেশ্য ছিল এটা গোস্বামীদের ভক্তিবাদের গ্রন্থ না পড়লে ধরা যা না। আর বজ্রযানীদের রহস্যবাদ না পড়লেও ধরা যাবে না।

কিন্তু সেই সুপ্রাচীন পবিত্র উজ্জল বৈষ্ণব ধর্মের অপূর্ব্ব অভিনব রসবেত্তা শ্রীর শ্রীসনাতন শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবের সঙ্গ লাভে ধন্যতম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই যদি এ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক হন, তা'হলে কেন প্রশ্ন উঠ্বে না এই শ্রীচৈতন্যচরিত মৃতের তিনটি লীলা খণ্ডের অধ্যায় গুলিতে গৌড়ের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমন সূ কৌশলে ভক্তিরস সিদ্ধান্তের যে সব অপব্যাখ্যা করা হ'য়েছে, সেগুলি কি সেই পুণ্যশ্লো শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা? নাকি তাঁর নামের আড়ালে অন্য কোন সহজি পন্থীর লেখা? অথবা শ্রীকৃষ্ণদাসের সঙ্গে অভিন্ন নাম গ্রহণ ক'রে কোনও ধূর্ত সহজি পন্থী বৈষ্ণবেরই এই অদ্ভুত সৃষ্টি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ?

যে গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের চেয়ে সহজিয়া পন্থী রায় রামানন্দের ভক্তিরস ব্যাখ্যানের আ কর্তৃত্ব স্থাপিত করা হয়, যে গ্রন্থে ঈশ্বরের দেহ ও আত্মার পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়, যে গ্র —কাল অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট এবং সন্দিগ্ধ শ্লোকগুলিকে শ্রীচৈতন্যের উক্তি ব'লে ঘোষ করা হয়, যে গ্রন্থে পারমার্থিক কান্তাকান্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা ব্যবহারিক সত্তার প্রতীক যে প কীয়া বাদের ভাবাশ্রয়ী মাত্র ঈশ্বর ব'লে ঘোষণা করা হয়, সেই শ্রীচৈতন্য চরিতা গ্রন্থটি কি ব্রজের গোস্বামী আচার্য্যদের সিদ্ধান্তিত ভক্তি রসবাদের বাংলা ভাষায় সংস্ক বলা যাবে?

এসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে সেই সব প্রশ্ন তুলেছি এই সন্দর্ভের প্রথম দিকে।

হ'তে পারে পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অভিনব অনুভূতি ও অনুশীলনের জ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর মতবাদের এই অভিনব ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই চরিতামৃত; কি তারই জন্য কি গ্রন্থকারকে স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামে এক কল্পিত কড়চা পুঁ অস্তিত্ব আবিষ্কারের কথা স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে? আর তাই বলে কি পণ্ডিতদের কা গৌড়ের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি রহস্যবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের অভিন্ন চি ধারার একটা সমন্বয় সাধন ক'রতে হবে? নাকি শ্রীচৈতন্যদেবের মুখোক্তি দিয়ে বসাে তাঁদিকে ভাবতে হবে এইটিই সুপ্রাচীন ভাগবতীয় চিন্তাধারা? নাকি পরে সমাগত প্রক্ষিপ্ত মতবাদটিই আসল? অতএব এইটিই হোলো অকৃত্রিম ভাগবতীয় ভক্তিবাদ

কিন্তু এগুতো সমুজ্জল হয়ে র'য়েছে যে, শ্রীচৈতন্যের জীবন ও শ্রীভাগবতীয় রহ বাদকে অভিন্ন ক'রেই দেখেছেন পরম পূজনীয় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, বিশেষ

শ্রীপাদ শ্রীজীবের অনুশীলনী ধারা।

শ্রীজীবের ভাগবত ব্যাখ্যা এবং তাঁর ষট্ সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থের মাধ্যমেই তো তিনি আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অনুসৃত বৈষ্ণবীয় ধারা থেকে, ভগবান শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রবর্ত্তিত ভাগবত ধারাটি যে আরও কতখানি অভিনব, কত সমুজ্জল, তা সেই ভাগবতীয় রহস্যবাদে দেখিয়েছেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে শ্রীগৌরের স্বরূপ ও তত্ত্ববাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং সে ইঙ্গিত র'য়েছে এই ভাগবতে। কোন জটিলতা নেই তাতে, পরিস্কার ক'রে তা জানিয়েছেন।

কিন্তু এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এমন সব তথ্য কাহিনী র'য়েছে এবং শ্রীভাগবতের মৌলিক ব্যাখ্যানকে পাল্টে দেওয়ার কথাও র'য়েছে, যাতে স্পষ্ট ধারণা ক'রতে হয়—এসব পরবর্ত্তিকালে যোজিত হয়েছে এবং যা অধ্যয়ন ক'রলে বিস্ময় জাগে এবং প্রশ্ন জাগে—

এই প্রক্ষিপ্ত মতবাদের প্রবেশ কত দিনের ?

এসব প্রসঙ্গের অবতারণার মুখে আগে এইটুকু বলা দরকার যে :—

শ্রীভাগবত আশ্রয় ক'রেই গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। এমন কি এ কথাও প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে যে, "ব্রহ্মসূত্রের" অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত। উভয় গ্রন্থই মহাভাগবত ঋষি ব্যাসের নামে আরোপিত।

সেই শ্রীভাগবতের নির্দেশিত পথেই এই সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচার। অন্যান্য উপনিষদের ব্যাখ্যাও শ্রীভাগবতের মত ও পথকে আশ্রয় করে।

শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীপাদ রূপ, শ্রীপাদ শ্রীজীব, শ্রীভাগবতের প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে গৌড়ের বৈষ্ণবীয় তত্ত্ববাদ ও লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষিণী, লঘু তোষিণী ও ক্রমসন্দর্ভ এই তিনটি নামে যে সব টীকার প্রচার, সেগুলি শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের রচিত। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু দিনের এদিকে ওদিকে এগুলি রচিত হ'য়েছে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচনার আগেই।

তা হলে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সব আচার্য্যদের ভাগবতীয় সিদ্ধান্তবাদ ভাল ক'রেই অধ্যয়ন ক'রেছিলেন, এবং আচার্যদের মধ্যে অনেকের সঙ্গও লাভ ক'রেছিলেন। এ কথা তাঁর শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে স্বীকার ক'রেছেন।

[পূর্বেই দেখিয়েছি]

তবুও কেন দেখা যায় তাঁর নামে প্রচলিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীজীবের বিরুদ্ধে অভিমত পোষণ করার দৃষ্টান্ত স্থল র'য়েছে।

(১) শ্রীভাগবতের ২।১০।৬ শ্লোক—

"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

এই শ্লোকটির অন্তিম চরণ "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এর ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী ব'লেছেন" স্বরূপেণ বিনা ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতি র্হি মুক্তিঃ।

স্বামীর ব্যাখ্যা পরিত্যাগ ক'রে শ্রীজীবই প্রথম বল্লেন, না, ব্রহ্মতয়া নয়। মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি র্নাম স্বরূপ সাক্ষাৎকার উচ্যতে। স্বরূপং চাত্র মুখ্যং পরমাত্ম লক্ষণম্ ; রশ্মিপরমাণূনাং সূর্য্যইব, স এব হি জীবানাং পরমো অংশিস্বরূপঃ। দু'জনের মধ্যে

শ্রীধরের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ আর শ্রীজীবের ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ।

(২) শ্রীভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৫ম অঃ ৩৫ শ্লোকের শেষ চরণ (ব্যাস নারদ সংবাদ

জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগ সমন্বিতম্।

শ্রীধর স্বামী পাদ এটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা ক'রেছেন—জ্ঞানং' ভক্তি—যোগাদ্ভবতি।

কিন্তু শ্রীধরের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি বলেছেন—"ভক্তিযোগঃ কীর্ত্তনস্মরণাদিরূপঃ। তৎসমন্বিতং তেন সমবেতং যজ্জ্ঞানং ভাগবতং তদপি তদধীনং তদব্যভিচারিফলম্।

স্বামীপাদের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ এটি। এটি প্রতিবাদই, অনুপূরণও নয়। ভগবৎ করুণাই যে ভাগবত জ্ঞান এবং সেটি হয় তাঁর নাম কীর্ত্তন স্মরণের দ্বারা, এবং সেই নাম গ্রহণের প্রবৃত্তিটিও কোন দয়ালু ভাগবতের করুণায় আসে।

৩। শ্রীভাগবতের ২য় স্কঃ। ৭ অঃ। ৫৩ শ্লোক

মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ।
শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি॥

এর ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী ব'লেছেন—শ্রীভগবানের লীলাটিই হোলো মায়াশ্রয়া।

আর শ্রীজীব বলেছেন, না, তা হয় না, মায়াময়ং বিরাট্ রূপং অপি বর্ণয়। স্বামীর মতে অবস্তুপর, শ্রীজীবের মতে লীলাটি বিরাট ও বস্তুপর।

৪। শ্রীভাগবত ৩স্কঃ।২৯ অঃ।২৫

অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবৎ ঈশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

এর ব্যাখ্যায় শ্রীধর ব'ল্লেন "যাবৎ ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্" অর্থাৎ যতদিন নিজের হৃদয়ে তাঁকে উপলব্ধি না করা যায়, তত দিনই শ্রীবিগ্রহের সেবা,

আর শ্রীজীব সেই মতটি খণ্ডন ক'রে ব'ল্লেন—না। কদাপি কুত্রাপি চ অর্চাবিগ্রহের সেবা পরিত্যাগ ক'রবে না।" কদাপি কুত্রাপি চ অর্চা বিগ্রহসেবা ন পরিত্যজ্যা।

এই ভাবেই অনেকস্থলে খণ্ডন ক'রেছেন শ্রীধরস্বামির মতবাদটিকে আচার্য শ্রীজীব।

অপর ভাষায় বলা যায়, ভারতের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের (শ্রীরামানুজ প্রভৃতির) মতাদর্শকে যতদূর সম্ভব মর্যাদা দিয়ে শ্রীভাগবতের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন আচার্য্য শ্রীজীব।

কিন্তু সেই আচার্য-বর্য শ্রীজীবের মতবাদকে পরোক্ষে কটাক্ষ ক'রেই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এমন একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করা হ'য়েছে, যেটির বক্তা নাকি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য? অথচ শ্রীজীবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেবের চাক্ষুষ আলাপের যোগ স্পষ্টত কোথাও পাওয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গ শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের সর্বতোভাবে আনুগত্য ক'রেই তো গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন আচার্য্য শ্রীজীব।

কিন্তু শ্রীধর স্বামীর মতবাদ যে সর্বক্ষেত্রে গৌড়ের ভক্তিবাদের সহায়কই হয়না এমনটি যখন স্পষ্ট, তখন সেই স্বামীকে না মানলে তাকে বারবনিতা রমণী ব'লে গণ্য

করা হবে, এমন ফতোয়া জারি যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ক'রে থাকেন, তা হ'লে সে নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে আচার্য্য শ্রীজীব নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবেন এ প্রস্তাব তো হাস্যকর।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ অথবা তাঁর অবর্ত্তমানে প্রক্ষিপ্ত অংশের কোনও ধূর্ত্ত লেখক তেমনি কৌশলই অবলম্বন ক'রেছেন।—

প্রসঙ্গটা এই—

নীলাচলে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অবস্থান ক'রছেন, তখন প্রতিবর্ষেই তাঁকে দেখতে গৌড়ের ভক্তবৃন্দ আগমন ক'রতেন আকুল হৃদয়ের আবেগ নিয়ে। পরে কিছুদিন তাঁর সন্নিধানে থেকে যে যাঁর গৃহে ফিরে আসতেন।

তেমনি একটি বর্ষে সকলে এসেছেন তাঁদের প্রাণের প্রিয়তম পুরুষ সেই গৌরকে দেখতে। তাঁদেরই মধ্যে উপনীত হ'য়েছিলেন "বল্লভ ভট্ট" নামে একজন ভাগবতবেত্তা পণ্ডিত। এঁর সঙ্গে প্রয়াগে পরিচয় ঘটেছিল গৌর সুন্দরের।

তিনি যেদিন নীলাচলে গৌরের কাছে এলেন, তাঁকে দেখেই ব'ল্লেন—

হেন কালে বল্লভ ভট্ট মিললা আসিয়া।

* * *

বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা।

০ ০ ০

বল্লভ ভট্ট এমন ভাবে গৌরকে কথা ব'ললেন, যাতে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর কাছে ভাগবত ও ভগবৎ স্বরূপের অভিন্ন বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।

তাঁর এই রকম মন্তব্য শুনতেই শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কুচিত হ'লেন। আর তাঁর কথার ধরণে গৌর বুঝতে পেরেছিলেন ইনি যখন পণ্ডিত ব্যক্তি, তখন পাণ্ডিত্যের অভিমানও বেশ গাঢ় এবং আমার কাছে একটা স্বতন্ত্র গুরু মর্য্যাদা আদায় ক'রতে চান। বল্লভ ভট্টের কথা শুনতে শুনতেই শ্রীগৌরসুন্দর—

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের সদৈন্য উক্তিগুলি এমনি হোলো, যেন নিজে তেমন তো শিক্ষিত নন। যা কিছু তাঁর জ্ঞান লাভ হ'য়েছে সবই বড় বড় জ্ঞানী, বিদ্বান ও ভক্তদের কাছে শুনে শুনে। তাতে বল্লভ ভট্ট একটু দমে গেলেন।

কিন্তু সেই বল্লভ ভট্টই আবার রথযাত্রার দিনে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্চর্য্যজনক ভাব বিহ্বল মূর্ত্তিকে দেখলেন, সেদিন নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলেন। তিনি ধারণা ক'রলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণই।

প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি যার প্রেমোদয়।
এইত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, ভট্টের হইল নিশ্চয়॥

তারপর সেই বল্লভ ভট্ট যেদিন নীলাচল থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন মনে ক'রলেন, সেদিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে এসে বিনীত নিবেদন ক'রলেন—

ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥

তাঁর প্রস্তাব শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ ক'রলেন না। কিন্তু ব'ল্লেন—'না' না আমি ভাগবতের অর্থ বুঝি না। শুধু কৃষ্ণনামই গ্রহণ করি।

এতে বল্লভ ভট্টের মন বিষন্ন হ'লো। আরও কয়েকদিন র'য়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পূর্ব প্রস্তাবটি নিয়েই পণ্ডিত শ্রীগদাধরের কাছে গেলেন। শ্রীগদাধর ভাগবতের নিত্য পাঠক এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীভাগবত শোনান। বল্লভ ভট্টের প্রস্তাবটি তিনিও গ্রহণ ক'রলেন না। তাতে ভট্টের মন আরও বিষন্ন হোলো। কিন্তু তাঁর মনে মনে দৃঢ়তা থাকলো, আমার প্রস্তাবে এ'দিকে ভাগবত শোনাতেই হবে। তাই কয়েকদিন ধরেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দের কাছে—

যাতায়াত ক'রতে লাগলেন। মাঝে মাঝে এক রকম জোর ক'রেই তাঁর টীকার বক্তব্যগুলি শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবৃন্দের কাছে শোনাতে লাগলেন। ফল এই হোলো যে, তাঁর ব্যাখ্যাগুলিকে পার্ষদবৃন্দ খণ্ডন ক'রে দিতে লাগলেন। এতে ভট্ট আরও দুঃখিত হ'লেন।

শেষে একদিন যেন মরিয়া হ'য়েই পার্ষদবৃন্দের সভায় নিজের প্রস্তাব উত্থাপন ক'রলেন—

আর দিনে আসি বসিলা নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥

এখানে এই প্রসঙ্গটির উপকল্পনের দ্বারা, একটি ছায়া ভূমিকার সূত্র স্থাপন করা হ'য়েছে। যাতে জন সাধারণ সহজেই ধারণা করতে পারেন, শ্রীধর স্বামীপাদের মতবাদ মানেই শ্রীচৈতন্যের দ্বারা মাননীয় মতবাদ।

বল্লভের সেই কথা কয়টি শোনা মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে বসলেন—

প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেইজন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে এই ধরণের গর্হিত উপমার কথা কয়টি বসিয়েই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার নিবৃত্ত হন নাই, অথবা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নামের আড়ালে সেই ধূর্ত লেখকটি চুপ ক'রে রইলেন না,

তিনি আরও বল্লেন, যা শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরই উক্তি ব'লে পয়ারে লিখলেন—

শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান এত গর্ব ধর।
শ্রীধর প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি।
শ্রীধর উপরে তুমি যে কিছু লিখিবে।
অর্থব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে।

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গণন॥
শ্রীধর অনুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান॥
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥

চৈ চঃ। অন্ত্য। ৭ম

এই ভাবে শ্রীধর স্তুতির পিছনে লেখক যে কাণ্ডটি ক'রলেন, তাতে এই ফুটলো যে, যদি শ্রীজীব শ্রীধরের ব্যাখ্যার অনুগামী না হ'য়ে থাকেন, তবে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণব-বৃন্দ যেন শ্রীধরেরই ভাগবত ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন, শ্রীজীবের নয়। কারণ শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং তাঁদিকে এ বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু এমন শ্রীধর স্তুতির পরেও শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অমান্যকারী সেই সব বৈষ্ণব, আজ বিংশ শতাব্দীতে শ্রীভাগবতের উপর বল্লভরচিত টীকাটি যদি একবার উল্টে পাল্টে পড়েন, তবে দেখতে পাবেন শ্রীবল্লভের টীকায় শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা কি ভাবে খণ্ডিত হ'য়ে আছে এবং শ্রীচৈতন্যের উপদেশ পাওয়া সত্ত্বেও শ্রীবল্লভ তাঁর মতটি পাল্টাননি।

কিন্তু আচার্য্য শ্রীজীব সম্ভব মত স্থলে শ্রীধরের সম্মানও দিয়েছেন, আবার ভক্তি-বাদের বিরোধিতাকে খণ্ডনও ক'রেছেন সর্বসম্বাদিনীতে; অতএব অমন কাঁচা মাথায় শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে শ্রীধর স্তুতি করাণটা যে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে এসেছিল, এমন অশুভ বুদ্ধির প্রক্ষেপ করার কাজটিতো 'প্রক্ষিপ্ত' অংশ বলেই গণ্য করা দরকার?

এই ভাবে শ্রীধর স্তুতির অন্তরালে যেটি লুকিয়ে আছে, এবং শ্রীজীবের মতবাদকে পরোক্ষে কটাক্ষ করার জন্য যে উদ্দেশ্যটি সাধিত হ'য়েছে—, সেটি গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যের বহির্ভূত মতবাদ হ'য়েও কিন্তু শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থটি মাননীয় সম্পদ ব'লে গ্রহণ করা হ'য়েছে। আবার তারই অনুসরণে উপাসনাও চ'লে আসছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় সে মতবাদ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু সে প্রক্ষেপ এমন রাস্তা দিয়ে এসেছে এবং এমন সব বৈষ্ণব পণ্ডিতের লিখিত তথ্য সম্ভারে সজ্জিত হ'য়ে এসেছে, যা আজ শুধু বিদ্বৎ সমাজের সামনে তুলে ধরাই যায়, কিন্তু তাকে উৎখাত করার ভার মহাকালের পরবর্ত্তী কলেবরের করেই ন্যস্ত রাখতে হবে। কারণ সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠন, অনুশীলন গেছে, আর তার সঙ্গে যান্ত্রিক ধর্ম-আচারও চলছে।

এই সঙ্গে জুড়েছে সেই প্রক্ষিপ্ত মতবাদগুলিকে সমর্থন ক'রে বহু ডকটর, অধ্যাপক, বহু গোস্বামী সন্তান, বহু বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী প্রবীণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভাবসাধক, এবং বহু খ্যাত-নামা ব্যক্তি, এই শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা ক'রে বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন এবং পাঠ বক্তৃতা করে বহু ব্যক্তির জীবিকা ও দীক্ষামিত্রের শিষ্য করাও যেমন চলছে বর্ত্তমান গুরুত্ব লাভের পথও দেখিয়ে চলেছেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রক্ষিপ্ত অংশ ব'লে কিছু আছে, এ কথা তাঁরা প্রকাশ্যে যেমন স্বীকারও করেন না, তেমনি করেন না 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' বাদটি শ্রীপাদ শ্রীজীবেরই আবিষ্কৃত দার্শনিক মতবাদ ঠিকই, কিন্তু উপাসনার ক্ষেত্রে লীলাবাদটিও যে সম্পূর্ণরূপে তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলছে বা চলা উচিৎ এটাও আমরা গ্রহণ করিনা।

তাঁরা অন্তরে স্পষ্টতঃ জানেন গৌড়ের প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনায়

লীলাবাদটি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবর্তিত। অর্থাৎ পরকীয়া বাদ।

কিন্তু তাতে, গৌড়ের আদি বৈষ্ণব আচার্য্যদের সম্মতি থাকে না; তাই সেই লীলা-বাদটি শ্রীগৌরাঙ্গের মনোমুকুর তুল্য শ্রীরূপ গোস্বামীরই অভিমত, এমনি ভাবে সম্প্রদায় আনুগত্য সাধন করার প্রয়াসে এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রতিটি অংশকেই তাঁরা প্রক্ষেপ শূন্য ব'লে ঘোষণা ক'রে আসছেন।

কিন্তু এই গ্রন্থের যথাক্রমে যা অগ্রবর্তী অংশ তাতেই পরিস্কার ক'রে দেখিয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বক্তব্যগুলি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পরিবেশনের ভঙ্গীতে এমন দাঁড়িয়েছে যে, শ্রীরূপ গোস্বামী যেসব শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসবাদ সঞ্চয় ক'রে গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন—সেগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখাশ্রিত তথ্য ভিত্তিক নয়, সেগুলি দাক্ষিণাত্যের সহজিয়া বৈষ্ণব শ্রীরায় রামানন্দের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ। সত্যই কি তাই ?

রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
শ্রীরূপে কৃপা সব তাহা কহিলা। চৈঃ চঃ।২।১৯
রামানন্দ রায় কৃষ্ণ রসের নিধান।
তিঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ॥
চৈঃ ২।১৯ চৈ চঃ। অন্ত্য। ৭
এইসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধ ভাব অন্ত ॥
চৈ চঃ। অন্ত্য ৭ পরিচ্ছেদ

অতএব যাঁরা মনে করেন এবং প্রচার করেন আমাদের গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা উপাসনাটি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার ক'রবেন এ উপাসনার মৌলিক আকর তাহ'লে সহজিয়া বৈষ্ণবের ধারায়? কারণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই তো ব'লেছেন "শ্রীরামানন্দ রায়ের কাছে রসতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ক'রেই শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সব তত্ত্ব শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়েছেন। এইভাবে ইষ্টদেবকে ক্ষুদ্র করাটা কি বৈষ্ণবীয় দৈন্য ? রায় রামানন্দ কি, জয়দেবীয় সহজিয়া নন ?

গৌড় থেকে গৌড়িয়া। রঙ্গ থেকে রঙ্গিয়া (নিতাই রঙ্গিয়া) মর থেকে মরিয়া। মরম (মর্ম্ম) থেকে মরমিয়া। কীর্ত্তন থেকে কীর্ত্তনিয়া। ছল ছলিয়া। কহ্ন-কাহাই কানাইয়া। সহজও তেমনি সহজিয়া। তাই সহজ বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৈষ্ণব এক পর্যায়ের, অতএব শ্রীরূপ গোস্বামীকে স্বীকার না ক'রলে অ-নাচার্য্য মত হয়, তাই তাঁরা "শ্রীরূপানুগত্যে ভজন" বলেন। কিন্তু তাঁদের ভজন প্রণালীটি যে সহজিয়া মতবাদের আকর এবং শ্রীগুরু-শ্রীরূপের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীজীবের মতবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রেই চলছে একথা খুব স্পষ্ট করে দেখাতেই এখানে শ্রীজীবের মত ব'লতে কি বোঝায়, তা অবশ্যই তুলে ধ'রতে হবে।

কারণ, শ্রীজীবের মত পুরুষ কখনই তাঁর শ্রীগুরুদেব আচার্য শ্রীরূপের ও জেঠা গুরু শ্রীসনাতনের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলতা ক'রে নিজের একটি স্বতন্ত্র মতবাদের প্রতিষ্ঠা করবেন এটি কল্পনাই করা যায় না।

সেই শ্রীজীব তাঁর শ্রীগুরু ও জ্যেঠাগুরু মহাশয়ের প্রদত্ত শিক্ষায় তিনি কি নিষ্ঠা কি

অকপট আত্ম সমর্পণ ক'রেছিলেন কিছু নমুনা দিই—

অঙ্ঘ্রিযুগ্ম মিহ সার সারস—
স্পর্দ্ধি মূর্দ্ধনি দধাতু মামকে।
যঃ সনাতনতয়া স্ম বিন্দতে
বৃন্দকাবনদমন্দ মন্দিরম্॥
যস্য শাসন বলাৎ কৃতাবিহ
প্রাবৃতং স্বয়ং অমুষ্য তুষ্যতঃ।
রূপ নাম মহিতস্য মৎ প্রভোঃ।
প্রীণতাৎ করুণয়া হরেঃ প্রিয়াঃ॥
পাতু মাং পিতৃতয়া কৃপান্বিত
স্তৎ প্রভুদ্বয় সহোদর প্রথঃ।
যো বিভাতি রঘুনাথ দাসতা
খ্যাতিভি র্জগতি সাধু বল্লভঃ॥
তন্নিদেশবর বীর্য সম্পদা
সম্মদাৎ প্রববৃতে কৃতাবিহ।
হন্ত! তস্য কৃপয়ৈব সন্ততং
যান্তু তোষং অপি তে মহাশয়াঃ॥

মাধব মহোৎসব মহাকাব্যং
প্রথম উল্লাস॥ ৩-৬।

অর্থাৎ যিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে অপরত্র যান না, সর্বদাই সনাতন স্বরূপে ব্রজে অবস্থান করেন, সেই সনাতন গোস্বামী পাদ আমার মস্তকে তাঁর চরণ যুগল অর্পণ করুন॥৩

যাঁর আদেশে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছি, সেই সদা তুষ্ট জগৎপূজ্য আমার শ্রীগুরু শ্রীরূপ, যাঁর নাম চির পূজ্য হ'য়ে আছে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।৪

সেই প্রভুদ্বয় শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, এঁরা সহোদর, এঁরা আমার পিতৃ স্বরূপ, আমার সর্বস্ব, আমার প্রতি কৃপালু সর্বদাই, এঁদেরই অনুজ আমার পিতৃদেব শ্রীবল্লভ, তাঁর অপর খ্যাতি রঘুনাথ দাস (কুল দেবতা রঘুনাথ) তিনি আমাকে রক্ষা করুন।৫

তাঁদের আদেশ এবং বরই আমার উল্লাস লাভের বীর্য্য স্বরূপ, তারই দ্বারা মহামত্ত হ'য়ে এই কাব্য রচনায় ক্ষুদ্রজীব জীব প্রবৃত্ত হ'য়েছে, তাঁদের কৃপাতেই শ্রীরাধামাধব ভজন নিষ্ঠ বৈষ্ণব মহাশয়গণ সন্তোষ লাভ করুন॥৬

আচার্য্য শ্রীজীব এই মাধব মহোৎসব কাব্যটি রচনা ক'রেছেন—

সপ্ত সপ্ত মনো শাকে জীবো বৃন্দাবনে বসন্।
স্বমনোরথবম্র্যাং কাব্যমেতদপূরয়ৎ॥

অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে। তার মানে তাঁর প্রখ্যাত চম্পূ কাব্য অর্থাৎ "শ্রীগোপাল চম্পূ" কাব্য রচনার পূর্বেই এটি সমাপ্ত ক'রেছেন। "শ্রীগোপাল চম্পূ ১৫৮৮ থেকে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে।

এমন শ্রীগুরু শ্রীরূপের চরণনিষ্ঠ শ্রীজীব তাঁর গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা-পারম্য-বাদটিকে যে বিচারের ধারায় আলোচনা ক'রেছেন, সেটিতে যে শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের বিচারধারাই প্রকাশ পাবে, এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতেই পারে না।

তবুও উপাসনার ক্ষেত্রে তেমন মতকে উপেক্ষা ক'রে "শ্রীরূপের আনুগত্যে রসবাদের ভজন প্রণালীই আদর্শ" এই মতবাদ প্রচার করার জন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে লঘু ক'রে, সহজিয়া মতবাদ প্রচারক রায় রামানন্দকে গুরু ক'রে দেখানর পিছনে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে যে সব কথা বসান হ'য়েছে, সেগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, এমন নিঃশংসয়তার জন্যই এখানে শ্রীজীবের রসলীলাবাদটির বিচার কেমন, তাই দেখাচ্ছি—, তারপর দেখাব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের পরকীয়া রসবাদ। ইনি আচার্য্য গোস্বামীর স্থান না পেয়েও গোস্বামীদের সঙ্গে সম আসনে পূজ্য পুরুষ।

লীলা পারম্যবাদে শ্রীজীবের অভিমত—

(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিই তাঁর স্বকীয়া শক্তি। সেটি তাঁর অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধে বাঁধা। ব্রজ রমণীগণ তাঁর স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তরূপ, তাই তাঁরা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যুক্ত এবং সম্বন্ধ যুক্তা ও নিত্য এবং নিত্যা। যে সম্বন্ধের সূত্রে তাঁরা বর্ত্তমান, তা নিত্য কান্তা কান্ত সম্বন্ধ। অতএব স্বকীয়া স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তরূপ ব্রজ রমণীগণ নিত্য কান্তার গণ। এঁদের নিত্যবাস গোলকেও। এ লোক অপ্রকটিত ব্রজভূমি। প্রকটিতভূমি শ্রীবৃন্দাবন। অতএব অপ্রকট ব্রজভূমি বা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজভূমির ভাব সম্বন্ধটিও নিত্য কান্তার ভাব।

(শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ১৭২)

এই মন্তব্যটির জন্য আচার্য্য শ্রীজীব যেসব শ্রুতিবাক্যের উপস্থাপনা ক'রে ব'লেছেন—

"স বো হি স্বামী ভবতি" সেই নন্দনন্দন তোমাদের স্বামী। (উত্তর গোপাল তাপনী ২৩ সূক্ত)

এখানে স্বামী শব্দের মুখ্যার্থই বক্তব্য। গৌণ নয়। অর্থাৎ ভূস্বামী, গৃহস্বামী, গোস্বামী প্রভৃতির মত নয়। এখানে মুখ্যার্থ বোধই পরিস্কার অর্থাৎ বিবাহিত স্বামীই এখানে শ্রুতি বাক্যের মুখ্য অর্থ, কিন্তু উপপতি নয়। স্বামী শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গেই এখানে সঙ্গতি।

(২) শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণই ব্রজগোপীবৃন্দ। তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ কান্তা কান্ত সম্বন্ধই নিত্যসম্বন্ধ। আর নিত্যকান্তা সেই ব্রজ রমণীগণের গাঢ় অনুরাগ সঞ্জাত অনাদি সিদ্ধ অভিমানোত্থ যে কান্তা অভিমান সেটিও নিত্য সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের স্বামী।

বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের সম্বন্ধে লক্ষ্মী দেবীর "লক্ষ্মীনারায়ণবৎ নিত্যং" এই সম্বন্ধটির জন্যই ব্রজদেবীদের এই অভিমান স্বাভাবিক।

এই জন্যই শ্রীভাগবতের ১১ স্কঃ। ১২ অঃ। ১৩ শ্লোকে শ্রীভগবান ব'লেছেন—

মৎ কামা রমণং জারং অস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাৎ শত সহস্রশঃ।

(টীকায়)—পতিত্বং তুদ্বোহেন কন্যায়াঃ স্বীকারিতঃ লোক এব। ভগবতি তু স্বভাবেনাপি দৃশ্যতে। পরম ব্যোমাধিপস্য মহালক্ষ্মীপতিত্বং হি অনাদি সিদ্ধমিতি।

(৩) ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকে—

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ
তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ॥ ৫।৩৭

(টীকায়)—তাঁরা তাঁর স্বরূপভূতা ব'লেই স্বকান্তা। নিজরূপতয়া ইতি স্বদারত্বেনৈব। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাৎ অস্য স্বদারত্বময়স্য কৌতুকাবগুণ্ঠতয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্বরূপশক্তিরূপা পরম লক্ষ্মী গোপসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরদারত্ব সম্ভবই নয়। রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের জন্যই প্রকট লীলায় অ-প্রকটের স্বদারত্বটি রসকৌতুক বশত যোগমায়া কর্তৃক পরদারানুরূপ ব্যবহারের আবরণে আবৃত।

এখানে পরিষ্কার ক'রে জানা উচিৎ যে, অপ্রকটিত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপ-সুন্দরীদের স্বকীয়া ভাবই বিদ্যমান।

৪) ব্রহ্ম সংহিতার ৫ অঃ। ষষ্ঠ শ্লোক—

"শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরম পুরুষঃ—"

এখানে শ্রীজীবের টীকা—তাঁরা তাঁর স্বরূপ-ভূতা ব'লেই স্বকান্তা। শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজ-সুন্দরীরূপাঃ।

(৫) শ্রীভাগবতের ১০ম। ৩৩ অঃ। ৯ম শ্লোক—

পাদন্যাসৈঃ ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈঃ ভ্রূবিলাসৈঃ
ভজ্যন্মধ্যে চলকুচ পটৈঃ কুণ্ডলৈঃ গণ্ডলোলৈঃ ॥ ইত্যাদি…

শ্রীজীবটীকা—স্পষ্টতঃ কৃষ্ণবধ্বঃ। বধূর্জায়া স্নুষা চ। অর্থাৎ বধূ শব্দটি—জায়া, স্ত্রী বা পত্নীকেই বলা হয়।

পূর্বপক্ষ—নন্নু মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা। ইত্যত্র প্রোক্তদৃষ্টান্তঃ ন ঘটতে। ইতি—অদাম্পত্যেন তত্রাগন্তুক সম্বন্ধাৎ, নতুঅয়ং স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবাৎতদেত-দাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি—কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদি অর্থাৎ পরমার্থতঃ দাম্পত্য না থাকলে তা তো সঙ্গতই হয় না। যেহেতু অদাম্পত্য হোলো কোনো আগন্তুক সম্বন্ধ, স্বাভাবিক নয়। এ শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেটিতে স্বাভাবিক সম্বন্ধের অভাব হোলে তা সঙ্গত হোতো না। তাই আনন্দাতিশয্যে শ্রীশুকদেব ব'লেছেন "কৃষ্ণ বধ্বঃ গায়ন্ত্যঃ তং তড়িত ইব তা মেঘ চক্রে বিরেজুঃ—১০।৩৩।৮

টীকায় আরও স্পষ্ট ক'রে—(ক্রমসন্দর্ভে)

গোপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি অর্থাৎ গোপবধূ বলে যে প্রসিদ্ধি, সেটি কৃষ্ণবধূ বলাতেই খণ্ডিত হয়। অতএব কৃষ্ণবধূ এই শব্দটির দ্বারা তাঁদিকে স্বকীয়া ব'লেই প্রকাশ ক'রেছেন শ্রীশুকদেব।

(৬) তারপর ১০।৪৬।৬ "ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান কথঞ্চন। প্রত্যাগমন সন্দেশৈঃ বল্লব্যঃ মে মদাত্মিকাঃ ॥

এই শ্লোকে শ্রীজীব—

যে বল্লব্য ইতি বস্তুতঃ তস্যৈব পত্নীত্বাৎ" ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃই শ্রীকৃষ্ণের পত্নী।

ব্রজদেবীগণ যে নিত্য দাম্পত্য সম্বন্ধে বাঁধা, তাঁদের পরকীয়াত্বই হয়না, এটি পরিষ্কার ক'রে দেখাবার জন্যই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী দুখানি মহাকাব্য রচনা ক'রেছেন একটি শ্রীগোপাল চম্পূ, অপরটি "মাধব মহোৎসব মহাকাব্য"।

প্রথম মহাকাব্যটি রচিত হবার ঢের পরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা ক'রেছেন, একথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী নিজেও স্বীকার করেছেন—

গোপাল চম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস পূর॥

তবুও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কার মতে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণলীলাটিকে পরোঢ়া নায়িকার সঙ্গে পরকীয়াত্ব দেখাবার প্রয়াস পেলেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, এর উত্তরে অদ্যাবধি কেবল ঐ কথাই শোনা যায় যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টি থাকা খুব স্বাভাবিক। *

তা যাক্। শ্রীজীবের দ্বিতীয় গ্রন্থ মাধব-মহোৎসব মহাকাব্য। তাতেও তিনি দেখিয়েছেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধটি দাম্পত্যের—

অধিক্ষিতি ভূদা সনং রুচিভয়েন তৌ দম্পতা
পুরো গিরি হরিন্মণি প্রকরচন্দ্র লেখারুচঃ।
বলাদ্দহরতাং যথা মকর কেতনঃ স্বস্থিতিং
বিহায় সহসা বহুমুহুরবাধ নিঃসীমতাম্॥ ৯ম উল্লাস। ৮২ শ্লোক।

অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা ক'রে রাজদম্পতী যেমন শোভা প্রাপ্ত হন, তেমনি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ দম্পতি নৃপাসনে উপবেশন ক'রে কান্তি রাশি বিস্তার ক'রে, উদয় পর্বতস্থ মরকত মণিসমূহ ও চন্দ্রদেবের কান্তিরাশিকে হরণ করার মত নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ ক'রতে লাগলেন।

এর পর প্রশ্ন ওঠে, শ্রীজীবের মত আচার্য এবং শ্রীসনাতন এবং আচার্য শ্রীরূপও কি ব্রজের রস পরিপাটি লীলাটিকে স্বকীয়া ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন?

এর উত্তরে শ্রীজীব বলেছেন হ্যাঁ—তাঁরাও তাই প্রতিপাদন ক'রেছেন।

(১) শ্রীভাগবতের ১০ম। ৪৭ অধ্যায়। ২১ শ্লোক—

অপি বত মধুপুর্য্যাং আর্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে

তাতে শ্রীসনাতন ব'লেছেন—আর্যস্য গোপেন্দ্রস্য পুত্রঃ অস্মৎ স্বামীতি—"শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের স্বামী বলেই তাঁকে তাঁরা আর্য্য পুত্র ব'লেছেন।

"স এব অস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অন্যস্তু লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ"। শ্রীকৃষ্ণই আমাদের বাস্তব পতি, অন্য যা, তা হোলো লোক প্রতীতি মাত্র।

(২) শ্রীভাগবত ১০।৪৬।৪ থেকে

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠং আত্মানং মনসা গতাঃ।

---

* (এ কথা লিখে জানিয়েছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রাম ও ডাক ঘর কুড়মিঠা। বীরভূম।)

প্রত্যাগমন সন্দেশৈঃ বল্লব্যঃ মে মদাত্মিকাঃ ॥
ধারয়ন্ত্যতি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ॥

আচার্য্য শ্রীসনাতন—'মাং দয়িতং নিজপতিমিতি, নতু পাণিগ্রহীতারং গোপম্ ত।'

অতএব ব্রজ রমণীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পতি পত্নী সম্বন্ধটি নিত্য। (শ্রীসনাতন ও জীবের স্পষ্ট অভিমত)

শ্রীরূপের অভিমতও নিত্য দাম্পত্য। পরকীয়া ভাবটি মায়িক। শ্রীরূপের প্রদত্ত : নির্দেশগুলি অনুসরণ ক'রে বাংলায় ও ব্রজে ভজন সাধন প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। ন্তু এই অভিমতের ভিত্তিকে দুর্বল করে রেখেছে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পরিবেশনের ীর দ্বারা। কারণ, শ্রীরূপের প্রদর্শিত পথই যদি তাঁদের অনুসরণীয় হয়, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাকে রূপান্তরিত ক'রে ব'লেছেন—আসলে ওটি শ্রীরায় রামা- নন্দরই পথ ও মত। কারণ, শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি-রস বাদের সব শিক্ষাই তো রায় মানন্দের কাছ থেকে পাওয়া—

(১) রামানন্দের পাশে—

চৈ চ ২।১৯

(২) রামানন্দ রায় কৃষ্ণ রসের—

চৈ চঃ অন্ত্য—৭ম পরিচ্ছেদ।

(৩) এই সব শিক্ষাইল ঐ ৭ম।

কিন্তু আচার্য্য শ্রীরূপ তাঁর ললিতমাধব নাটকের ১০ম অঙ্কে পরিস্কার দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার লীলাটি নিত্যকালের স্বকীয়া এবং দাম্পত্যলীলা।

ব্রজ লীলার যাঁরা অভিনব ধারার ব্যাখ্যাকার, যাঁরা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত ভক্তি থর আচার্য্য, যাঁরা গৌড় নীলাচল বৃন্দাবনে উদ্ভূত বৈষ্ণব ধর্মের পথ প্রদর্শক, যাঁরা াড়ে বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারার নবতম উজ্জীবক, সেই শ্রীজীব, শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি চার্য্য বৃন্দের কেউই বলেন নি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ লীলাটি ঔপপত্য প্রকটনের াহার।

বিশেষ করে শ্রীজীবের দর্শন ভিত্তিক আলোচনায় দেখা যায়—

(১) শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দের কোন লীলারই কেউ নিয়ামক নাই। ও লীলা পরতন্ত্র নয়। ও লীলা মানবের আচরণের মত নির্দিষ্ট নিয়মেও নিয়ন্ত্রিত ।

ও লীলাটির রসোৎকর্ষ বাড়াবার জন্য চিন্ময় জগতের একটি মহা শক্তিশালী ব।

মানব সমাজে পরকীয় ভাবটি রসাভাস যুক্ত। ওটি দৃষ্টান্তের অন্তর্গতই নয় ব্রজ- াপীবৃন্দ।

সাধারণ উপ-পতির যে সব লক্ষণ, সেগুলির কোনটিই প্রযুক্ত হ'তে পারেনা শ্রীকৃষ্ণে। র যেটি নিত্যলীলা তাতেও পরকীয়তা নাই।

শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় যোগমায়া দ্বারা রস বিশেষের পরিপোষণের জন্য প্রকট লীলায়

ঔপপত্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ব্রহ্মমোহন লীলাটিও তাঁর মায়িকলীলা।

(২) শৃঙ্গার রসে ঔপপত্যটি রসাভাস জনক। শৃঙ্গার রস শুচি শব্দের পর্যা সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে কোষ অভিধানে। অতএব শুচি ও উজ্জ্বল রসটি ঔপপত্যে যু হ'তে পারে না। সেই জন্য সেই উজ্জ্বল রসটি কি বস্তু, তাকে বি'দিত করার জ জীবকে পবিত্র করার জন্য, শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আবির্ভাব। তি সেই পবিত্র উজ্জ্বল রসটি সমর্পণ করেছেন এই ধারায়। আমার প্রভু শ্রীরূপ ও ব'লেছেন—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াব তীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বিদগ্ধ মাধব ১/২।

এখানে 'শচীনন্দন' এই মাতৃ নামের উল্লেখের উদ্দেশ্য পরম কারুণিকত্ব জ্ঞাপ জন্য। মাতৃ নামের অভ্যন্তরে পুত্রের নাম উল্লেখও রসাভাসকত্ব নিবারণের জ গৌরাঙ্গ স্বরূপে রসাস্বাদন উজ্জ্বল রস। রসে ঔপপত্য যেমন নিন্দনীয়, তেমনি শব্দের প্রয়োগেও পাপপতির জনকত্ব ঘটায়।

(৩) নাট্য অলংকার শাস্ত্রে ঔপপত্যের নিন্দাই করা হ'য়েছে। সাহিত্য দর্পণে বলা হয়েছে "উপনায়ক সংস্থায়াং মুনি গুরু গতায়াঞ্চ ! বহুনায়ক বিষয়ায়াং রতৌ চ ত অনুভব নিষ্ঠায়াং। প্রতিনায়ক নিষ্ঠত্বে তদবদ্ অধম পাত্রতির্য্যক আদি গতে শৃঙ্গারে নৌচিত্য মিতি।

আচার্য্য শ্রীজীবের রস ও অলংকারেরও একটি গ্রন্থ আছে, তার নাম "ভক্তিরসা শেষ।" এটি ছাপাও হ'য়েছে,। এটি সাহিত্য দর্পণের বিশেষ বিশেষ অংশকে সং ক'রে তিনি গ্রন্থটি রচনা ক'রেছেন।

(৪) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন "ঔপপত্য খুব নিন্দনীয়"—

"অস্বর্গ্যং অযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ।"

শ্রীভাগবত ১০।২৯।২৬

* এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখোচ্চা বলে প্রচারিত কয়েকটি শ্লোকে, যা নাকি "শিক্ষাষ্টক" বলে প্রচারিত, তার মধ্যে শ্লোকটিও আছে—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণ নাথস্তু স এব নাপরঃ।

শ্লোকটি রসাভাব দোষে দুষ্ট। এধরণের একটি শ্লোকের রচয়িতা শ্রীগৌরাঙ্গ হ'তেই পারে না।

আবার এইটিকে ভিত্তি করে শ্রীকবিরাজের নামে দীর্ঘ ত্রিপদী কবিতা ফাঁদা—
ামি কৃষ্ণপদ দাসী ; তিহো রস সুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।"

(৫) শ্রীভাগবতের ১০।৩৩।২৮ শ্লোকে পরীক্ষিত মহাশয় ব'লেছেন—
"আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্? এর টীকায় শ্রীজীব ব'লে
ন—"পবিত্র ও উন্নত শৃঙ্গার রসটিকে আচ্ছাদন ক'রেছে মনে ক'রেই পরীক্ষিতের
ন্দহ।"

(৬) শাস্ত্রে উপপত্যের ভূরি ভূরি দোষ দেখান হ'য়েছে ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা
ইসব দোষ কখনই আচরিত হ'তে পারে না। এ সব দোষ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রাকৃত
য়কেই ধর্ত্তব্য। পবিত্র ও উন্নত মধুর রস বিশেষের আস্বাদনের জন্যই তাঁর
বতার।

(৭ গোপীবৃন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য দাম্পত্য। পরম লক্ষ্মী দেবীদের নিত্য
ম্পত্য ভিন্ন অপর ভাবই নাই। প্রাপঞ্চিক প্রকট লীলায় গোপীদের সঙ্গে পরদারত্ববৎ
লাটি যোগমায়া বিজৃম্ভিত।

(৮) গোতমীয় তন্ত্রের শ্লোকেও বলা হ'য়েছে "অনেক জন্ম সিদ্ধানাং পতিরেব সঃ
ন্দ-নন্দন ইত্যুক্ত ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনম্।"

তা ছাড়া শ্রীভাগবতের—১০।৩৩।৩৫ শ্লোকেও গোপীনাং তৎ পতীনাঞ্চ সর্বেষাং চৈব
হিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্॥

(৯) লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর গণের পরকীয়াত্বই হয় না। শ্রীকৃষ্ণবল্লভার গণ লক্ষ্মী। এ
ম্বন্ধে দৃষ্টান্তের দ্বারা বলা যায়—কৌরব ও পাণ্ডবগণ মৌলিক দৃষ্টিতে সকলেই কৌরব,
থাপি তাঁদের আখ্যা ভিন্ন, সেই রূপ গোপী শব্দ ও লক্ষ্মী শব্দ এ দুটি মৌলিক লক্ষ্মী-
ব্দ, অর্থেও তাই অভিন্ন। অতএব গোপিদের পরকীয়াত্বই হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদিকে
অখিল লোকলক্ষ্মী বলে বহুবার সম্বোধন ক'রেছেন। লক্ষ্মী—লক্ষ মন্ [মনিন্] ছান্দস।
চিহ্ন।

তবুও তাঁর প্রকট লীলায় যোগমায়ার চমৎকারিত্ব সৃজনেই এবং লীলামাধুরী আস্বা-
দনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের সম্বন্ধ ঠিক যেন পতি পত্নীর সম্বন্ধ নাই।

(১০) বহু বারণতা, প্রচ্ছন্ন কামুকতা, পরস্পর সঙ্গম দুর্ল্লভতা প্রভৃতি কার্য্য কারণ
চেষ্টাগুলির যে সব উল্লেখ রস শাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রাকৃত লৌকিক সমাজেই
প্রযোজ্য।

(১১) সমর্থা রতিতে নিবারণাদি না থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্গার রসের যথেষ্ট পুষ্টি হয়।
তাতেও মাদনাখ্য মহাভাবের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ঔপপত্যটি শ্রীকৃষ্ণ-
লীলায় প্রযুজ্যই হয় না। [শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, শ্রীজীব]

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এবং তাঁদের অনুগত
শ্রীজীবের দার্শনিক ও লীলাবাদিক অভিমতগুলি সংক্ষেপে দেখালাম। তাঁরা
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "রসশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বরের ঔপপত্য ও পরকীয়াত্ব সম্ভবই
নয়।

অতএব তাঁদের অনেকের অনুগত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁদের গ্রন্থাবলীর

অভিমত গুলি জেনেও, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনই সেই সব মতবাদকে উপে
ক'রে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া রসলীলাবাদ স্থাপনের প্রয়াস ক'রতেই পারেন না ; এ
তাতে বর্তমান প্রচলিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটিতে শ্রীচৈতন্য দেবকে রায় রাম
নন্দের দ্বারা সহজিয়া বৈষ্ণবের ভক্তিরস বাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব'লে ব্যাখ্যাও ক'র
পারেন না।

তা সত্বেও প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় তিনি তা ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনে
তাঁর উক্তিগুলিতে এমন কৌশলে পরকীয়া বাদের প্রচারের বাক্ চিত্ররূপে উপস্থাপি
করা হ'য়েছে, যার ফলে ভারতীয় পবিত্র ভাগবতাশ্রয় সম্পন্ন গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের উ
গাতা শ্রীচৈতন্যদেবকে জনজীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে, একটি সাম্প্রদায়িক সহজিয়া বৈ
ধর্মকেই যেন প্রচার ক'রে গিয়েছেন, আর সেই সহজিয়া বৈষ্ণব জয়দেব, বিদ্যাপ
চণ্ডীদাস, রায় রামানন্দকেই আদর্শ ক'রে, তাঁর সমগ্র জীবনটি সেই পরকীয়া লীলা
আস্বাদন ক'রে ক'রে, ভাবোন্মত্ত দশায় অতিবাহিত ক'রেছেন। এমন চিত্র কিন্তু অ
জীবনীকারেরা আঁকেন নাই।

অতএব ব্রজের বৈষ্ণব আচার্য্যদের অভিমত এবং শ্রীচৈতন্যের জীবন ও তঁ
অভিমত যে অভিন্ন, সেটিকে বদলে দিয়ে এবং সহজিয়া মতটিকে স্থাপন করার জন্য দা
বর্তমান প্রচলিত এবং বাংলার জন মানসে অসমোর্দ্ধ প্রভাব বিস্তারী এই শ্রীচৈত
চরিতামৃত গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "প্রশস্তি" রচনা ক'র
গিয়ে শ্রীমুকুন্দ দাস এবং শ্রীউদ্ধব দাস যে অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন—

গোঁসাই রূপ সনাতন বড় শিষ্য দুই জন
আর ভট্টযুগ শ্রীজীব গোঁসাই।
সবে তাঁরে দয়া কৈল সর্বতত্ত্ব জানাইল
ত্রিভুবনে যাঁহা সম নাই॥
সেই সূত্র বৃত্তি করি নিজ গ্রন্থ বিবরি
তাহে হৈল চরিতামৃত নাম।
সুদয়া করুণা হৈলে জগৎতারিলা হেলে
নিজ গ্রন্থসুধা দিয়া দান॥
কত মূর্খ বিদ্যাহীন কু-বিষয় নীচ দীন
যোগী ন্যাসী কর্মনিষ্ঠের গণ।
গ্রন্থ আস্বাদন করি নিজ নিজ মত ছাড়ি
সব হইল জগত পাবন॥
হেন গোঁসাইর অনুক্রম যে না জানে সে অধম
জগতে রইল লৌহপিণ্ড।
মুকুন্দেরে দয়া কর কর নিজ সহচর
ভববন্ধ করি খণ্ড খণ্ড॥

আর একটি প্রশস্তি—

শ্রীচৈতন্য রস পূর কৃষ্ণ লীলা সুকর্পূর
দোহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে ইহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য্য ॥
কবিরাজের পয়ার ভাবের সমুদ্র সার
অল্প লোকে বুঝিবারে পারে।
শাস্ত্রের প্রমাণ যার লোকে মানে চমৎকার
যুক্তি মার্গে সবে হারি মানে।
উদ্ধব মূঢ় কুমতি কি হবে তাহার গতি
কবিরাজ রাখহ চরণে ॥

এই দুটি প্রশস্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করার সময়েও মনে হয় না যে, প্রশস্তি রচয়িতারা ৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃতে পরকীয়া বা সহজিয়া রসের আমদানী দেখেছেন ।। যদিও তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণদাসকে) "গোঁসাই" সম্বোধন করে একটা সন্দেহের কীলক াছেন।

আর, ওর দ্বারা এও বোঝা যায় না যে, শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীবের মতবাদকে অবজ্ঞা র সহজিয়া ধারায় যে সব প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখা যাচ্ছে, আজকের শ্রীচরিতামৃতে, সেগুলি বিরাজের রচিত কি না।

অথচ এই বিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী, যাঁরা গৌড়ের সেই বৈষ্ণব ধর্মটিকে বহন ়ছেন, ধারণ ক'রে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত, উচ্চশিক্ষিত গৃহী, ামী উপাধি ধারী পুরুষ, ভাগবতধর্ম ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত, বৈষ্ণব ধর্মে প্রবীণ সাধুও ছন। তাঁদের মধ্যে এ ধরণের কোন সন্দেহই জাগে না যে, সত্যিই কি শ্রীকৃষ্ণদাস রাজের প্রথম লেখা শ্রীচরিতামৃতটি কি অদ্যাপি তেমনিই আছে? না কি প্রক্ষেপ ল্যে ভরা সেই অংশগুলি এসে পরবর্ত্তিকালে জুড়ে গিয়েছে?

এই সন্দর্ভ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে দেখিয়েছি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা চতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যে "স্বরূপ দামোদরের কড়চা" নামক একটি অজ্ঞাত ্যাত গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকে এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের মিলনের বক্তব্য, তদ্‌ভিত্তিক মতবাদের অস্তিত্ব যদি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মূল ব্যক্তব্যে নিহিত ক এবং তাকেই বৃন্দাবনের আচার্য্যদের অভিমত ব'লে প্রচার করার সুদীর্ঘ কালের স হ'য়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে সব অংশ প্রক্ষিপ্ত।

অথচ খুব স্পষ্ট যে, সেই সব প্রক্ষিপ্ত অংশের মৌলিক দৃষ্টি পরকীয়া বাদ। একটু গেই দেখলাম ব্রজের বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এমন পরকীয়াবাদের কোন কথাই প্রচার ান নাই বরং বিপরীতই ক'রেছেন।

তাই বলতে হয়, সেই সব পরকীয়া বাদের প্রবেশ ব্রজের আচার্যদের পরেই ঘ'টেছে, ন সুস্পষ্ট অভিমত লোকান্তরিত বৈষ্ণব পণ্ডিত ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও তাঁর াদিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকায় ৩৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"শ্রীজীব যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন, এবং তাহার প্রায় শত বৎসর পর্য্য শ্রীজীবের উল্লিখিত স্বকীয়া বাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে, কেহ কোনও আপত্তি উত্থাপ ক'রেছেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না ; কিন্তু প্রায় শত বৎসর পরে শ্রীপা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে এবং সম্ভবতঃ তারও কিছু পূর্বে একটা বিরুদ্ধ মত জেগে উ ছিল ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায়।"

স্বকীয়া বাদের বিরুদ্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যদি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে পরকীয়া বাদ স্থাপন করারই প্রয়াস পান, তা হ'লে সাধারণ শিক্ষিত, সরল সাধু ব্যক্তিরা কি অ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার ধৈর্য্য সঞ্চয় ক'রতে পারেন ?

তেমনি অবিবেচনাটিই একদিন পুরুষানুক্রমে বা বংশানুক্রমিক রোগের মত রক্তে র সংস্কার সৃষ্টি করে। যা আজ ক'রেছে—এবং সেই অবিবেচনা প্রসূত সংস্কার এত জাগ্রত হ'য়ে আছে যে, সুপ্রাচীন আচার্য্যদের মতবাদের কথা তুললেই তা বলেন—

(১) আবহমান কাল চ'লে আসছে, কেউ এ গ্রন্থের কোন প্রতিবাদ করেনি, তা কি মূর্খ ছিলেন ?

(২) এসব প্রতিবাদ যারা করে তারা সম্প্রদায়ের শত্রু এবং অপরাধী।

(৩) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতের বিরুদ্ধে বলা মানে অপব্যাখ্যা ক তাঁকে অপমান করা।

(৪) অমুক বাবাজী, অমুক ডক্টর অধ্যাপক, অমুক গোস্বামী, অমুক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে বুকে ধ'রে কেঁদেছেন, তাঁর অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃ বলেছেন "গোস্বামীদের মর্মসার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" এ সবই কি মিথ্যা ?

(৫) প্রক্ষিপ্ত বলা এবং সমালোচনা করা মানেই অমার্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ ক ইত্যাদি।

[এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত বন্ধনীর কথাগুলির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য কয়ে পত্র পত্রিকার এবং চিঠির অভিমত এই গ্রন্থের সঙ্গেই মুদ্রিত করেছি]

এবার দেখাই ব্রজভূমির সেই বৈষ্ণব আচার্য্যদের মতবাদের বিরুদ্ধে পরকীয়া বাদ প্রবেশের কলা কৌশল॥

শ্রীকবিরাজের লোকান্তরের অব্যবহিত কাল পরেই পরকীয়া বাদের প্রক্ষিপ্ত অ গুলি গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করেনি। শ্রীকবিরাজের শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস গোস্বা একখানি টীকা লেখেন শ্রীরূপের রচিত উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক রসগ্রন্থের।

টীকার শেষে একটি শ্লোকে জানিয়েছেন ওটির সমাপ্তি কাল -

সম্বৎসরে বাজি রসর্ত্তু চন্দ্রে
বৃষস্ত সূর্য্যাসিত পঞ্চদশ্যাম্।

অর্থাৎ ১৬৬৭ সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এ টীকা সমাপ্ত হোলে অর্থাৎ ১৫৩২ শকাব্দে বা ১৬১০ খৃষ্টাব্দে।

তখন সবে মাত্র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচনা শুরু। হয়তো বা কিছুটা এগিয়েছে তখন তিনি লিখ্ছেন আমার শিক্ষাগুরু শ্রীকবিরাজ আনন্দিত হোন। তিনি আম

র্বর। বিদ্বদ্-বৃন্দের দুর্বোধ্য এই পথে আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হয়েও শ্রীকবিরাজের করুণায় টি লিখতে সাহসী হ'য়েছি। মহাকরুণাশালী শ্রীরূপ প্রভু মাদৃশ মূঢ় জনের প্রতি করুণা ল্যাণের জন্যই নিগূঢ়-ভক্তি পথে রাগানুগ সাধনের পথ দেখিয়েছেন।

শ্রীরূপ প্রভু বলেছেন—

অতুলত্বাৎ অপারত্বাৎ অপ্রাপ্তো অসৌ দুর্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টং পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া।

র্থাৎ সমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে আছি, উদাসী হয়ে, রস সমুদ্রে প্রবেশ ক'রতে পারি াই। ও সমুদ্র অতুল অপার।

এরই টীকায় বিষ্ণু গোস্বামী ব'লেছেন "অস্য ভগবৎ-রসস্য অপ্রাকৃতত্বাৎ ন কৈরপি য়ত্তা নিরূপয়িতুং শক্যতে।

শ্রীভগবানের রস মাধুরী অপ্রাকৃত। তার ইয়ত্তা করা সম্ভব নয়। তবুও যে ইয়ত্তা ন কেবল তাঁর করুণাবাসিত হৃদয় স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে করুণা করে যতটুকু আস্বাদন করান।

উজ্জল নীলমণি গ্রন্থের রস ব্যাখ্যাটির তাৎপর্য্য লিখতে গিয়ে আচার্য্য যুগলের মন্তব্যটি নুধাবন ক'রেছেন পরবর্তিকালের পণ্ডিতরা।

কিন্তু শ্রীবিষ্ণু গোস্বামীর টীকা লেখার বহু পূর্বেই শ্রীজীবও ঐ উজ্জ্বল নীলমণির কথানি টীকা লিখেছেন, তার নাম রেখেছেন 'লোচন রোচনী।"

শ্রীরূপের অভিমত কি? পাছে তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ঢুকিয়ে দেয় অথবা ল্টো পাল্টা ক'রে বোঝাতে যায়, তাই তার একটা শক্ত বাঁধন দেবার জন্য—"শ্রীকৃষ্ণ ন্দর্ভ' এবং শ্রীগোপাল চম্পূ" রচনা ক'রেছেন। উজ্জল নীলমণির টীকাতেও ওই কথা লখেছেন—

"ভক্তি রসের চরম আস্বাদন যে মধুর রসে তাহ'লে সেটির ক্ষেত্র কি?

এই প্রশ্নের অবতারণা ক'রে শ্রীজীব ব'লেছেন—

"নির্ধূত দোষত্বাৎ এব প্রসন্নত্বং শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাবির্ভাবযোগাত্বং, ততশ্চোজ্জ্বলত্বং দাবির্ভাবাং"

সাধন ভক্তির প্রভাবে অনর্থাদি দোষগুলি নিঃশেষে দূর হ'লেই চিত্ত প্রসন্ন হবে, ঐ সন্ন চিত্তেই শুদ্ধ-সত্ত্ব বিশেষের আবির্ভাব হবে।

আর শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হলেই চিত্তে উজ্জ্বল রসের বোধ হবে। [উজ্জল, শুচি, বিত্র, এগুলি অর্থব্যঞ্জক পর্য্যায়]

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত অত্যাশ্চর্য্য অমায়িক নিত্য স্বকীয় লীলাটিই যোগমায়া জৃম্ভিত পরকীয়বৎ আস্বাদন" এইটিই প্রকটিত ব্রজভূমিতে। উজ্জলরসের আস্বাদনের ক্ষত্রটি লৌকিকই নয়। এ সিদ্ধান্ত শ্রীজীবের স্পষ্ট।

কিন্তু সেই স্পষ্টবাদের অন্তরালেই এমন এক কৌশল ঢোকান হ'য়েছে, তাঁর অবর্ত্তমানে, ক যেন দিনের আলোতেও সংস্কার ভীত মানুষের বিশেষ স্থানে এলেই, কিংবা াবনা করলেই ভয় হয়, তেমনি একটিসংস্কার সৃষ্টি করা হয়েছে, শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীবের সিদ্ধান্তবাদকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পরকীয়া বাদের অভিসার করিয়ে—

সেই অভিসারটিকে ভক্তিরসবাদের ওড়না পরিয়ে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকথার বাচন

ভঙ্গি ফুটিয়ে। একেই প্রক্ষিপ্তবাদ বলা যায়। এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুশীলন করা ছাড়া তাকে ধরা কঠিন। যাঁরা ভাব সিদ্ধ, ভাব সাধক বৈষ্ণব মহাপুরু তাঁদের চরম কাম্যের রূপটি তো মূক, অতএব তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীজীব প্রভৃতির দার্শনি চিন্তাধারার অনুশীলন করা যায় না, তবে এইটুকু ধরা যায় যে, ঐ সব মহাপুরুষ কো ধারায় অনুশীলনের ভাবা প্রকাশ করেছেন। তাতে যদি আচার্য্যদের ভাষার সঙ্গে মিল হয়, তবেই বোঝা যায়—এটি স্বতন্ত্র।

পরকীয়া বাদের অনুপ্রবেশের প্রথম ধাপটি কি ভাবে ঘটেছে সেটুকু দেখাই—

উজ্জ্বল নীলমণির যে টীকাটি শ্রীজীব লিখলেন, তার শেষে এই শ্লোকটিকে ঢুকি দেওয়া হোলো…

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎপূর্বাপর সম্বন্ধং তৎপূর্ব্ব মপরং পরম্॥

অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত যা কিছু লিখলাম তার সবটাই আমার অভিমত নয়। কিছুটা আম কিছুটা পরের ইচ্ছায়। যার সঙ্গে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকছে তাই আমার মত, অ যার সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে না, তাই অপরের ইচ্ছায় লেখা ব'লে ধ'রে নেবেন।

আশ্চর্য্য! যিনি গৌড়ের বৈদিক ভাগবতাশ্রয়ী পবিত্র উজ্জ্বল বৈষ্ণব ধর্মের শ্রে অধিরক্ষক, যিনি শ্রীগুরু শ্রীরূপের করুণায় প্রাণের অধিদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ বলে নিশ্চল নিষ্ঠায় মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছেন, তিনিই এমন ছেলেমানুষী আলগা কথা লি নিজের অভিমতকে শিথিল ক'রতে পারেন? এও বিশ্বাস করার জন্য ঐ শ্লোকটি আজও পবিত্র ভাগবতের রসবাদের আকর গ্রন্থে মুদ্রিত করা হয়?

কিন্তু পরকীয়ারসের সংস্কার যাঁদের বেশ গাঢ়, বিশ্বাস না করেই বা তাঁদের উপায়?

ওটি যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থের টীকা আন চন্দ্রিকার প্রথমেই র'য়েছে; আর র'য়েছে তাঁরই রচিত শ্রীভাগবতের টীকায় তা হ'লে?

এই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় কিন্তু শ্রীজীবের "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ" গ্রন্থ অবশ্যই অধ্য করেছেন, তাতে স্পষ্টই দেখেছেন শ্রীজীব বলছেন "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীদের স্বরূপ স্বকীয়া ভাব সম্বন্ধ এবং সেটি দাম্পত্য সম্বন্ধ, তবুও রসনির্য্যাস, রস পরিপাটির উদ্দে কেবল প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের নিত্য দাম্পত্যের মধ্যেই যোগমায় নূতন এক মাধুর্য্যের বিজৃম্ভন। সেটি মায়িক।" প্রযত্নেন উপাদানাৎ প্রতীতিমাত্রমিতি

অপরদিকে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের লীলা বিশ্লেষণের ধারায় স্পষ্ট লক্ষ্য ক যায়, তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত পরকীয়া বাদের মুখ্যত্ব স্থাপন ক'রেছেন; শ্রীজীবেরই স্বকীয়াবাদের বিরুদ্ধে, সেটিকে এক বিপ্লবপরিকল্পনা বলা যায়। আরও দে যায়, শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লেখা ব'লে প্রচারিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনেক শ্লোকে সংস্কৃত টীকাটির নামও আনন্দ চন্দ্রিকা।

সমগ্র গ্রন্থের উপর অর্থাৎ বাংলা ভাষায় পয়ারগুলির উপরও আনন্দচন্দ্রিকা টী আছে ব'লে এমন একটা কিংবদন্তীর প্রচারও বেশ আছে। কিন্তু তা কেউ দেখেনও

এবং দেখাতেও পারেন না। শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধৃত ভাগবতীয় শ্লোক এবং তথাকথিত স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামে প্রচারিত কল্পিত পুঁথির শ্লোক কয়টিতেই তাঁর টীকা দেখা যায়।

তা যাক্। এখন দেখাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরকীয়া বাদের সমর্থনে যে সব রচনা, তা কেমন করে শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের স্বকীয়া বাদের বিরুদ্ধে যায়—

(১) শ্রীজীবের গোপাল তাপনীর ব্যাখ্যায় অর্থাৎ স্বামী শব্দটির ব্যাখায় তিনি ব'লেছেন স্বামী শব্দটি পরিণেতৃ বাচক, আর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেছেন স্বামী শব্দ ঐশ্বর্য্য বাচক। পাণিনির উক্তি "স্বামিন্নৈশ্বর্যে।" লোক প্রয়োগও তাই "লোকে হি যস্য যঃ স্বামী ভবতি, স তস্য ভোক্তা ভবতি।"

অতএব শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতটি শ্রীজীবের অভিমতের বিরুদ্ধেই গেল। কারণ শ্রীজীব বলেছেন স্বামী শব্দটি গোপীদের ক্ষেত্রে মুখ্যার্থেই গ্রহণ করা হয়, গৌণার্থে নয়। শ্রীবিশ্বনাথ তাকে গৌণার্থে গ্রহণ ক'রলেন।

পরকীয়া বাদের প্রতিষ্ঠায়

(২) শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনী শক্তি, তাতে কার সন্দেহ? অতএব সেই হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিতা রাধাকৃষ্ণই আমাদের ভজনীয়। লীলা বিরহিত রাধাকৃষ্ণ আমাদের ধারণার অতীত, ভজনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক।

এখানে দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত রাধাকৃষ্ণ লীলাই বক্তব্য।

(৩) হ্যাঁ, ঔপপত্য তো অধর্মস্পর্শি, ঠিক কথা, কিন্তু, যিনি ধর্মাধর্ম নিয়ামক সেই শ্রীকৃষ্ণে এ আশঙ্কার স্থান নাই। প্রাকৃতনায়কে ওসব স্পর্শ করে, কিন্তু যাঁর জৃম্ভন মাত্রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সেই শ্রীকৃষ্ণের এবং অভিন্ন শক্তিস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তিতে এ দোষ হ'তেই পারেনা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যদোষটি দূষণীয় না হ'য়ে ভূষণ হ'য়ে আছে।

(শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির এই অভিমতটির সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব ও লীলার জ্ঞাপক শ্লোকগুলির একটুও পার্থক্য নাই, এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম দিকে বিস্তৃত করে দেখিয়েছি।)

(৪) যাঁরা বলেন অপ্রকট লীলাটি নিত্যদাম্পত্যময়ী, আর প্রকট লীলাটি মায়িক এবং যোগমায়া বিজৃম্ভিত, এ চিন্তা ঠিক নয়। কেননা, সর্বলীলার—মুকুটমণি রাসলীলার আদি, মধ্য, অন্ত্যের মধ্যে পরোঢ়া-উপপতির ভাবেই তিনি বিরাজমান; আর রাস-লীলাটিকে মায়িক ব'লে মনে করাও ভুল; কারণ রাসলীলার প্রত্যেক অধ্যায়েই পর-কীয়াত্ব, উপপতিত্ব প্রতিপাদক শ্লোক দেখা যায়—শ্রীভাগবত—১০'২৯, এবং২০।১০ম ২৯,৮।১০ম।৩০।৪৪।১০ম৩১।১৬।১০ম।৩২।২১—

(১) তা বার্য্যমানা পতিভিঃ—

(২) ভ্রাতরশ্চ পতয়শ্চ—

(৩) যৎপত্যপত্যসুহৃদাং—

(৪) পতি সুতান্বয়—

(৫) মদর্থোজ্‌ঝিত লোকবেদ—

এইসব শ্লোকে শ্রীশুকদেব স্পষ্টতই ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের পরোঢ়াত্ব ও ঔপপত্য।

(৫) যাঁরা বলেন রাসলালা মায়িক, তাহলে লক্ষ্মীগণের তুলনায় গোপীদের উৎকর্ষই থাকেনা, শ্রীভাগবত কি গোপীদের উৎকর্ষকেই প্রাধান্য দেন নাই? নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ শ্রীভাগবত ১০।৪৭।৬০। এই শ্লোকটি তো তাহ'লে নিরর্থক হ'য়ে যায়। এই শ্লোকে ব্রজগোপীদের উৎকর্ষই জ্ঞাপন করা হ'য়েছে লক্ষ্মীগণের চেয়ে। অতএব রাসলীলা মায়া বিজৃম্ভিত নয়।

(শ্রীচক্রবর্ত্তির এই মন্তব্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদির লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৬৩ সংখ্যক পয়ার থেকে আরও দশটি পয়ারের মন্তব্যের আদি আদর্শ। এটি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচনার বহু পরে এসে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছে। এই অংশের পুনঃ স্থাপনাকেও পণ্ডিত বৃন্দের মন খুব অকৃত্রিম ব'লেই গ্রহণ করে আসছে।)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর এই অভিমত এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত ব'লে প্রখ্যাপিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৪র্থ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুটি নারদ পঞ্চরাত্রের ২।৩।৫৫ এবং সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে ২।২২। বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ৪৬।৩৬।৮ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডের ১৫ অধ্যায়ের সঙ্গে অভিন্ন। মাননীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ কি এবিষয়ে অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রতে পারেন না যে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদটির সবটিই প্রক্ষিপ্ত?

(৬) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিমতে শ্রীভাগবতের ওই রাসলীলাটি দাম্পত্যময়ী নয়।

(৭) শ্রীভাগবতের রাস বর্ণনামূলক প্রতিপাদ্য বিষয়টি যদি মায়িক হয় এবং ঔপপত্য বিষয়ক না হয় এবং তারই জন্য যদি সেই শ্লোকগুলি পরিত্যাজ্য হ'য় অথবা দাম্পত্য-বিধায়ক ব'লে ব্যাখ্যা ক'রলে বক্তব্য রাখা হয়, তাহলে রাসলীলার আদৌ কোন উপাদেয়ত্ব থাকেনা; তাতে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—১০।৩২।২২" "ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুসা পি বা।"

ইত্যাদি শ্লোকটিকে তো অবজ্ঞাই ক'রতে হয়, কিন্তু ওই শ্লোকটি তো পরকীয়াত্বের উৎকর্ষ-সাধক এবং বাস্তবানুগ।

(৮) শ্রীভাগবতের যে শ্লোকে "যা মাং ভজন্ দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ" ইত্যাদি সেই বক্তব্যটি তো প্রধান উপপাদ্য এবং পরোঢ়াত্ব ঔপপত্যটি প্রধান মন্তব্যের বিষয়, তাকেও তাহ'লে অবজ্ঞা ক'রতে হয়। যেখানে ব্রজবধূগণ দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছেদন ক'রে শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠতার অনুরাগ প্রকাশ ক'রেছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমের প্রতিদান দিতেই অশক্ত হয়েছেন, অতএব তিনি গোপীদের ঔপপত্য প্রেমে বশীভূত এইটিই নিত্যসত্য, এইটিই রাসলীলার মুখ্য প্রতিপাদ্য। একে মায়া বিজৃম্ভিত ব'ললে সমগ্র রাসলীলাটির তাৎপর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়।

(৯) শ্রীকৃষ্ণ পরম মায়াবী, তাই তাঁর রাসলীলাটিও মায়াময় এই ব্যাখ্যা

ক'রলে পরম মাধুর্য্যের মুকুটমণি শ্রীউদ্ধব মহাশয়কে অবজ্ঞাই করা হয়। কারণ তিনি বলেছেন—

"আসা মহো চরণ রেণুযুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজ স্বজন মার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভি র্বিমৃগ্যাম্॥

এ শ্লোকে যে আর্য পথাশ্রয়ী লক্ষ্মীগণের চেয়ে গোপীগণেরই প্রেমোৎকর্ষ জ্ঞাপন করা হয়েছে তাকেও অস্বীকার করা হ'য়, এই যে তাঁদের অতুলনীয় প্রেমোৎকর্ষ, এর কারণ এই যে, গোপীরা স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রেও শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরাগিনী। তাঁদের স্বজন ও আর্য্যপথ ত্যাগ যদি মায়িক ব্যাপারই হয়, তবে প্রেমের উৎকর্ষের হেতুটিও অবাস্তব হয়; তাতে একান্ত ভক্ত শ্রীউদ্ধবের বাক্যও ভ্রমপূর্ণ হয়। অতএব ব'লতেই হবে আপ্তবাক্যেও অনাস্থাদোষ আপতিত হ'য়েছে শ্রীশুকবাক্যে; কিন্তু তা হ'তেই পারেনা।

(১০) শ্রীকৃষ্ণের নাম নিত্য। এক এক লীলায় তাঁর এক এক নাম। সাধকগণ তাঁর নিত্য লীলাবিশিষ্ট এক একটি নাম গ্রহণ ক'রেই ধ্যান করেন। সেক্ষেত্রে কোন লীলাকে মায়িক আখ্যা দিলে তাঁর নামও মায়িক হয় এবং অনিত্যও হ'য়ে যায়। সুতরাং নাম, অনিত্য লীলা জ্ঞাপক এ সিদ্ধান্ত কখনই সমর্থনীয় নয়। ওতে নামাপরাধ ঘটে।

(১১) বিষ্টর ও অগ্নিসাক্ষ্যে (বিষ্টর = কুশ) বিবাহ হ'য়েছিল গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের, এমন প্রামাণ্য বচন আর্য্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়না ঠিকই। অতএব আপ্তকাম শ্রীভগবানের উপর গোপীদের প্রেমোৎকর্ষটি পরিণীতা রমণীর সঙ্গে, এ সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়।

(১২) যেসব স্থানে পতিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় অর্থাৎ গৌতমীয়তন্ত্রে "অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা" এবং শ্রীভাগবতের ১০ম ৩৩।৩৫ গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ ইত্যাদি স্থলে "পতি" শব্দের অর্থ গতি ব'লে বুঝতে হবে, কারণ কেবল বিবাহিত ব্যক্তিই যে রমণীর পতি হন এমন নয়, নায়িকা প্রকরণে পরকীয়াতেও "স্বাধীন ভর্ত্তৃকা" স্বাধীন পতিকা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ অতীব সিদ্ধ প্রয়োগ।

তাছাড়া এমনও হয়, যিনি কোন নায়িকার পতিরূপে বর্ণিত; কিন্তু অন্য নায়িকার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্বন্ধও নাই। সেখানেও পতিশব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সকলের পতি, একথায় স্পষ্ট অর্থ ওই ভাবেই গ্রহণ ক'রতে হবে। ঋক্ বেদের ১০।২৭।১২ সূক্তে "জারঃ কনীন ই'ব, জারঃ কনীনাং পতি র্জনীনাম্" এ প্রয়োগে তো স্পষ্টই বোঝা যায় অবিবাহিতা কন্যারও পতি হ'তে পারে। এ অতি সিদ্ধ সূক্ত।

(১৩) ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধই চিন্ময়, অতএব অভিমন্যুর সঙ্গে শ্রীরাধার পতিভাব এটিও চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণের লীলাতন্ত্রের মধ্যবর্ত্তিত্ব থাকায় কোন ক্ষেত্রই মায়িক সিদ্ধ হয়না।

এইভাবে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের ভাগবতীয় চিন্তার ধারাটি শ্রীভাগবত গ্রন্থের শ্লোকগুলির টীকা রচনার মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে পরকীয়াত্ব প্রতিষ্ঠা খুব স্পষ্ট হ'য়ে আছে। পূর্বের গোস্বামী আচার্য্যদের ভাগবতীয় মত (শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীবের) এবং তাঁদের প্রায় একশত বৎসর পরে আবির্ভূত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের ভাগবতীয় মত পাশাপাশি

রেখে প'ড়লেই জানা যায়, যেন একই বংশে ধনে মানে সদাচারে বিদ্যায় প্রতিভায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যে কুল প্রতিষ্ঠা ক'রলেন, আবার সেই বংশে সেই কুলে আর একজনপ্রতিভাশালী পুরুষ জন্ম গ্রহণ ক'রে পূর্বের ধারাটি অপসারিত ক'রে সেই কুলের সব কিছুকেই পাল্টে দিলেন।

প্রথমের পক্ষে শেষেরটি হয় প্রক্ষিপ্ত অথবা সংযোজিত। সেই প্রক্ষিপ্ত চিন্তাটিকে যাঁরা আদর্শ করেন, তাঁরা পূর্বের মতটিকে বলেন প্রাচীন মত বড় কৌলিন্য ঘেঁষা। বড পাণ্ডিত্যপূর্ণ। লোক সংস্কৃতিতে যা সহজভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে তাই করা উচিৎ, এবং প্রাচীন নবীনে একটা সামঞ্জস্য অবশ্যই স্থাপন ক'রতে হবে।

শ্রীজীবের ভাগবত দর্শনের মতবাদ প্রাচীন। সারা ভারতের বৈষ্ণব ধর্মটির দার্শনিক চিন্তাধারায় এবং সাহিত্য চিন্তাধারায় যাঁরা আচার্য্য, তাঁদের সুচিন্তিত সংস্কৃতি পদ্ধতির তুলনামূলকতায় দেখা যায়, যদি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রবর্ত্তিত ধারাটিকে সরিয়ে রেখে শ্রীজীবের ধারাটিকে সামনে আনা যায়,তাহলে ঐটিকেই প্রাচীন বৈষ্ণবীয় চিন্তার অভিনব রূপ বলা যায়। কিন্তু তাঁদের লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে না ঘ'টলেও অন্ততঃ অর্দ্ধশত বৎসর পর থেকেই লোক সংস্কৃতির অনুরূপ সহজগ্রাহ্য, সহজ সংস্কৃতি বা সহজিয়া কাঠামোতে পবিত্র ভাগবতীয় লীলাবাদের উপাসনা রহস্যটি সমাহিত হ'য়ে যায়। নূতন ধরণে লোক সংস্কৃতি এবং সৌত্রান্তিক বৌদ্ধদের সহজযান, এই দুটি মতের ধাঁচে ঢালাই করে পরকীয়া বাদের আবির্ভাব করা হয়। এটি আরও জোরদার হয় অসাধারণ প্রতিভাশালী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাগবত গ্রন্থের টীকার মাধ্যমে।

তাঁরই অনুসরণে যেসব গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁদেরই ঔপপত্য মূলক ভাগবতীয় ধারার প্রতিরূপ দেখা যায়—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

> বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
> সে সে লীলার করিব যাতে মোর চমৎকার॥
> মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
> যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
> ধর্মছাড়ি রাগে দোহে করিয়ে মিলন।
> কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
> এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
> এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥
> ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
> রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি বর্ণ ধর্ম॥
>
> চৈ চঃ আদি। ৪র্থ পরিচ্ছেদ

এই অংশ শ্রীপাদ শ্রীজীব প্রভৃতির জীবদ্দশায় তো নয়ই অথবা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আমলেও রচিত হয় নাই।

এমন ক'রে লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজভাবে শ্রীকৃষ্ণ লীলার পরকীয়াবাদ রচনার প্রয়াসের ফলে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের জন্য একটি ভূমিকার প্রয়োজন, সেইটিই

প্রস্তুত করা হ'য়েছে, সেটি গোস্বামী আচার্য্য বৃন্দের ভাগবত দর্শনের বিরুদ্ধে মুখপত্র এবং তা এইভাবে—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র নিবাস॥

চৈ চঃ আদি। ৪র্থ।

ষড়গোস্বামীর অনুগামী গোস্বামীগণ ব'লেন ব্রজে পরকীয়া ভাব বা ঔপপত্য ছিল না এবং নাইও, আর গোলোকেও তো নাইই। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর নামে পরবর্তি কালে যোজিত হোলো ব্রজেই পরকীয়াভাব, এর অন্যত্র বাস নাই।

এইটিই লোক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজ ভাবের নিদর্শন সৃষ্টি।

সহজ ভাবে লোক সংস্কৃতিটির আদি বিকাশ শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পূর্বে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সেক্ষেত্রে আদর্শ পুরুষ। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণলীলায় মধ্যে পরকীয়া-রসের সহজ আস্বাদন খুব বেশী ক'রেছেন ব'লেই তাঁদের রচনায় তা ছড়াছড়ি।

এই সময়েই একটি শ্লোক রচিত হয়, যেটির অর্থ "ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনই আমাদের উপাস্য, তাঁর ধাম শ্রীবৃন্দাবন। তাঁরই লীলাটি আমাদের আস্বাদ্য ও উপাসনার, সেই রম্য লীলাটি ব্রজবধূগণের দ্বারা কল্পিত হ'য়েছিল। আর একে প্রমাণ করার গ্রন্থ শ্রীভাগবত, যে ভাগবতে প্রেমই পরম পুরুষার্থ ব'লে নির্ণীত। এইটিই শ্রীচৈতন্যদেবের অভিমত। এই অভিমতেই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর।"

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ ভাগবতং প্রমাণ মমলং প্রেমা পুমর্থো মহান
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

(এই মতবাদিদের মন্দিরে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহের পূজা অর্চনা হয় না।)

তাঁদের সহজ রসটির বর্ণনা অলংকার শাস্ত্রে নিখুঁত। তাতে কিন্তু ভক্তি রস শাস্ত্রের পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপনার প্রয়াসই নাই। অত্যন্ত সহজ ভাবের পরকীয়া রস-ভাবটি কামবাদেরই এবং প্রাকৃত কামনার চিত্রালংকার।

"পীন পয়োধর পরিসর মর্দ্দন চঞ্চল করযুগশালী"।

—শ্রীজয়দেব।

রময়া ময়া সহ মদন মনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং।
প্রথম সমাগম লজ্জিতয়া পটু চাটু শতৈ রনুকূলম।
কিশলয় শয়ন নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃত পরিরম্ভন চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধর পানম্॥

অলস নিমীলিত লোচনয়া পুলকাবলী ললিত কপোলম্।
শ্রমজল সকল কলেবরয়া বর মদন মদাদতিলোলম্।
শ্লথ কুসুমাকুল কুন্তলয়া নখ লিখিত ঘন স্তন ভারম্।
রতিসুখ সময় রসালসয়া দর মুকুলিত নয়ন সরোজম্॥

—শ্রীজয়দেব।

বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুঁহু অধরামৃতে দুঁহু মুখ ভরু॥
দুঁহু তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুন সদনে॥
বিদ্যাপতি সব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুঁহু তৈছে বিহার॥

—বিদ্যাপতি।

পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ।
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সেই লুব্ধ মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥
হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ল পাইল বিলাস॥

—বিদ্যাপতি।

০ ০ ০

লোভে নিঠুর হরি করলহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি।
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবি বন্ধ তোড়ল কখন কে জান।
দেলহে আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি।

০ ০ ০

তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই।
ভনয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
তুহুঁ সে সচেতনা লুবধ মুরারি॥

—বিদ্যাপতি।

০ ০ ০

মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে পসারি চরণ
পরাণ পাইনু বোলে
পরশ করিতে রস উপজিল
সকলি হইনু হারা।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়।
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়॥
—চণ্ডীদাস।

০ ০ ০

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঁয়াই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ॥
চণ্ডীদাস কহে ধনী সব পরমাণ॥
—চণ্ডীদাস।

এইসব পদাবলীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পরকীয়া রসের আস্বাদন এত উগ্র হ'য়ে আছে যে, সহজাত জৈব প্রবৃত্তিটির ভাব অথবা সহজিয়া ভাবের সাহিত্যগুলি সহজ-রসের বা সহজিয়া রসের পাকে ঈশ্বরের কারুণ্য লীলাটি হারিয়ে গিয়ে, জৈব প্রবৃত্তির রসপুলি পিঠে তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। যার ফলে সেই সহজিয়া রসের ছাঁচে ঢেলে পরকীয়া-রসিক সেই শ্রীকৃষ্ণকেই আবার গৌরাঙ্গ সুন্দর নির্মাণ করার তাগিদেই এক অত্যদ্ভুত ভাবনার প্রেক্ষণায় অপ্রস্তুত অলংকারে মণ্ডিত ক'রে কয়েকটি শ্লোক নির্মাণ ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের ভূমিকা প্রস্তুত করা হ'য়েছে।

সেই শ্লোকগুলির রচয়িতা নাকি স্বরূপ দামোদর॥ টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রজে পরকীয়া রস ভোগ ক'রেও তাঁতে পরিপূর্তি হয় নাই। তিনি বাসনা করলেন শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কেমন? ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ পান সেই সুখই বা কেমন?

এই সমস্ত বিষয়ে লোভ হওয়াতেই সেই শ্রীকৃষ্ণ নাকি শ্রীরাধার ভাব নিয়ে আবার দেবী শচীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। যেন চাঁদই উদিত হলেন সিন্ধু মাঝে। চাঁদ শ্রীকৃষ্ণ। আর শচী গর্ভটি সিন্ধুর মত।

শ্লোকটি রস গঙ্গাধরের মতে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকারে রচিত (১) সাদৃশ্য মূলা। (২) কার্য্যমূলা। (৩) কারণমূলা। (৪)সামান্য ও বিশেষা। এই পাঁচ প্রকারে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকারের উৎপত্তি) আর কাব্য প্রকাশের মতে "যথা সংখ্য ক্রমণৈব

ক্রমিকাণাং সমন্বয়ঃ" এই লক্ষণে যথাসংখ্য অলংকারে রচিত। এ অলংকারটির ভিত্তি যৌবনোদ্‌গমে অথবা তারুণ্যে "শীল সৌন্দর্য্য বল কান্তি লোভিতা।"

তা যাই হোক, পরকীয়া রসে যে যৌবন তারুণ্যে নায়কের লোভোৎপত্তি হয় নায়িকার প্রণয় গভীরতায়, সেটি সহজ রসের ভাবনায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আলংকারিক বৃন্দ বহু আগে থেকেই জানতেন। আরও জানতেন সহজ রস ব'লে একটি পরকীয়া রসের অস্তিত্ব আছে।

সেই সহজ রসটি অত্যধিক সম্ভোগ প্রয়াস থেকেই জন্ম নেয়।

এ বিষয়ে—৮ম শতাব্দীর মহাকবি দামোদর গুপ্ত তাঁর "কুট্টনী মতম্" কাব্যের হারলতা ও সুন্দর সেনের চরিত্রের মাধ্যমে ব'লেছেন—

"প্রারম্ভএব তাবৎ প্রজ্বলিতো ধগিতে মনসিজো যস্মিন্।

তস্য বিশেষাবস্থা বক্তুমশক্যাঃ প্রবৃদ্ধস্য ॥ ৩৮১ থেকে অর্থাৎ নায়কের সম্ভোগ ইচ্ছার প্রারম্ভে ধগ্ ধগ্ করে মন্মথের আগুন জ্বলে ওঠে। সে সময় তার মনের অবস্থা যে কি হয় তা বলা যায় না।

"সহজ রসেন জড়ীকৃতমিতি যুনোঃ

কামশাস্ত্র নির্ণীতে।

নানা কারণ গ্রামে লালিত্য মবাপ

পাণ্ডিত্যম্ ॥ ৩৮২ শ্লোক

অর্থাৎ যখন সহজ শৃঙ্গার রসে অভিন্নমনা হ'য়ে যায় নায়ক নায়িকার মন, তখন কাম শাস্ত্রের অনুমোদিত পাণ্ডিত্য থেকে নানা প্রকার -রতি বন্ধনে এমন ভাবে তারা জড়িয়ে থাকে, যা সকল ভাষার অবক্তব্য হ'য়েও, পরম লালিত্যময় রূপ পরিগ্রহ করে।

সেই সব রতি বন্ধের মধ্যে—।

কিং রমণীং রমণোহ্ বিশত্যুত রমণং সা ন জানীমঃ।

স্বাবয়বা বগমস্ত প্রকাশং অগমৎ তয়োস্তদা নিপুণম্। ৩৮৭ শ্লোক

অর্থাৎ—সম্ভোগের চরম দশায় নায়ক নায়িকার মনে কোন দ্বৈত ভাবই থাকে না, আমাদের মধ্যে কে নায়ক আর কে নায়িকা তারও কোন বোধই থাকে না। প্রতি অঙ্গে অঙ্গে এমন মিলিত হ'য়ে যায়, যে অপরেও তা জানতে পারে না এবং নায়িকা নায়ক বুঝতে পারে না দেহ সাযুজ্যে তখন অদ্বৈত হয়ে যায়।

এই সহজ শৃঙ্গার রসটিকে আরও পরিস্ফুট করে—"অমরু শতক" কবি আরও সুন্দর একটি কবিতা লিখেছেন—

আশ্লিষ্টা রভসা বিলীয়ত ইবাক্রান্তা প্যনঙ্গেন যা

যস্যাঃ কৃত্রিম চণ্ড বস্ত করণা কূতেষু খিন্নং মনঃ।

কোঽয়ং কাহমিতি প্রবৃত্ত সুরতা জানাতি যা নান্তরং

রস্তং সা রমণী স এব রমণঃ শেষৌ তু জায়াপতী ॥

অতএব এই যে সহজ রসের পরিপূর্ণ নিদর্শন, সেটি দেখে যাঁরা মানব মানবীর সম্ভোগ প্রয়াসের চরম দশার অবস্থাটির কাব্য লিখে গিয়েছেন—তাঁদের চোখে খুব অল্প আয়াসেই নজরে আসবে রায়, রামানন্দের সেই প্রখ্যাত কবিতা—

না হম রমণ, ন হাম রমণী ইত্যাদি, এ কবিতার জন্ম অপ্রাকৃত প্রেমে হয় না, হয় প্রাকৃত ঔপপত্যে বা পরকীয়ায়।

এমন সম্ভোগ শৃঙ্গারময় পরকীয়া রসের মধ্যে করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ পবিত্র ভাগবতীয় লীলাটিকে যাঁরা প্রাকৃত নায়ক নায়িকার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ক'রেছেন তাঁরাই যে 'সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই" ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে আবার বলেছেন—

এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যগুপি করিল তিঁহো রস নির্বাপণ।
তথাপি নহিল তিনে বাঞ্ছিত পূরণ॥
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন

চৈ চ: আদি। ৪র্থ।

তারপর কবিরাজ বলেছেন—এই রস সিদ্ধান্তটি নাকি আর কেউ জানতেন না, তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরিষ্কার ক'রে ব'লেছেন—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত॥
যে বা কেহ অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাইর তেঁহো অত্যন্ত মর্ম যাতে॥

চৈচ:। আদি ৪র্থ।

ভারি বিচিত্র কথা। শ্রীচৈতন্যের অবতারের নিগূঢ় রহস্য জানাবার জন্য শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চার শ্লোক উদ্ধার ক'রলেন অথচ ব'ল্লেন এই রহস্যের মধ্যে যেন প্রাকৃত কামের গন্ধ আছে বলে কেউ যেন মনে ক'রবেন না।

এটি গোপীদের অধিরূঢ় ভাব, বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম, এটি কাম নয়। কারণ—শ্রীরূপ ব'লেছেন—গোপীদের প্রেম দেখতে কামের মত কিন্তু কাম নয়।

গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ় ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥ চৈচঃ। আদি। ৪থ

তথাহি ভক্তি রসামৃত সিন্ধৌ—পূর্ব বিভাগে ২।১৪৩

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম॥
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ চৈচঃ ২।৮।১৭৪

পূর্বেই দেখালাম প্রাকৃত কামনায়, পরকীয়া সম্ভোগের যে সহজ রস, তাতে যে সব বাসনার উদয় হয় নায়কের, অবিকল সেই লোভই উদিত হ'চ্ছে শ্রীকৃষ্ণের? তার বেশীও নয় কমও নয়? তাকেই কবিরাজ গোস্বামীর নামের আড়ালে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকটির লেখক ব্যাখ্যা ক'রলেন যে গোপীদের সেই অপ্রাকৃত কামের বা প্রেমের পরিপূর্ত্তক যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই আবার বাসনার উদয় হয়েছিল এবং সেই বাসনারই পরিণত রূপ শ্রীচৈতন্যদেব?

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈ বা
স্বাদ্যঃ যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনু ভবতঃ কাদৃশং বেত্তি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
চৈচঃ। আদি। ১।৬

এই শ্লোকটি লিখেছিলেন স্বরূপ গোস্বামী—কিন্তু কারও হস্তগত হয়নি। হ'য়েছি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর এবং দীর্ঘদিন পরে তারও টীকা রচনা ক'রলেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ?

এর আগের শ্লোকটিতে ব'ল্লেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আসল স্বরূপ কি ? অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী আবিষ্কার ক'রতে পারেননি।

তাঁদের না পারার কারণ ছিল, তাঁরা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা বুঝেছিলেন—শ্রীরাধা হ'লেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ভূতা হ্লাদিনী শক্তি এবং তিনি নিত্যদাম্পত্য সম্বন্ধে রাধা লক্ষ্মী স্বরূপা আর তিনি পরোঢ়াও নন। আর কখনও অদ্বৈত, কখনও দ্বৈত আত্মা, কখনও দ্বৈ সেই প্রণয় দেহ, কখনও স্বরূপা। আবার অদ্বৈত দেহও হন না। এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে বিকারও নন। এবং সেই প্রণয় বিকারের নাম হ্লাদিনী সংজ্ঞাতেও রাধা ব্যক্ত হন না।

কিন্তু স্বরূপ দামোদর কোন্ প্রমাণে জানলেন শ্রীরাধা হ'লেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে বিকার ? এবং প্রণয় বিকারের নামই হোলো হ্লাদিনী শক্তি। সেই শক্তি একাত্ম হ'য়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। ভিন্ন আত্মা নয়। কিন্তু উভয়ের দেহ ভেদ হয় এমন ভেদ ভূলোকে আগেও হয়েছিল। আবার এক হ'যে গিয়ে অন্য নাম অন্য রূ নিয়ে প্রকটিত হোলো। সে প্রকট শ্রীচৈতন্য নামে। আসলে শ্রীচৈতন্য হ'লেন কৃ স্বরূপ। আর ঐ যে তাঁর গৌর কান্তিটি, ওটি হোলো রাধার ভাব আর রাধার কান্তি জন্য।

শ্রীস্বরূপ দামোদর যে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রতে এমন শব্দার্থ ভাবার্থে অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে পারেন এ পরিচয় কর্ণপূরও জানতেন না তিনি দেখেছিলেন স্বরূপ দামোদরের বিরাট পাণ্ডিত্য ॥ চৈতন্যচন্দ্রোদয় ।৮।১৪ শ্লো দ্রষ্টব্য ।

তেমন পণ্ডিতই কি এই শ্লোকটি লিখেছেন ?

রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ হ্লাদনী শক্তিঃ অস্মাৎ
একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ চৈচঃ। আদি। ১।৫

অর্থাৎ এই যে রাধা ইনি কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিরই আকৃতি এবং সেই শ্রীরাধায়া প্র মহিমা নিয়ে এই শ্লোক। এটি কি স্বরূপ দামোদরের লেখা ? তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের এবং স্বরূপ বর্ণনার জন্য একবার উৎপ্রেক্ষা (শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রণয়...) আবার একব অপ্রস্তুত প্রশংসা (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা) অলংকারের মাধ্যমে এমন লিখ পারেন ? —উৎপ্রেক্ষা অলংকারে থাকে' উপমেয়ের স্বাভাবিক ভাবে স্থিত গুণ ক্রিয়া এবং তৎস্বরূপটিতে উপমান রূপে সম্ভাবনার কল্পনা থাকলে সেটিকেই উৎপ্রে অলংকার বলা হয় (সাহিত্য দর্পণ ১০।৪০)

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহ'লে তাঁর কাছে তত্ত্বগত ও স্বরূপগত নিশ্চিত বস্তুই ছিলেন না ?

শ্রীকবিকর্ণপুর শুধু তাঁর অঙ্গের ঐ গৌর কান্তিটিকে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে বর্ণনা করেছেন।

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবিপুরা সচ্চিদানন্দ সান্দ্রো

......এই সন্দর্ভের ৩৭ পৃষ্ঠা থেকে বিস্তৃত আলোচনা।

তাতে কিন্তু শ্রীস্বরূপ দামোদরের মত এমন আশ্চর্য্যজনক সিদ্ধান্ত বিরোধী কোন কথা নেই। কিন্তু এ শ্লোক দুটিতে—তা আছে। কথাটা খুলে বলি—

রাধা, কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি...ইত্যাদি শ্লোকটি উৎপ্রেক্ষা অলংকারে রচিত। এই অলংকারটি ভগবৎ তত্ত্ব নিরূপণের জন্য কোন ঋষি কোনও দার্শনিক ব্যবহার করেন না, এবং করেন নাই। কারণ—

"বর্ণনীয়স্য উপমেয়স্য পরঃ সদৃশতয়া উপকল্পিতঃ

অর্থাৎ অসম্ভবীয়ঃ অর্থঃ তদাত্মনা তৎস্বরূপেণ সম্ভাবনা উৎপ্রেক্ষা।

উৎ উর্দ্ধংগতা প্রেক্ষা দৃষ্টিঃ প্রতিভা যস্যাম্"

অর্থাৎ বর্ণনীয় উপমেয়ের আর একটি সাদৃশ্যের উপকল্পনা। তার মানে অসম্ভবার্থ বা, তাকেই তদাত্ম বা তৎস্বরূপে সম্ভাবনা করার প্রতিভা থাকে যে অলংকারে।

আরও পরিস্কার ক'রে বলা যায়

"প্রায়েণ পুরুষঃ অয়ং ভবেৎ ইতি সাদৃশ্যাৎ—উপমেয়স্য উপমানত্বেন সম্ভাবনা।

অর্থাৎ প্রায়ই পুরুষঃ এমনি হয়, তাতেই উপমেয়টিকে উপমানের সম্ভাবনার কল্পনা।

এইটি উৎপ্রেক্ষা। এটির সংখ্যা বড় কম নয়। এটির ভেদ ১৭৬ রকম।

১। স্বরূপগত ভেদ—৩২

২। বাচ্য ভেদ—৮০

৩। প্রতীয়মান ভেদ—৬৪

স্বরূপ দামোদর কি তাহ'লে শ্রীগৌর দর্শন, শ্রীগৌর স্পর্শন শ্রীগৌর সঙ্গ, শ্রীগৌর ভাব দেখে শুনে অনুভব করেও সন্দিগ্ধ ছিলেন ? এও কি সম্ভব ? তবুও তিনি স্বরূপ ভেদে এবং প্রতীয়মান ভেদে সন্দেহকেই রূপ দিতে গিয়ে অমন শ্লোক লিখেছেন ? এই কি ভগবৎতত্ত্ব ও ভগবৎস্বরূপের নির্বাচন ?

তবুও যুগ যুগ থেকে ওই শ্লোকটিকে প্রামাণ্য করতে প্রয়াসী হন শ্রীগৌর কৃপা অনুরাগী বা শ্রীগৌর ভক্ত বড় বড় ডক্টর, মহামহোপাধ্যায়, গৃহী, পণ্ডিত, গোস্বামী, এবং গৌরভক্ত সাধকের দল ? কেন ? তবে কি অলংকার শাস্ত্র বোঝেন না তাঁরা ?

দ্বিতীয় দোষ

শ্লোকটিতে সর্বনাম অস্মৎ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির "অস্মাৎ" এই হেতু শব্দের প্রয়োগ। এটি হেতু বাদেরই প্রত্যক্ষ প্রয়োগ। প্রযোজক কর্ত্তার প্রেষণাদি লক্ষণ ব্যাপার বিশিষ্টতাই (পাণিনি ৩।১।২৬) সহেতুকতা। অর্থাৎ হেত্ববয়ব বিশিষ্টই শ্রীগৌরাঙ্গ। এতে হেতুর সঙ্গে হেতুমানের বা কার্য্যের অভেদটি আরোপ মাত্র হয়।

"অভেদেনাভিধাহেতু র্হেতো র্হেতুমতা সহ" সাহিত্য দর্পণ ১০।৬৪

তাতে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বটি হ'য়ে যায় আরোপধর্মী। বাস্তব নয়। আর তাতে হেতুটি যদি দোষযুক্ত হয় তবে হেতুমানটিও দোষযুক্ত হবে। কারণ হেতু দ্বারা উপমান উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য প্রতীতি করার জন্য সদ্ধেতুক অসদ্ধেতুক বিচারের খুবই প্রয়োজন। তাতে সৎ প্রতিপক্ষও তো থাকতে পারে! কারণ এই হেতু যে অভেদ আত্মা আবার ভেদ যুক্ত দেহই বোঝাবে, এমন সিদ্ধান্ত কি ক'রে হয়? তাতেই আবার ঐক্য প্রাপ্ত হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ লাভ হয় এমন সিদ্ধান্তই বা হয় কি ক'রে?

কারণ, হেত্বন্তর দেখিয়ে বা কারণান্তর দেখিয়ে অনুমানের প্রতিবন্ধকতা আনা যাবে না এমন নিশ্চয়তা থাকে না। তার ফলে হবে হেত্বাভাস যা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ প্রতিপক্ষিত ও বাধিত দোষে দুষ্ট হয়।

অর্থাৎ অস্মাৎ এই হেতু বাক্যটির দ্বারা "চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা" এটি যুক্তি সঙ্গত হয় না।

শ্লোকে আর একটি দোষ

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকারের নাম "রাধা"। প্রণয় মানেই যাচ্ঞা, প্রার্থনা, স্নেহ প্রসাদ ইত্যাদি জন্য চিত্তের একটি অবস্থা। আবার সেই অবস্থাটিতে যে পরিবর্তন বা অন্যথাত্ব তারই নাম বিকৃতি। ভয় ক্রোধাদি জন্য চিত্তের অবস্থান্তরের নামই বিকৃতি বিরূপতা ভিন্ন বিকারের অন্য অর্থই হয় না। অর্থাৎ চিত্তটি যখন বিরূপতা প্রাপ্ত হয়েছিল ভয় বা ক্রোধাদি জন্য, তখনকার অবস্থাটি হ্লাদিনী শক্তি। এমন উৎকট ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় দেওয়াটা কি স্বরূপ দামোদর ক'রতে পারেন?

তাই আবার অভেদাত্মা, ভিন্নদেহ শ্রীরাধা কৃষ্ণ। এমন অত্যদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত কার? স্বরূপ দামোদরের? না শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর?—তারই আবার পয়ার?

> রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
> অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
> সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
> রস আস্বাদিতে দোহে হৈলা এক ঠাঁই॥

চৈচঃ। আদি। ১ম।

এইসব কারণেও কি কেউ বলবেন না এটি প্রক্ষিপ্ত নয়? অতবড় মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর নজরে এসব ত্রুটি পড়েনি? হয়তো ভক্তিভরে ভাবনা ক'রে ক'রতে বিংশ শতাব্দীর ডক্টর উপাধিধারী, ধার্মিক, ভাগবত ব্যাখ্যাতা, গোস্বামী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ সন্তানদের এ দৃষ্টি না আসতে পারে. কিন্তু বিখ্যাত মহাকাব্য শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মানস দৃষ্টিতে এই ভাবে ভাগবত দর্শনের বিরোধী সিদ্ধান্ত, ন্যায় ও অলংকার শাস্ত্রের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সমন্বিত শ্লোকটিকে তিনি সমাদর করেছিলেন "স্বরূপ দামোদর কড়চায় আছে মনে ক'রে?

দ্বিতীয় শ্লোক—

> শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
> স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
চৈচঃ। আদি। ১।৬

(এর অর্থ পূর্বেই দিয়েছি)।

এটি "অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকারে রচিত। তার মানে উপলব্ধ বস্তুকে প্রতীত করার জন্য অবর্ণিত বিষয়ের দ্বারা তাকে ব্যঞ্জিত করা বা প্রশংসা করা।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রস্তুত বিষয়। তাঁকে ব্যঞ্জিত করার জন্য তিনটি অপ্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। (১) শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কেমন ? (২) ঐ প্রেমের দ্বারা যে শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য সুখ আস্বাদন করেন সে মাধুর্য্যই বা কেমন ? (৩) সে আস্বাদনসুখই বা কেমন ?

এই অলংকারে কাকেও স্তুতি করা যায় না। এ শ্লোকে তাই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্তুতি করা হয়নি। পূর্বোটিতে করা যায়, করাও হ'য়েছে।

এই অলংকারে যদি কাউকে প্রশংসা করা যায়, তেমনি নিন্দাও করা যায়। কিন্তু এতে নিন্দা করা হয়নি।

কিন্তু এই অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকারটি একক নয় এটির মুখ্যত ৫টি অঙ্গ, গৌণত আরও ২টি আছে।

১। যেখানে অপ্রস্তুত ব্যবহারের দ্বারা প্রস্তুত ব্যবহারের প্রতীতি করান হয় সেটি সাদৃশ্যমূলা অপ্রস্তুত প্রশংসা।

২। যেখানে অপ্রস্তুত কাজের দ্বারা প্রস্তুত কারণের প্রতীতি করান হয় সেটি কার্য্যমূলা।

৩। যে অপ্রস্তুত কারণের দ্বারা প্রস্তুত কাজের প্রতীতি করান হয় সেটি কারণ মূলা।

৪। যেখানে অপ্রস্তুত সামান্য কিছুর দ্বারা বিশেষ কিছুর প্রতীতি করান হয়, সেটি সামান্যমূলা

৫। যেখানে অপ্রস্তুত বিশেষ কাজের দ্বারা সামান্য কিছুর প্রতীতি করান হয় সেটি বিশেষ মূলা।

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নামে যে প্রস্তুত বিষয়টি, সেটির কারণ ঐ তিনটি বলেই এই শ্লোকটি কারণ মূলা অপ্রস্তুত প্রশংসার লক্ষণে লক্ষিত।

এখন প্রশ্ন এই যে, কবি একটু আগেই ব'লেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতির নামই শ্রীরাধা অর্থাৎ শ্রীরাধার পৃথক আত্মাই নাই, শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই তাঁর আত্মা, আবার সেই রাধারই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আত্মার প্রণয়ের মহিমা কেমন, সেই প্রেমের মাধুরী কেমন, সেই প্রেমের কিবা সুখ ? এই অপ্রস্তুত (অবর্ণিত কারণের দ্বারা প্রস্তুত গৌরাঙ্গের উৎপত্তি ?)

এ কেমন ধরণের অলংকার সৃষ্টি ?

অর্থাৎ কার্য্য কারণের অন্যোন্যতার ভিত্তিতেই কার্য্য কারণের অপ্রস্তুত প্রস্তুতের লক্ষণ নির্মাণ ?

আরও স্পষ্ট এই যে—

একই চিত্তের বিকার জানতে একই চিত্তের ভিন্ন দেহ প্রাপ্তি? এতে ভক্তি সিদ্ধান্তের যে, "লক্ষ্মীনারায়ণবৎ নিত্যং শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো" এ সিদ্ধান্ত থাকলো কি?

এতে নিত্য দাম্পত্যলীলাময় যোগমায়া বিজৃম্ভিত পরকীয়া লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার লোকালোক লীলার আচরণটি (গোস্বামী আচার্য্যদের) অস্বীকার করার দায়িত্ব কে নিলেন? স্বরূপ দামোদর না শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী?

নিশ্চয় এতখানি তলিয়ে দেখার মত ঐ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির লেখক ভেবে দেখেন নি।

আর, এও দেখেন নি যে, ওই শ্লোকগুলি এবং তাদের অনুবাদ পয়ারগুলিও যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখা নয় এবং তা এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রক্ষিপ্ত ব'লে একদিন ধরা প'ড়বে?—

যেখান থেকে প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছে

শ্রীপাদ শ্রীজীবের শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব এবং শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের প্রামাণ্যবোধক শ্লোকগুলি ব্যাখ্যার পর—এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হোলো—

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য, এই হেতু, কিন্তু এহ বহিরঙ্গ—
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥

তাহ'লে সত্যেরও অন্তর বাহির আছে? বেদে কিন্তু (ঋক্ ৭।৩৫।২ এবং ৭।১৭।৫) তা নাই। রামায়ণে (২।৬১।১৩) নাই। ভূর্ভুবঃ স্বর্মহ জনস্তপঃ সত্যং—এতেও নাই। শ্রীভাগবতে ৩।১৩।২৫ সত্যের অন্তর বাহির নাই। ভাগবতে ১০।২।২৬ এবং ৭।১।১১ দ্রষ্টব্য

অতএব প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের লেখকটি ঐ পয়ারগুলির পর থেকে যোজনা ক'রতে ক'রে —লিখলেন

(১) বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
(২) মো বিষয়ে—গোপীগণের উপপতিভাব।
(৩) আমিও না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
(৪) ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন।
(৫) এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদন।
(৬) অতএব 'মধুর রস' কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস'
(৭) অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

(৮) রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।
(৯) রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।
ইত্যাদি—

এবং (১০) বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
(১০) রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তুভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
(১১) রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥
ইত্যাদি—

প্রক্ষিপ্ত লেখকটি ওগুলি লিখেই বুঝেছিলেন শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে সত্যের যেমন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ক'রেছি—তেমনি ক'রলাম পরকীয় বাদ স্থাপন ক'রতে শ্রীজীবের শক্তি শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদটিকে কৌশলে শ্রীরাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব ও স্বরূপের ওপর অদ্বৈত আরোপ। কারণ, সেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদেরই আরও পরিশিষ্ট রূপ যে শ্রীগৌরাঙ্গ, এটি স্থাপন করার দায়িত্ব তো শ্রীজীব গোস্বামীতে চাপান যায় না।

কারণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ, আর ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির পরিণাম সৃষ্টি—এক কথা নয়। পরিণাম সৃষ্টি ক'রলেই প্রাকৃত হবে এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তে তা অপ্রামাণ্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোল ব'দলে লিখলেন—

প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপন অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥

তবুও তিনি বুঝলেন এ সিদ্ধান্তও শ্রীজীব গোস্বামীর এবং অন্যান্য গোস্বামী আচার্য্যদের সিদ্ধান্তের বিরোধী হ'য়ে যাচ্ছে। কারণ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। সেই প্রণয়েরই পরিণাম যদি শ্রীরাধা হন, তা'হলে তাতে এই দাঁড়ায় যে, শ্রীরাধার দেহাবস্থানই থাকেনা। ওটি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিকার, আসলে অপহ্নুতি অলংকারেরই রূপান্তর সাধিত হয়। তাতে আরও অপ্রামাণ্য হবে। অমনি তার পরেই জুড়ে দিলেন।

অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতেই জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥

০ ০ ০ ●

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত ॥
ইত্যাদি—

পরিষ্কার ধরা যায়,—এসব পয়ার প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছে পরে। প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আসল ব'লে চালাবার জন্য তাঁকে ব'লতে হ'য়েছে—স্বরূপ দামোদরের কড়চায় এসব পাওয়া গিয়েছে,—তিনি সর্বদাই শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে থাকতেন। আর যদি দেখা যায় শ্রীগৌরাঙ্গের এই ধরণের তত্ত্ববাদ ও স্বরূপ রহস্যের প্রসঙ্গ অন্য গ্রন্থেও বিধৃত হ'য়েছে, তবে ধরে নিতে হবে, তিনিও পেয়েছেন স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে।

যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাইর তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম-যাতে ॥ চৈঃ চঃ আদি। ৪র্থ।

প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও পয়ারগুলির লেখক মনে ক'রেছিলেন, যদিই কেউ প্রশ্ন করে, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চাটি কবিরাজ গোস্বামীর হাতে এল কি ক'রে? অমন শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বাধিক প্রিয়জন স্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের তো দেখা সাক্ষাতও হয় নাই, আর শ্রীস্বরূপ কোনও শিষ্য ক'রেও যান নি; যাতে সম্ভাবনা করা যেতে পারে স্বরূপের সেই গোপনতথ্য সম্বলিত কড়চাটি পরম্পরা ক্রমে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর হাতে এসেছিল।

প্রক্ষেপকার আরও শঙ্কা ক'রেছিলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি স্থাপন তো শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই ক'রেছেন ব্রজে শ্রীরূপ সনাতনকে পাঠিয়ে, তাঁরা যে সব গ্রন্থ লিখবেন, তাতে তো শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ বর্ণনা ক'রে অভীষ্ট দেবের প্রণাম বন্দনা তাঁরা অবশ্যই লিখবেন, তার চেয়ে অন্য ধরণে কেউ কিছু লিখলে, সেটি স্ব সম্প্রদায়ে যে গ্রাহ্যই হবে না। তা'হ'লে স্বরূপ দামোদরের শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বরহস্য এবং স্বরূপ প্রকাশটি অপ্রামাণ্য হবেই; এক্ষেত্রে প্রক্ষেপ কারক একটি ফন্দি ক'রেছেন—

ফন্দিটি হোলো এই রকম—ব্রজের গোস্বামীদের গৌরতত্ত্ব, গৌর স্বরূপের প্রকাশ যাই থাক, ওসব কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম-প্রকাশ নয়, কারণ তাঁরা কেউ স্বরূপ দামোদরের মত অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন না। তাই প্রক্ষেপকার লিখলেন—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত ॥
যেবা কেহো অন্য জানে সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোঁসাইর তেঁহো অত্যন্ত মর্ম-যাতে ॥

এইভাবে শ্রীচৈতন্য সমর্থিত স্বরূপ গোস্বামী প্রচারিত শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বটি ও স্বরূপ রহস্যটি দামোদরের কড়চায় বিধৃত হয়। এ কৌশল পরিষ্কার।

এখন প্রথম প্রশ্ন, ও রকম কড়চাটি কি সূত্রে এল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর হাতে?

তার উত্তর দিয়েছেন—

এ কড়চাটি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে ছিল। কারণ শ্রীদাস গোস্বামী ছিলেন

শ্রীস্বরূপের অত্যধিক প্রিয়। তিনি শ্রীগৌর ও শ্রীস্বরূপের অন্তর্ধানের পর যখন শ্রীরাধাকুণ্ডে গিয়ে বাস করেন, তার কিছুদিন পরই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁর সঙ্গ লাভ করেন।

তখনই তিনি এই গুপ্ত রহস্য মূলক তথ্য সম্বলিত কড়চাটি হস্তগত করেন। একথা তো শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অকপটেই স্বীকার ক'রেছেন—

চৈতন্য লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণ দিল এই ভেটে॥

চৈ চঃ ২।২।৭৩

আরও শঙ্কা জেগেছিল প্রক্ষেপকারের মনে—

যদি কোনও দার্শনিক ও আলংকারিক প্রশ্ন তোলেন এসব উদ্ভট উৎকট সিদ্ধান্ত (সহজিয়া ধরণে) দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ বর্ণনা করা যে আচার্য্য গোস্বামীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়া।

অমনি প্রক্ষেপকার আর এক কলম লিখলেন—না, না, অমন প্রশ্ন করবেন না, স্বরূপ-দামোদরের সিদ্ধান্ত এটি। এটি আমার নয়, অতএব ও সম্বন্ধে দোষের দায় আমি নিতে পারি না।

স্বরূপ গোস্বামীর মত রূপ রঘুনাথ জানে তত্ত্ব
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥

চৈঃ চঃ ২।২।৮২

প্রক্ষেপকার ধরেই নিয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ দামোদরের কড়চায় রহস্যটির সম্বন্ধে যে ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হেলো, সেটি সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুকূল নয় এবং গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের দর্শন সিদ্ধান্তে যিনি সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সেই শ্রীজীবের সিদ্ধান্তেরও বিরোধী। কারণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজেই ব'লেছেন—

ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে
এই শ্লোক জীব গোঁসাই করিয়াছেন বর্ণনে।

চৈ চঃ। আদি ৩।৬৫

আপাততঃ ধরা যাক্ শ্রীজীব ব'লেছেন, কিন্তু তিনি কি ব'লেছেন?

<u>শ্রীজীবের গৌর তত্ত্ব ও স্বরূপ বিশ্লেষণ শ্লোক</u>—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহি গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনৈর্যজ্ঞৈঃ কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতঃ॥

ভাগবত সন্দর্ভ। ।১।২

এর ব্যাখ্যায় শ্রীজীব ব'লেছেন কোটি কোটি মহাভাগবত বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যাঁর ভগবত্তা নিশ্চয় ক'রেছেন। ভগবত্তাই যাঁর নিজের স্বরূপ, সেই স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন ক'রে অন্যত্র দুর্লভ্য অথচ তাঁরই করুণায় সুলভ প্রেম পীযুষ ধারার প্রকটন হয়েছে। যিনি পরম অধিদেবতা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবানকেই

শ্রীভাগবত শাস্ত্র কলিযুগের উপাস্য ব'লে নির্ণীত ক'রে ১১দশ স্কন্ধে ব্যক্ত করেছেন, আমি সেই পুরুষোত্তমকেই আশ্রয় করি—

শ্রীভাগবতে কলিযুগের উপাস্য—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্ !
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কান্তিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর-বর্ণ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই গৌরাঙ্গ বিগ্রহেরই —উপাসনা করেন।

এ বিষয়ে শ্রীভাগবত আরও স্পষ্ট ক'রে—তাঁর অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন—

ওহে নন্দ! (গর্গাচার্যের উক্তি) তোমার ছেলেটি প্রতিযুগেই আসেন। এক এক যুগে এ'র বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। তবে জেনে রেখো, এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হ'য়ে এসেছেন। সত্য যুগে আসেন শুভ্রবর্ণ নিয়ে। ত্রেতায় আসেন লোহিত বর্ণে। আর কলিতে? কৃষ্ণ বর্ণ, মানে সোনার রঙে। এছাড়া তো অন্যবর্ণের উল্লেখই নাই বেদে।

তা'হলে গর্গাচার্য্যের ভবিষ্যৎ ঘোষণায় জানা গেল দ্বাপরের কৃষ্ণবর্ণই কলিযুগে পীত-বর্ণ ধারণ ক'রে এসে তিনি নিজেকে "কৃষ্ণবর্ণং" এই সংকেতে নিজেকেই পরিচিত করেন অর্থাৎ -চৈতন্য নামটিতে সেই কৃষ্ণকেই পরিচিত করান।

অতএব তাঁকে জানার উপায় হোলো কৃষ্ণ এই বর্ণ দুটি

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অংশ বিশেষের সঙ্গে সহজিয়া মতের প্রক্ষেপকারীটি জেনেছে —শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীজীবের গৌরতত্ত্ব, গৌর স্বরূপের রহস্য তো ভাল ক'রেই জানেন—কারণ কবিরাজ নিজেই তা ব'লেছেন—

(কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং শ্লোকের শ্রীজীবের ব্যাখ্যা)—কবিরাজের ভাষায়—

শুন ভাই এইসব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁ'র মুখে ॥
সেই সে কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥
কৃষ্ণ বর্ণ শব্দের অর্থ হইতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে মান ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অ-কৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ ॥

আদি। ৩য়।

শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্তটি তাঁর শ্রীগুরু শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ রহস্য জ্ঞাপনের সিদ্ধান্তের অনুপ্রেরণায় লিখিত।

শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত—

কলৌ বং বিদ্বাংস স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতি ভরাৎ
অকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎ কীর্ত্তন ময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রম যুষাং
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতি রতি তরাং নঃ কৃপয়তু ॥ স্তবমালা।২।১

এই অনুবাদই করেছেন শ্রীকবিরাজ গোস্বামী।

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি।
জীবের কলুষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে।

চৈ চঃ। আদি। ৩। ইত্যাদি—.

আরও একটি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ রহস্য ব্যক্ত ক'রেছেন।

শ্রীগুরু শ্রীরূপের এই সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলন করে শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভ-এবং সর্বসম্বাদিনীতে লিখলেন—সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারাই সেই শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা।

অনেকের দ্বারা মিলিত হ'য়ে শ্রীচৈতন্যের পরিচয় সংকেত—শ্রীকৃষ্ণ নাম গানই সংকীর্ত্তন যজ্ঞ।

তাই উপাস্য ও তাই অভিধেয়। এই তত্ত্বটিই সকলে অবধারণ করেন।

তাছাড়া পরম বিদ্বৎ শিরোমণি শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমও সেই সিদ্ধান্ত ক'রে ব'লেছেন—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূ'ত স্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ত ভৃঙ্গঃ॥

এর পরই শ্রীজীব লিখলেন—অতএব বহুভির্মহানুভাবৈঃ অসকৃৎ এব তথা দৃষ্টোঽসৌ গৌড় বরেন্দ্র বঙ্গ সুহ্মোৎ কলাদি দেশীয়ানাং সদা প্রসিদ্ধে…

অর্থাৎ বহু মহানুভাব বহুবার তাঁকে স্বয়ং ভগবান ব'লেই বুঝেছেন অর্থাৎ গৌড় বরেন্দ্র, সুহ্ম (ম্লেচ্ছদেশ) উৎকল দেশের মহানুভাব ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর ভগবত্তা প্রসিদ্ধি।

শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও স্বরূপ রহস্য জানার জন্য শ্রীরূপ, শ্রীজীব গোস্বামী যে সব সিদ্ধান্ত ক'রেছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তা ভাল ক'রেই জানেন এবং তাঁর চরিতামৃতে সেগুলি নিবদ্ধও ক'রেছেন। তাছাড়া তাঁর প্রথম জীবনে যেটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তারও মঙ্গলাচরণের প্রসঙ্গে গোস্বামী বর্গের গৌর বন্দনার অনুকূলেই লিখেছেন—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুঃ
উল্লাঘয়ন্ অপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেম সম্পৎ সুধয়াঽদ্ভুতোঽয়ম্
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মমুং প্রপদ্যে॥

গোবিন্দ লীলামৃত ১।২

অর্থাৎ—যিনি অজ্ঞান মত্ত জীবগণের ভবরোগ দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি, তিনিই প্রেম সম্পত্তি রূপ সুধা পান করিয়ে জগৎকে প্রমত্ত করেন, অতএব সেই অদ্ভুত দয়ালু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণাম করি।

এসব বুঝে সুঝেই সেই উৎকট সহজিয়া বৈষ্ণব রসিকটি—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে আরও গূঢ় রহস্যবেত্তার আসনে বসিয়ে (কবিরাজের লোকান্তরের পর) ভাগবতাশ্রয়ী কৌলিন্যটিকে তুচ্ছ ক'রে সহজিয়া রসবাদের অবতারণা করার প্রয়াসে শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও স্বরূপ রহস্যটিকে নির্মাণ ক'রলেন। এটি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে জ্বল্ জ্বল্ করছে—

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ।

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ। ১ম

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্র আলোচনা ক'রে ব্রজ বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গ রূপের তত্ত্ব নিরূপণ ক'রতে সমর্থ হয়।

সহজিয়া রসের বৈষ্ণবটি এইখান থেকেই সহজ রসের কলা কৌশল দেখাতে শুরু করেছেন। তাতে এমন ভাবটি অবলম্বন ক'রলেন যেন কেউ এসব প্রশ্নই না তোলেন যে, এসব রহস্যের সন্ধান পেলেন কোথায়?

কারণ এই চতুর্থ পরিচ্ছেদটি তো শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও স্বরূপ রহস্য বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ। তিনিই ব'লেছেন 'রাধা কৃষ্ণ প্রণয়···বিকৃতি। এবং শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা এই ৫ম ও ষষ্ঠ শ্লোক।

তাহ'লে কি তাঁর মর্য্যাদা রাখতেই—পয়ারে ব'লতে হয়েছে পঞ্চম শ্লোকরে অর্থ শুন ভক্তগণ?"

এই পঞ্চম শ্লোকটিতে (রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি)
তাতে যা বলেছেন তারই কি সার অর্থ ক'রলেন?

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥
ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥

ইত্যাদি—

তারপর—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ

প্রক্ষেপকারী লেখক বুঝিয়ে দিলেন যে, এসব সিদ্ধান্ত শ্রীরূপ শ্রীজীব জানতেন না। স্বরূপ গোস্বামীই জানতেন, তাই তাঁর কড়চাটিতে লিখে রেখেছিলেন।

তারপর ষষ্ঠ শ্লোকটির (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা ব্যাখ্যা আরম্ভ হোলো। এ

ব্যাখ্যার বক্তব্যও শ্রীস্বরূপ দামোদর ছাড়া শ্রীরূপ, শ্রীজীব, জানতেন না।

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের যেসব হেতু এর পূর্বে—বলা হ'য়েছে ওসব বাহ্য কথা—

এহো বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি "সূচন"

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ

আসল কথা বলছি এবার—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ॥

(তার পরের পয়ার—)

যে বীজের রোপণ, জলসিঞ্চন, বর্ধন, ফল আহরণ এবং দান প্রভৃতি কাজগুলি একমাত্র রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণেরই কাজ—

রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥

(তার পরের পয়ার)

কিন্তু—সে কাজ বড় নিগূঢ় অপরের সাধ্য নাই—রসিক শেখরের সেই কাজের প্রকার ভেদ—জানতে পারে।

অর্থাৎ—হ'তে পারেন শ্রীরূপ, শ্রীজীব রসিক দার্শনিক এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রকাশক, কিন্তু—শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও রহস্য তাঁরা বোঝেন না। একমাত্র বোঝেন স্বরূপ দামোদর।

"অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥

কারণ

স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতেই জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥

চৈ চঃ আদি। ৪র্থ। (তার পরের পয়ার—)

এর পর থেকেই সহজিয়া রসিকটি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজেরই রচিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের (৮/৭৭) দাস গোস্বামীর দানকেলি কৌমুদী, শ্রীরূপের ললিত মাধব নাটক, শ্রীভাগবতের ১০ স্কন্ধে-র শ্লোক তুলে তুলে স্বরূপ দামোদরের বক্তব্য সাজিয়েছেন। ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই লিখেছেন।

তার পর শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার প্রথম দ্বিতীয়ের ব্যাখ্যা সেরে শ্রীকবিরাজের ব'কলমে সহজিয়াটি লিখলেন এবার তৃতীয় হেতুর কথা শোন অর্থাৎ (সৌখ্যং চাস্যাঃ কীদৃশং বা মদনুভবতঃ) মানে শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী সম্যক আস্বাদন ক'রে শ্রীরাধা কেমন সুখ পান তা জানার তৃতীয় বাসনা)।

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ। চৈঃ আঃ ৪র্থ।

প্রক্ষিপ্ত অংশের সেই লেখক সহজিয়া রসিকটি আবার ভূমিকা ক'রলেন, এ সব সিদ্ধান্ত-রসের সিদ্ধান্ত। যে সে এসবও বোঝে না, জানেও না। জানেন মাত্র স্বরূপ দামোদর।

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোঁসাই মাত্র জানেন একান্ত॥
চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ।

সহজিয়া রসিকটি এরপর শ্রীরাধার সুখ লাভে শ্রীকৃষ্ণের সতৃষ্ণ কৌতুহল নিবৃত্তির রূপটি প্রকাশ করার জন্য "অধিরূঢ়" ভাব এবং গোপীদের প্রেম যে কাম নয়, সেটির ব্যবহার মাত্র কামের মত এবং তারা যে—

লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ ধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য, দেহ সুখ আত্ম সুখ ধর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎসর্ন॥
সর্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
চৈ চঃ। আ।

ইত্যাদি পয়ার দ্বারা বোঝালেন এইসব স্বভাব গোপীদের মধ্যে, তাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা উত্তম।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥
চৈ চঃ। আদি ৪র্থ।

সেই রাধার সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া। তাতেই রস বৃদ্ধি। অন্যান্য গোপীরা রসের উপকরণ।

রাধা সহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ।

এই সিদ্ধান্তটির সমর্থনে সহজিয়া রসের লেখকটি একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করেছেন, যেটি গীত গোবিন্দ কাব্যের ৩।১। অর্থাৎ একজন সহজিয়া আর একজন মনের মত সহজিয়ার কথা দিয়ে তাকে দৃঢ় ক'রলেন।

(শ্রীজয়দেবের সহজিয়া ভাবের চিন্তনা পূর্বেই আলোচনা ক'রেছি।)

এইখানেই তিনি থামেন নাই, আরও এগিয়ে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে সহজ রসের আস্বাদক ক'রে ছেড়েছেন। তিনি ব'লেছেন যুগধর্ম্ম নাম প্রেম প্রচারের কার্য্যটি শ্রীরাধার ভাব নিয়েই করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

(এমন সিদ্ধান্ত শ্রীজীব, শ্রীরূপের নয়, তা পূর্বেই দেখিয়াছি। এ মতটি সহজিয়া রসিকদের। কারণ আত্মা বা চৈতন্যগত অবস্থায় রাধা কৃষ্ণ এক, কিন্তু দেহগত অবস্থায় তারা পৃথক, অথচ অন্যোন্যে রস বিলাস করেন. এমন উৎকট সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা ক'রে ব্রজের দার্শনিক ভক্তি বাদীদের কাছ থেকে সরিয়ে আনাই তাঁর লক্ষ্য।)

তাই সেই লক্ষ্য সাধনায় পুষ্টিটির জন্য লিখলেন—

সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার।
যুগ ধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার।

এবং— সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ।

সহজ রসিকটি শ্রীচৈতন্যদেবকে গীতার 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য……শ্লোকের অবতার ব'লেও স্বীকার ক'রতে চান না।

তারই জন্য তিনি অপর সহজ রসিক শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের ১।১১…শৃঙ্গার: সখি মূর্ত্তিমান……শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

চৈ চঃ। আদি ৪র্থ

নন্দ সুতের সব স্বভাবকে পরিত্যাগ করে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রকট করালেন রসিক রূপে।

সহজিয়া রসের লেখক ব'লে তাঁকে পরিচিত করিয়ে স্বরূপ দামোদরের নাম দিয়ে এক অখ্যাত কড়চা খাড়া করে দেখালেন যে এমন গোপন তথ্য কারই বা জানা ছিল? কেউ জানতেন না। (আমি যিনি শ্রীকৃষ্ণদাসের ছদ্মবেশে) ওই গোপন তথ্য বলার জন্য ভিতর থেকে প্রেরণা পাচ্ছি। কিন্তু কেমন যেন মনে হ'চ্ছে। এ সব গূঢ় সিদ্ধান্ত বলা কি ঠিক হবে? অথচ না ব'লেও যে কেউ এর কূল কিনারা পাবে না। তা যাই হোক, ব'লতেই হচ্ছে যখন, তখন একটু ঢেকে ঢুকে বলি, রসিকরা বুঝবে, অন্যেরা বুঝবে না। ভাব্‌ছি এসব গুপ্ত রহস্যের কথায় যদি কেউ ভুল ব্যাখ্যা ক'রে অন্যরকম কিছু ভেবে ব'সে? তা, যাই করুক তারা,—একটু নিগূঢ় ক'রেই বলি। রসিকরা হেঁয়ালীতেও বুঝবে, মূঢ়েরা উটের মত, কাঁটা চিবিয়ে নিজের মুখে রক্ত ঝরিয়েও সেই কাঁটাই চেবায়। ওই মূর্খেরা কখনও শব্দের কচ্‌কচি, কখনও অর্থের কচ্‌কচি ক'রে নিজেদেরই মেধা নষ্ট করে। শুনুন তবে—

মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ॥

চৈ চঃ আদি। ৪র্থ

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ়, কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহো ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
এসব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ

এই ভাবে নিগূঢ় ভাষায় শ্রীচৈতন্য দেবের অবতারের হেতুটিও প্রকাশ ক'রলেন সেই সহজিয়া রসিকটি। তিনি নিঃশঙ্ক হ'য়েই ব'ল্লেন—

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তারা হউক চমৎকার ॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ

(ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য আচার্যরা কিন্তু এমন হেঁয়ালী করেন না সিদ্ধান্তে, কোনও ভক্ত অভক্তের পার্থক্যও রাখেন না।)

এখানে কিন্তু রসিকটি নিঃশঙ্ক হয়ে যা বল্লেন—তা হোলো এই যে—

শ্রীরাধার সঙ্গে আমার সঙ্গমটি যখন হয়, তখন উভয়ের অপার আনন্দ হয়। সেই ভাবে সম্ভোগের শেষে যে অপার আনন্দ লাভ করি—তাতে নিজেকেই নিজে ভুলে যাই। এতে যে উভয়ের "সমরস" ভোগ হয়—সে রসের ভোগের কথা ভরত মুনিও জানেনা; তবে মানে সে।

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত।
লীলা অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গ মাধুরী।
তা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি।
দোঁহার যে 'সমরস' ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে।* আদি। ৪।

সহজিয়া রসিকটি শ্রীগৌরবের দেহোৎপত্তির জন্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অপ্রস্তুত প্রশংসায় যে অলংকারটি ব্যবহার ক'রে তাঁকে শৃঙ্গার রস মঞ্চে এই কাণ্ডটি ক'রেছেন, তাতে অপ্রাকৃত চিন্ময় ঈশ্বর শ্রীগোবিন্দ প্রসঙ্গ কোথায় চ'লে গেল, এল যা, তা প্রাকৃত মানবের পরোঢ়া পরকীয়া রমণীর সঙ্গে সঙ্গম রসের প্রসঙ্গ। এই কি ভাগবত ব্যাখ্যা?

সহজিয়া রসিক এই প্রসঙ্গটি লিখেই তাঁর আদর্শ গুরুত্ব কথা স্মরণ ক'রলেন এবং গুরু স্বরূপ দামোদরকে মনে করে—তাঁকে বন্দনা করে আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদটি সমাপ্ত ক'রলেন—

এই তিন তৃষ্ণা (শ্রীরাধার তিনটি তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।)

(১) শ্রীরাধার মহিমা? (২) শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কেমন? (৩) ঐমাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে শ্রীরাধা যে আনন্দ পান তা কেমন?

তাই শ্রীকৃষ্ণ তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥*
এবং রাধিকার ভাব ও বর্ণ অঙ্গীকার করি।

০ ০ ০

অবতীর্ণ হ'লেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

এটি জানিয়েছেন 'স্বরূপ দামোদর ?'

এই ত কহিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান।
স্বরূপ গোঁসাই পাদ পদ্ম করি ধ্যান ॥

এরপরই সহজিয়া রসিকটি ব'লেন—আমি যে অর্থ করলাম সেটির সমর্থনে শ্রীরূপ গোস্বামীর স্তবমালার একটি শ্লোকে সমর্থন পাওয়া যাবে। শ্লোকটি স্তব মালার ২য় অষ্টকে ধৃত—'অপারং কস্যাপি প্রণয়ি জন বৃন্দস্য কুতুকী।

ভারী বিচিত্র ! এই শ্লোকটির অর্থে কোথাও শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন নাই—শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হ'য়েছেন।

সেখানে উৎপ্রেক্ষা করে শ্রীরূপ গোস্বামী ব'লেছেন ' মনে হয় কৌতুহল বশত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রণয়িজন অর্থাৎ ব্রজবাসিদের অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রসকে অপহরণ করে উপভোগ করার অভিপ্রায়েই বুঝি তাদের কান্তি প্রকটিত করে শ্যাম কান্তিকে ঢেকে এই গৌরাঙ্গ হ'য়ে এসেছেন।

শ্রীরূপের এই বর্ণনা শ্রীকবিকর্ণ পূরের শ্লোকের ভাব নিয়ে রচিত—

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবিপুরা সচ্চিদানন্দ সান্দ্রো। ইত্যাদি—

(এটি এই সন্দর্ভ গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় দিয়েছি)

কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আগন্তুক সহজিয়া লেখকটি (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নন) তাঁর মনোমত চিন্তায় এটিকে—

ব্যাখ্যা করে সরল সাধু বৈষ্ণবকে ঠকাবার জন্য ব'ল্লেন—আমি যে ব্যাখ্যা ক'রলাম এর সমর্থন শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকে পাবে—

এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ গোঁসাইর শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥

আদি ৪। শেষ।

সহজিয়া রসিকটির ঠকানিয়া কৌশলের বাহাদুরি আছে ব'লতে হয়।

পরিষ্কার বোঝা যায়—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রক্ষিপ্ত অংশের গতি সঞ্চার খুব সূক্ষ্ম পথে প্রবেশ ক'রেছে। এবং সেটি আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদটিতেই পাক মাখার চাতুরী প্রকাশ পেয়েছে —।

তারপর আদি লীলার ৫ম পরিচ্ছেদটিতে "পঞ্চতত্ত্বের" উপস্থাপনা। এটির ভিত্তিও সেই স্বরূপ দামোদরের শ্লোক।

সহজিয়া রসিক দেখেছেন, শ্রীসনাতন শ্রীরূপ, শ্রীজীব, তাঁদের গ্রন্থাবলীর কোথাও "পঞ্চতত্ত্ব" নামক কোন বৌদ্ধ সহজিয়াদের অভিলষিত তত্ত্ববাদ স্থাপন করেন নাই। ক'রতে পারেনও না। কারণ ঈশ্বরের তত্ত্ব ও স্বরূপ কখনও দেহ ভেদবাদের যুক্তি গ্রাহ্য হয় না। এবং তাঁর নিত্য সম্বন্ধবদ্ধ ঈশকোটির সেই পার্ষদ বৃন্দ কখনও ইয়ত্তা সীমার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গৌড়ের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই উপাস্যত্ব মুখ্য। তাঁর অবতার তিন প্রকারে প্রকটিত হয়। "ভগবান্ খলু ত্রিধা প্রকাশতে স্বয়ং রূপঃ তদেকাত্মরূপঃ আবেশ রূপশ্চেতি ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের অবতার তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়—স্বয়ং রূপ, তদেকাত্মরূ
এবং আবেশরূপ (শ্রীজীবের শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনী)

ঠিক ঐ-কথাই বলেছেন তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপ ও তাঁর লঘুভাগবতামৃতে

"কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ।
স্বয়ং রূপ স্তদেকাত্ম রূপ আবেশ নামক: ।
ইত্যস্য ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীত ধামস্ব।

(১) যেটি অনন্যাপেক্ষ রূপ, সেইটি স্বয়ং রূপ।

(২) যেটি স্বরূপের অভেদ হ'য়েও মূল স্বরূপের অপেক্ষাত্মক রূপ, সেটি তদেকাত্ম রূপ।

(৩) যেটি জীব বিশেষে আবিষ্ট রূপ সেইটি আবিষ্ট রূপ।

এই তিন প্রকার ভগবদ্রূপের মধ্যে আবার তদেকাত্ম রূপের দুটি ভেদ, বিলাসরূ
এবং স্বাংশ রূপ।

বিলাস রূপের বাসুদেব আর ও স্বাংশ রূপের সংকর্ষণ, মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি অবতা
বৃন্দ।

আবেশ রূপের দৃষ্টান্ত নারদ ও সনকাদি অবতার বৃন্দ।

কিন্তু ওঁরা বলেন নি "কায়ব্যূহ" নামেও একটি অবতার আছে এবং সেই কায়ব্য
আবার পাঁচটি রূপ ধারণ ক'রে মূল অবতার শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

কিন্তু এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যাচ্ছে, অবতা
সংজ্ঞাটির ভিন্ন অর্থ করা হ'য়েছে। সে অর্থ সৌত্রান্তিক সহজযানী বৌদ্ধদের অনুগ
সিদ্ধান্তের রূপ গ্রহণ করেছে। (এ সম্বন্ধে এই সন্দর্ভের প্রথম দিকে বিস্তৃত ক'
দেখিয়েছি)

যে সিদ্ধান্ত সহজিয়াদের, সেই সিদ্ধান্তই কি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর নামের আড়া
কোন সহজিয়া লেখকের ?

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র।
সেই বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র। আদি। ৫ পরিচ্ছেদ

সহজিয়া মতের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন আচার্যের অভিমত ছিল না ; তা
তাঁর মনগড়া এক কড়চার শ্লোক দিয়ে তাকে সমর্থন ক'রলেন। যে কড়চার লেখ
"স্বরূপ দামোদর"।

সংকর্ষণঃ কারণ তোয়শায়ী
গর্ভোদ শায়ী চ পয়োব্ধি শায়ী।
শেষঃ যস্যাংশ কলাঃ স নিত্যা—
নন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু।

এই উদ্ভট প্রমাণ দিয়েই সহজিয়াটি থামেন নাই—সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কাণ্ড লেন—

শ্রীবলরাম গোঁসাই মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ আদি। ৫ম।

কৌশলটি খুব সূক্ষ্ম অথচ গোস্বামী সিদ্ধান্তের বিরোধী, গোস্বামীগণ শ্রীভাগবতের ম স্কন্ধের ২টি শ্লোক তুলে প্রশ্ন ক'রেছেন "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" এবং "একোঽপি বহুধা যো বিভাতি" অর্থাৎ শাস্ত্রে আছে তিনি এক হয়েও বহু রূপে প্রকাশ পান কথার সার্থকতা কি ?"

উত্তরে বলেছেন, পূর্বে যে দুই প্রকারের প্রকাশ ব'লেছি সেই প্রকাশ দুই প্রকারের, টি মুখ্য, অপরটি গৌণ। তার মধ্যে যে প্রকাশে আকৃতি আদির অভেদ থাকে এবং রূপের সঙ্গে ঐক্য প্রতীতি করিয়ে দেয় তাঁকেই বলা হয় মুখ্য প্রকাশ এবং যে কৃতিতে মূল রূপের সঙ্গে পার্থক্য প্রতীতি করায় তাই গৌণ প্রকাশ।

শ্রীভাগবতের ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে যে
কৃত্বা তাবন্ত মাত্মানং যাবতী গোপ যোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভি রাত্মারামোঽপি মায়য়া ॥

এ শ্লোকে একই আকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পেয়ে ছিলেন রাসে। এইটিই তাঁর য় প্রকাশ।

এবং শ্রীভাগবতের ১০।৬৯।২ শ্লোকে যে বলা হয়েছে—
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্ট সাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥

অর্থাৎ—দ্বারকায় বহু আকৃতি ধারণ ক'রে মহিষী বৃন্দের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, সেটি ণ প্রকাশ ॥

এই গৌণ প্রকাশটির দুটি ভেদ, শক্তির আধিক্যে বৈভব এবং অল্পত্বে প্রভাব প্রকাশ। ঘু ভাগবতামৃত)

এই হোলো বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। এর বিরুদ্ধে গেলেই বুঝতে হবে সেটি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের য়ে কোন জালিয়াতের জালিয়াতি। বিজ্ঞ বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনও বৈষ্ণব দ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত লিখতে পারেন না। অতএব তাঁর নামে লিখে যদি কেউ লেন এটি শ্রীকবিরাজের লেখা, তবে বুঝতে হবে কোনও জালিয়াত এই জালিয়াতি জ ক'রে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে অজ্ঞ অথচ সাধু সরল বৈষ্ণবকে ঠকিয়েছেন। যেমন—

দেখা যাচ্ছে শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে—
একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায় ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায় ॥
শ্রীবলরাম গোঁসাই মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনি করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টি লীলা কার্য্য করে ধরি চার কায়।

কায়ব্যূহ এবং পঞ্চরূপ এই উৎকট সিদ্ধান্ত কি গোস্বামীদের ভক্তি সিদ্ধান্ত হ'তে পারে? কায়ব্যূহ মানে কি?

কায়ব্যূহ মানে শরীরের বায়ু পিত্ত কফ এই দোষ ত্রয়ের এবং রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র হই সপ্তধাতুর কার্য্য কারণ ভাবে ক্রমিক বিন্যাস। পাতঞ্জল দর্শন ৩।২৯।

এর সমর্থক দৃষ্টান্ত—পাতঞ্জলে এবং গীত গোবিন্দের (শ্রীজয়দেবের) ১২। শ্লোকে।

অতএব ঈশ্বর বিগ্রহে কায়ব্যূহ ভাষার প্রয়োগই সম্ভব নয়! যা অসম্ভব তা আবার দৃষ্টান্ত!

কিন্তু শ্রীজয়দেব যখন কায়ব্যূহের কথা ব'লেছেন—তখন বুঝতে বাকি থাকে সহজিয়া রসিকটি এই কায়ব্যূহ শব্দটি শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব বিন্যাসে কেন ব্যবহার ক'রলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের কায়ব্যূহত্ব কাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে? তবে মনগড়া কড়চাটিতে আছে—

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠ লোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহ মধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

আরও ব'লেছেন আর একটি শ্লোকে

মায়া ভর্ত্তাজাণ্ড সংঘাশ্রয়াঙ্গঃ

ইত্যাদি—

তারপর আরও একটি—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী।

ইত্যাদি—

আরও একটি—

যস্যাংশাংশঃ পরাত্মা খিলানাং

শ্রীনিত্যানন্দের মহান্ ব্যক্তিত্বটি কল্পিত সেই স্বরূপ দামোদরের কড়চার তত্ত্ব প্রকাশক শ্লোকরাজিতে ডুবে গিয়েছে। শ্রীজীব কিন্তু অমন তত্ত্ব প্রকাশ করেননি, তিনি ব'লেছেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য পার্ষদবৃন্দ অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি আবির্ভূত হবেনই।

তারপর এই শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশের প্রসঙ্গেই—শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর আত্ম-জীবনীর কিছুটা অংশ বিধৃত করা হ'য়েছে ব'লে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ব্যাখ্যা কর্তারা ঘোষণা করেন। কারণ ওই অংশেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁর জন্মভূমি, তাঁর ভ্রাতা, তাঁর বাড়িতে কীর্তন এবং শ্রীনিত্যানন্দের একান্ত ভক্ত শ্রীরামদাস মীন কেতনের আগমন প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

তাছাড়া আছে—স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ দর্শন দান ক'রে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দা-

ধামে যেতে আদেশ করেন।

সেই স্বপ্নটি যখন ভেঙ্গে যায়—তখন পূজনীয় শ্রীকবিরাজ আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন ং দেখেন সকাল হ'য়ে গিয়েছে।

স্বপ্ন ভগ্ন হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ চৈ চঃ। আদি। ৫ম

তারপরই তিনি শ্রীবৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন॥ শ্রীবৃন্দাবনে এসে কার কার দর্শন া, তা এমন ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন যেন শ্রীরূপ সনাতন শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির ক্ষাৎ দর্শনই পেলেন। আর শ্রীরঘুনাথ দাসের আশ্রয়ে থেকেই শ্রীস্বরূপের আশ্রয়ও লন। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তো স্বরূপ দামোদরের সাক্ষাৎ পান নাই। তিনি তো ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্হিত হ'য়েছেন।

১ অতএব প্রশ্ন জাগে, শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীকবিরাজকে স্বপ্নে দর্শন দান ক'রলেন র সেই স্বপ্নময় শ্রীনিত্যানন্দের মুখে শুনলেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল'--

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে।'

o o o o

এমনকি তাঁর পারিষদবর্গও কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ ক'রলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বহে সভে সপ্রেম আবেশ।

এক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভৃতি যাঁরা শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎদ্রষ্টা তাঁরা ব'লেছেন ড়ে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে, এবং কাকেও আশীর্বাদ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নামই স্মরণ রছেন। আর শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গের বর্ণচ্ছটা বর্ণনা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—শ্রীনিতাই ভ পীতবর্ণ।

কিন্তু শ্রীকবিরাজ স্বপ্নে তাঁর বর্ণচ্ছটা দেখেছেন—

"সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন।"

o o o o

তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥

o o o o

শ্যাম চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর ॥

সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্লবীর ॥

অতএব প্রশ্ন ওঠে—এত অসামঞ্জস্য কেন?

(২) প্রসঙ্গত আর একটি প্রশ্ন, ব্রজের এবং গৌড়ের কোন আচার্যই তাঁদের সংস্কৃত বাংলা ভাষার গ্রন্থাবলীতে কোথাও "গোঁসাই" এই শব্দটিকে বিশেষণ দিয়ে জুড়ে রও পূজনীয়ত্ব জ্ঞাপন করেন নাই।

কিন্তু—কবিরাজের শ্রীচরিতামৃতের সর্বত্র গোঁসাই শব্দের ছড়াছড়ি—

সব মনঃ কথা গোঁসাই করি নিবারণ।

নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন॥

(১) শ্রীচৈতন্য গোঁসাই

(২) শ্রীনিত্যানন্দ বা অবধূত গোঁসাই—

(৩) আচার্য্য গোঁসাই (শ্রীঅদ্বৈত)

(৪) শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব গোঁসাই।
(৫) সূত গোঁসাই।
(৬) স্বরূপ গোঁসাই।

এখানে যাঁরা উত্তর দেন "গোস্বামী" শব্দটির ক্রম বিবর্ত্তনেই গোঁসাই হ'য়েছে। তাঁদের প্রতি প্রশ্ন—

ঈশ্বর এবং তাঁর ভক্তরা তাহ'লে একই গোস্বামী উপাধি লাভের অধিকারী? এমন কি শ্রীভাগবত বক্তা সূতও "সূত গোস্বামী? সূত গোঁসাই?"

কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায়—শূন্য পুরাণ, ময়নামতির গান, মঙ্গলচণ্ডী, ক্ষেমানন্দ দাসের মনসার ভাসান, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল, মীন কেতন, শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম) প্রভৃতি বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীদের পাঁচালি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে "গোঁসাই" শব্দের দ্বারা 'নিরঞ্জন,' ধর্মদেব, ধর্মঠাকুরকে বোঝান হ'য়েছে। তাছাড়া অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার সাহিত্যে গোঁসাই শব্দের ছড়াছড়ি। সকলেই "নিরঞ্জন" শব্দের প্রতিশব্দে গোঁসাইকেই ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

সব গ্রন্থই যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অনুকরণে আপন ইষ্টদেবকে গোঁসাই আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রেছেন, এমন যুক্তি স্থাপন ক'রতে যে ইতিহাসের প্রয়োজন (বাংলা সাহিত্যের) তা কি কেউ বিদ্বৎ সমীপে আনতে পারবেন?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর মত পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলা ভাষায় "গোঁসাই" বললে নিরঞ্জন বা ধর্মঠাকুরকে না বুঝিয়ে ঈশ্বর এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে একই পর্য্যায়ে ফেলা যায়, এমন ভ্রান্ত মতির উদাহরণ স্থাপন ক'রতে পারেন?

যদিই তা পারেন, তা হ'লে কে না ব'লবে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাব ও ভাব অবশ্যই সহজিয়াদের সংস্পর্শে অভিন্নমনার ভাষা হ'য়েছে এবং তাই ঘটে, বা ঘ'টেছে এবং সেই মনের ভাষা তাঁরই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম পরিচ্ছেদের শেষের বক্তব্যগুলির পরিবেশন ক'রতে ক'রতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন সেই নিত্যানন্দের কৃপায় এলাম শ্রীবৃন্দাবনে এবং তিনিই কৃপা ক'রে শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় করার সুযোগ ক'রে দিলেন—

"মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ চরণ॥

চৈ চঃ। আদি। ৫ম

অর্থাৎ—শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে এসেছেন ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরূপের লোকান্তর প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত তাঁর দর্শন ও সঙ্গ লাভ ক'রেছেন তার মানে প্রায় ৩৪ বৎসর কাল যাবৎ শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতির সঙ্গ লাভ ক'রেছেন। (কারণ ঐ খ্রীষ্টাব্দেই শ্রীসনাতনেরও লোকান্তর)

তারপর শ্রীচরিতামৃত লিখছেন—১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে। এত দীর্ঘ দিন ব্রজে বাস করেও তিনি সহজিয়াদের "গোঁসাই" শব্দের দ্বারা কি বোঝায় এটা রপ্ত ক'রতে পারেন নাই! এ এক বিচিত্র মায়া বটে।

তার পর, পূজনীয় কবিরাজ গোস্বামী ব'ললেন, সেই সব ব্রজবাসী বৈষ্ণবের অনু-রোধে আমি এই শ্রীচরিতামৃত লিখলাম—

১। তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥

চৈ চঃ। আদি। ৮ম

০ ০ ০

২। আর যত বৃন্দাবন বাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥

০ ০ ০

৩। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥

এই সব তথ্যের দ্বারা যেমন প্রমাণ করা যায় তৎকালীন ব্রজের অনেকের আদেশে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা ক'রেছেন, তেমনি আবার চমক লাগে র বিপরীত উক্তি দ্বারা—

শ্রীকবিরাজ লিখলেন, শ্রীচৈতন্যের লীলা কথা জানা ছিল স্বরূপ দামোদরের (অন্ততঃ শেষ লীলাটি) তিনি রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে রেখে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ—কড়চা লিখে য়। মুখে মুখে জানিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমি (কৃষ্ণদাস) সেই রঘুনাথের াছে শুনে এগুলি লিখলাম, এবং তাই ভক্তবৃন্দকে উপহার দিলাম। তবে কিছু বেশী য়ে গিয়েছে এ গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকের সমাবেশ ক'রে। তার জন্য যদি কেউ বলেন, গ্রন্থ সাধারণ লোকে বুঝতে পারবে না। তা হলে আমি নিরুপায়।

কারণ সকলের মন সকলের চিত্তকে খুশী ক'রতে পারবো না। কারণ এসব লেখার ন্য আমায় কেউ অনুরোধ যেমন করেনি, তেমনি কারও সঙ্গে আমার বিরোধও নাই। া সহজ বিবেচনা ক'রছি তাই লিখছি। এবং প্রভুর যা আচরণ ছিল তাই লিখছি। তে যদি কারও রাগ বা বিদ্বেষ হয় তবে আমি ধরে নেবো তেমন রাগ বিদ্বেষের বশী-ত হলে "সহজ" বস্তুর বর্ণনাই করা যায় না। তবে এসব কথা এসব মতবাদের প্রসঙ্গ কিন্তু আবার নিজের নয়। স্বরূপ গোস্বামীরই মত ছিল। তিনি শ্রীরঘুনাথ দাসকে লেছিলেন। সেই সবই আমি লিখলাম। এতে আমার দোষ হচ্ছে—বলে কেউ যেন নে না করেন।

চৈতন্য লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

এখানে বললেন শ্রীরঘুনাথের মুখে শুনেছি, কিন্তু কড়চা মারফৎ নয়।

যদি কেহ হেন কহে গ্রন্থ কৈল শ্লোক ময়ে
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।

প্রভুর যেই আচরণ সেইকরি বর্ণন
সর্ব চিত্ত নারি আরাধিতে।।
নাহি কাঁহাসো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
'সহজ' বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ
'সহজ' বস্তু না যায় লিখন ॥ মধ্য। ২য়।

০ ০ ০

স্বরূপ গোঁসাইর মত রূপ রঘুনাথ জানে তত্ত্ব
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ মধ্য। ৩য় পরিচ্ছেদ।

এখানে তিনটি কথা লক্ষ্য করার মত…

(১) আদি লীলায় ব'লেছেন—অনেকের অনুরোধে শ্রীচরিতামৃত লিখেছি। তার পর মধ্য লীলায় ব'ললেন কারোর অনুরোধে লিখি নাই।

(২) গৌর সুন্দরের নীলাচল লীলার বর্ণনাটি কড়চা থেকে নয়, শ্রীরঘুনাথের কাছে শুনে শুনে।

(৩) 'সহজ বস্তু' 'সহজ বস্তু' বলে যা বার বার ব'লেছেন সেটির দায় দায়িত্ব স্বরূপ দামোদরের ওপর চাপালেন কেন? এবং তাতে এই কথাই বা লিখলেন কেন "তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।"

তবে কি শ্রীকবিরাজ ভেবেছিলেন এ অংশ লেখাতে বৈষ্ণবের ভক্তি সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ সব সিদ্ধান্তের যোগ স্থাপন করাটা দোষের?

তা যাক, এ সব প্রশ্ন আগামী দিনের পণ্ডিত গবেষকদের মনীষার প্রাঙ্গণে রাখলাম।

এখন আরব্ধ বিষয়ের অনুবর্তনে আসি। আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ তক যে বর্ণনা তার সবই স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামক একটি মনগড়া পুঁথির কয়েকটি শ্লোককে ভিত্তি ক'রে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ববাদের উপস্থাপনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ। এটির ভিত্তিও স্বরূপ দামোদরের কড়চায়। শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্বটি মহাবিষ্ণুর তত্ত্ব। ইনিও "গোঁসাই।"

"অদ্বৈত আচার্য গোঁসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর।"

এঁরও প্রমাণ সাপেক্ষ শ্লোক স্বরূপ দামোদরের কড়চায়

"মহাবিষ্ণু জগৎ কর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ"
তস্যাবতার এবায়ং অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥

মহাবিষ্ণু শব্দ এবং তাঁর সৃষ্টি কর্তৃত্ব এ সব সিদ্ধান্ত শ্রীরূপের লঘুভাগবতেও নাই এবং শ্রীজীবের কোন সন্দর্ভেও নাই।

কিন্তু শ্রীভাগবতের ১০।১৪ অধ্যায়ের ব্রহ্মার স্তুতি করা একটি শ্লোকের সঙ্গে এই তত্ত্ববাদকে জড়িয়ে এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের রচনা।

সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন তথ্যেরও সংযোজনা ক'রেছেন। সেটি শ্রীঅদ্বৈতের ঈশ্বরত্ব থাকলেও তিনি শ্রীচৈতন্যের দাস্য ভাবে মত্ত ছিলেন। এরই সমর্থনে শ্রীভাগবতে

শ্রীনন্দ মহাশয় থেকে ব্রহ্মা, শিব এবং গোপীদের উক্তির সমাবেশ ক'রেছেন। শেষ সিদ্ধান্ত ক'রেছেন, অতএব সকলেই শ্রীচৈতন্যের কিঙ্কর।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
আদি। ষষ্ঠ।

কিন্তু এখানে প্রসঙ্গত সেই "কায় ব্যূহ শব্দের যোজনা ক'রে বিষয় বস্তুটিকে অন্য পথে চালনা ক'রেছেন (কায়ব্যূহ শব্দটির পরিভাষার অর্থ পূর্বেই ব'লেছি।)

"কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন।"
আদি। ষষ্ঠ।

এখানে আর একটি ত্রুটিও লক্ষণীয় হ'য়ে আছে—

শ্রীকবিরাজ ব'লেছেন এসব কথা যা ব'লাম সবই বিজ্ঞের অনুভব। মূঢ়রা তা বুঝবেনা। অর্থাৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে এসব তত্ত্বশাস্ত্রের ভিতরে খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না। অনুভবশক্তি চাই।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ় লোকে নাহি জানে ভাবের বৈভব॥
আদি। ষষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মনোভাব যাঁরা বোঝেন না তাঁরা "মূঢ়" এ উক্তি সমগ্র গ্রন্থের স্থানে স্থানে বড় রূঢ় হ'য়ে আছে। (বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখে দম্ভোক্তি হয় না কি? অনুভব শক্তি তো জনে জনে পৃথক হবে সেইজন্যেই, তো শাস্ত্রবিধি)

এরপর শ্রীকবিরাজ শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার ৭ম পরিচ্ছেদটির বিষয় কি তা ব'লেছেন—সেটি হোলো 'পঞ্চতত্ত্ব'।

"পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥
আদি। ষষ্ঠ শেষ।

পঞ্চ-তত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে—সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ
রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ॥ আদি। ৭ম॥

ভক্তি সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক নূতন তত্ত্বের ও তথ্যের সংযোজনা। এটি যে ভক্তি সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটুও খাপ খায় না সেটি এই সন্দর্ভের ১ম ভাগে ৫৬ পৃষ্ঠা থেকে ৬১ পৃষ্ঠায় দিয়েছি।

এই পঞ্চতত্ত্বটি কোনও আচার্য্যের গ্রন্থে নাই। তাই এর সমর্থনে স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামক এক কল্পিত কড়চার অস্তিত্ব খাড়া করে তার আশ্রয়ে এসে ব্যাখ্যা ক'রতে হ'য়েছে।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।

শ্রীকবিরাজের বেশে সেই সহজিয়া ব'লেছেন ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার,

ভক্তাখ্য, এবং ভক্তশক্তিক এই পাঁচটির অপর নাম পঞ্চতত্ত্ব। আসলে এসবই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ রসাদি বিলাসের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতারে ওই পাঁচটি তত্ত্বে নিজেকে প্রকটিত ক'রেছেন।

(১) ভক্ত রূপে শ্রীচৈতন্য
(২) ভক্ত স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ
(৩) ভক্তাবতার শ্রী অদ্বৈত গোঁসাই
(৪) ভক্তাখ্য অবতার শ্রীবাস প্রভৃতি
(৫) ভক্ত শক্তি অবতার গদাধর প্রভৃতি।

এই পঞ্চতত্ত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব প্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উথাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন॥
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥

আদি। ৭ম।

এই পাঁচ মূর্ত্তির কাজ কর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীকবিরাজ আর একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ক'রেছেন, যেটি শ্রীচৈতন্যের জীবনীকারদের অগোচরে ছিল। সেটি প্রকাশানন্দ নামক এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর জীবন চর্য্যার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যকে অবজ্ঞা করা।

শ্রীচৈতন্য দেব তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অলোক প্রতিভায় শ্রীপ্রকাশানন্দের মনকে বৈষ্ণব ধর্মে বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে ফিরিয়ে দিলেন।

সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥

আদি। ৭ম।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের পঞ্চতত্ত্ব এবং তাঁর ভক্তভাব ধারণের সঙ্গে প্রকাশানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণটিকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিদৈন্যের, ভক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মর্ম প্রচারের উদাহরণ স্থল ব'লে উপস্থাপিত ক'রেছেন। এ উপাখ্যানটিই আবার—মধ্য লীলার ২৫ পরিচ্ছেদে জের টেনেছেন। মধ্য লীলারই জীবনচর্য্যার অন্তর্গত থাকলে যেমন প্রাসঙ্গিক হোতো এখানে তা হয়নি। কারণ এখানের বক্তব্য বিষয় পঞ্চতত্ত্বের উপস্থাপনা।

কাশী বাসী প্রকাশানন্দের উদ্ধার (যদিও শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখকদের অজ্ঞাত) কাজটি পঞ্চতত্ত্বের কোন তত্ত্বের দ্বারা সাধিত হোলো, সেটি চিরকালের জন্য সন্দেহ, বিতর্ক, সংশয়, ও অনাস্থার ক্ষেত্র ক'রে রেখেছেন।

অথচ বিষয়টির উপসংহারে লিখলেন—

"এই পঞ্চতত্ত্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥

এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকেই পঞ্চতত্ত্বের পাঁচটি মূর্ত্তি পরিকল্পনা করার পিছনে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির অস্তিত্ব কোথায়?

যাঁরা বলেন এর পিছনে আছে—শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর বৈষ্ণব তোষিণীর মঙ্গলাচরণের শ্লোকাবলী—

কথাটি কি ঠিক? না কিছুতেই নয়। তিনি শ্রীমদন গোপাল, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীধর স্বামী, সার্বভৌম, ভট্টাচার্য্য, বিদ্যা বাচস্পতি, শ্রীবিদ্যাভূষণ, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাম ভদ্র ও শ্রীবাণী বিলাসকে প্রথমে বন্দনা ক'রেছেন, তারপর ক'রেছেন—

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাস পণ্ডিতম্।
নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধর পণ্ডিতম্॥

অতএব শ্রীসনাতন "পঞ্চতত্ত্ব" নামে কোন একীভূত অথচ কায়ব্যূহ তথ্যের বা তত্ত্বের সমাবেশ ক'রে সহজিয়াদের পঞ্চরসের সমাহার করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের "পঞ্চতত্ত্ব" নামক এক নূতন পরিবিধানের রহস্যটির অন্তরালে সহজিয়াদের শূন্য পুরাণে ও তন্ত্র শাস্ত্রের সাধন রহস্যের ছায়া পড়ে আছে।

গুরু তত্ত্ব, দেব তত্ত্ব, মন্ত্র তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও ধ্যান তত্ত্ব এই পাঁচটি তত্ত্বকে বিস্তৃত করে বলার প্রসঙ্গে—"তবে হরেক গোঁসাই পঞ্চতত্ত্বের একাসন" (শূন্য পুরাণ ১০৯ পয়ার) এই সিদ্ধান্তটি তাঁদের বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং তাঁরা একেই বলেছেন—আদি "পঞ্চরাত্র জ্ঞান।"

সেই পঞ্চরাত্র জ্ঞানটির শ্লোকটি "রাত্রংচ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রংচ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
'পঞ্চজ্ঞান সাধন। ১৬।

একই পাঁচ এবং পাঁচই এক এই জ্ঞানই "পঞ্চতত্ত্ব" এমন সিদ্ধান্ত ভারতের কোন বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে নাই। যেখানে "পঞ্চতত্ত্ব" নামক শূন্য পুরাণের অভিলষিত সিদ্ধান্তের প্রতীক দেখা যাবে' পণ্ডিতরা তখনই জানতে চান এর প্রবর্ত্তন কোথা থেকে এসেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নামের আড়ালে যে সহজিয়া রসিক লোকটি এই কাজ করেছেন, তাঁকে ধরা যায় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ১৭ দশ পরিচ্ছেদের সূচীপত্র নির্মাণের সময়, তিনি এক রকম ব'লেই ফেলেছেন—"পঞ্চরসের কথা"।

অর্থাৎ এই শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার ১ম পরিচ্ছেদে।

প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ।
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব নিরূপণ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত তত্ত্বের বিচার।
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
অষ্টমে চৈতন্য লীলা বর্ণন কারণ।
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন।
একাদশে নিত্যানন্দ শাখা বিবরণ॥
দ্বাদশে অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণন।

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ॥
চতুর্দশে বাল্য লীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ড লীলা সংক্ষেপ কথন।
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোর লীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবন লীলার কহিল বিশেষ।
এই সপ্তদশ প্রকার আদি লীলার প্রবন্ধ॥
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখ বন্ধ॥

অর্থাৎ আদি লীলার মধ্যে মোট ১৭টি পরিচ্ছেদ। তার মধ্যে ১২টি হোলো গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয়।

তা হলে আর পাঁচটি সন্দর্ভ কি নিয়ে লেখা ?—

শ্রীকবিরাজের নামের আড়ালে সেই সহজিয়া লেখকটি পরিষ্কার বলেন—বাকী পাঁচটি লিখেছি 'পঞ্চরসের' সন্ধান দিতে।

"পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চরসের" চরিত।
সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত॥

আদি। ১২ দশ।

সহজিয়া লেখক শুধু বল্লেন "পঞ্চরসের চরিত"। আর ডকটর রাধা গোবিন্দ নাথ এর ব্যাখ্যা করেছেন ত্রয়োদশ জন্মলীলারস। চতুর্দশে বাল্যলীলা রস, পঞ্চদশে পৌগণ্ড লীলা রস। ষোড়শে কৈশোর লীলা রস। সপ্তদশে যৌবন লীলা রস।

সহজিয়া লেখকের বক্তব্য 'পঞ্চরসের' এই কি ব্যাখ্যা হোলো ? কোনও ব্যক্তির জীবনের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে তাঁর কর্মযোগ্যতার আচরণের বর্ণনাটিকে কেউ রসের পর্য্যায়ে ফেলেন না। আর তেমন বক্তব্যও রাখেন নি সেই সহজিয়া রসিক লেখকটি।

অলংকার শাস্ত্রে রসের বিচার ঢের আছে। সকলেই ব'লেছেন সামাজিক দের কাছে যে কাব্যের গুণটি আস্বাদ্য হয়, আনন্দজনক হয় এবং উপভোগ্য হয় সেইটি রস। সেটি ব্যক্ত হয় বিভাবাদির দ্বারা।

সেই রস কারোর মতে নয়টি, কারোর মতে আটটি। কারোর মতে ১২টি। যাঁরা ১২টি বলে যুক্তি দিয়েছেন, তাঁরা হলেন গৌড়ের বৈষ্ণব। এঁদের মৌলিক গ্রন্থ সিংহ ভূপালের রসার্ণব সুধাকর। তার থেকে জন্ম গ্রহণ করিয়েছেন "উজ্জ্বল নীলমণি। তাতেই বলা হ'য়েছে রস মুখ'ত পাঁচ প্রকার, আর গৌণতঃ হাস্য অদ্ভুত বীর ভেদে ৭ প্রকার, কিন্তু এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যে সহজিয়াটি—আত্মনাম গোপন ক'রে শ্রীকবিরাজের নামে স্থানে স্থানে "রসের প্রবন্ধ" প্রবেশ করিয়েছেন, তাতে ডকটর নাথের ব্যাখ্যা খাপ খায় না।

যেটি খাপ খায় সেটি হোলো—এই শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাঁরই কথা কওয়া। কারণ লেখক নিজেই ব'লেছেন—'রস আস্বাদন ক'রতেই শ্রীচৈতন্য রূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণের একদেহে আবির্ভাব।'

'রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই।

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

সে রসের প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা জানলেই গৌরের মহিমা জানা যায়।

"যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন

চৈ চঃ আদি। ৪র্থ।

যে রসের আস্বাদন ক'রতে শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত। সেই রস আস্বাদন করান শ্রীরাধা॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন॥

চৈ চঃ আদি। ৪র্থ ৬২।

যেহেতু 'কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥

অতএব এই শ্রীচৈতন্যস্বরূপ মানে রাধা কৃষ্ণের লীলাভোগের মিলিত স্বরূপ; এবং উভয়েই উভয়ের রস আস্বাদন করছেন এই অবতারে। দেহ দেহী জড়াজড়ি হয়ে।

তাই সিদ্ধান্ত (সহজিয়াদের)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই রসের সদন॥

অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥

এবারে লীলায় গোপন তথ্যটিকে হেঁয়ালি করে ব'ললেন। কারণ সহজিয়া লেখকটী বলেছেন—

"অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।

লীলার হেঁয়ালিটি এই ভাবে এখানে; যা প্রকৃতির শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, সেই পাঁচটি তন্মাত্রই সহজিয়য়াদের কাছে রাধা কৃষ্ণের লীলা সম্ভোগে অদ্বৈততত্ত্বে যুক্ত হ'য়ে আছে। এই রহস্যটি জান্‌তে তাঁরা বলেন, "একটু ডুব দিলেই ভাব মাখা ভাষার প্রকাশ পেয়ে যায়। প্রেম নেত্রের বিকাশ হ'লেই সে সব দেখতে পাওয়া যায়, গুরু কৃপা হ'লেই লীলা তত্ত্বের সব রহস্য খুলে যায়।

(ওঁদের লীলা তত্ত্বটী এইভাবে)

রাধা কৃষ্ণ জড়াজড়ি হ'য়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাণী শোনেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাণী শোনেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করেন, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রূপে আকৃষ্ট হন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অধর রসে মুগ্ধ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অধর রসে মুগ্ধ, (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গ সঙ্গে মুগ্ধ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গে মুগ্ধ।)

এই হোলো "পঞ্চরসের প্রবন্ধ

এইটিই লীলা রসতত্ত্বের আদি কথা। এই তত্ত্বটিকে জানাতেই সেই সহজিয়া রসিকটি নিগূঢ় ক'রে বা হেঁয়ালী করে যা ব'লেছেন, তারই ভূমিকা" "পঞ্চরসের প্রবন্ধ।

যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।

ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।

নিঃশঙ্কে কহিয়ে তারা হউক চমৎকার॥

কি ব'ল্লেন কবিরাজ ?

ব'ল্লেন—শ্রীকৃষ্ণ বিচার ক'রে দেখেছেন—

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণ রস রূপ কহে মোরে ॥

কিন্তু— আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।

তবুও— একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥

অতএব রাধাকৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতিকে কেমন ক'রে আস্বাদন ক'রেছেন সেটি জানতে হবে—

(৩) শ্রীকৃষ্ণের রূপ—কোটি-কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমায়।
অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য সাম্য নাহি তার ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
তবুও— রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥

(৪) রস— যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রস আমা করে বশ ॥

(৫) গন্ধ— যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
তথাপি—মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গগন্ধ ॥

(২) স্পর্শ— যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
তবুও— রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥

(১) শব্দ—(যদ্যপি) মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
তথাপি— রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥

সহজিয়া রসিকটি কৌশলে লিখলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেমনটি আস্বাদন ক'রছেন রাধাকে—তেমনি বিপরীত ক্রমেও আস্বাদন করছেন শ্রীরাধা।

এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারিয়া দেখ সব আছে বিপরীত ॥

চৈ চঃ। আদি। ৪র্থ পরিচ্ছেদ

এরপর ঐ "পঞ্চরসের" আরও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া যা, তাই হোলো শ্রীজয়দেবের, এবং শ্রীরায় রামানন্দের সহজিয়া রসের পূর্ণতায়। যার অপর নাম সমরসের অদ্বৈত অবস্থা। (এ সম্বন্ধে এ সন্দর্ভের দ্বিতীয় ভাগে রামানন্দ ও তাঁর জগন্নাথ বল্লভ নাটকের প্রসঙ্গে দেখিয়েছি)

এই চরিতামৃতে—তারই স্থূল অথচ ঐ পরকীয়া নায়িকার শৃঙ্গার রসের—পরিণতি দেখিয়েছেন—সহজিয়া লেখকটি—

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥
লীলা অন্তে (সম্ভোগের অন্তে) সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।

তাহা হৈতে—রাধা সুখ শত অধিকাই ॥

চৈঃ চঃ। আদি। ৪র্থ।

এই রস রাস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥
সেই সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।

চৈঃ চঃ। আদি। ৪র্থ।

সঙ্গম এবং সম্ভোগ এইটিকে লক্ষ্য করে পণ্ডিতবৃন্দ সুধীবৃন্দ বিবেচনা ক'রে দেখুন সহজিয়া রসিকটির "পঞ্চরসের ভিয়ান," সে ভিয়ানে কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় পাক ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে নামিয়েছেন।

এই সহজিয়াটি—এই লীলা সঙ্গমের সম্ভোগ প্রক্রিয়ার কর্মটি শ্রীবৃন্দাবনে ব'সে করেন নাই। করেছেন সম্ভব এই বাংলায়,—সে বাংলা পূর্ব কি পশ্চিম অথবা উত্তর, তা ভবিষ্যৎ যুগের লেখক সেটি ধরার ভার নিন। কারণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অভীষ্ট কার্য্যের সাধকদের—(শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাসের), সঙ্গ লাভ ক'রে এবং ব্রজভূমিকে চিন্ময় ধাম মনে ক'রেও কখনও ব'লতে পারেন না।

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে (শ্রীরূপ সনাতন) ভক্তি সদাচার ॥

'শ্রীচরিতামৃত। আদি। ১০ম ৮৭ পয়ার

অতএব এই বাংলার একজন পাকাপোক্ত সহজিয়া রসিক বাংলায় ব'সেই পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অপূর্ব শুদ্ধ ভক্তি রসের চমৎকার মহাকাব্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটির আসল বক্তব্যটির সঙ্গে স্থূল শৃঙ্গার রসের "লীলাবাদ" বা বৌদ্ধ সহজিয়া "ন্যাড়া নেড়ীদের" ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড লীলাত্মক বাদটিকে খুব কৌশলে ঢুকিয়েছেন। তাঁরা এই লীলাবাদটিকে শ্রীভগবানের "লীলা মনুষ্য" স্বরূপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কথা বলেন।

শ্রীভাগবতে ভগবান কৃষ্ণকে বিষ্ণুর লীলা মনুষ্য অবতার ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে শ্রীভাগবত ১০ ৪৫।৪৪ শ্লোক—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরু পুত্রকে সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে এনেছেন সমুদ্র ব'লেছেন—

"লীলা মনুষ্য! হে বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্" অতএব শ্রীকৃষ্ণই যখন লীলা মনুষ্য দেহধারী, তখন তাঁর সব কাজই লীলা। কারণ শ্রীভাগবত আরও ব'লেছেন—সেই ভগবান অথবা পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম, তিনিই এই—গুণময় সংসারে সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, নিজেরই সৃষ্ট প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করেন এবং সত্ত্বের দ্বারা বিশ্বকে ভাবনা করেন। এইভাবেই দেবতা, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীবৃন্দের মধ্যে তাঁর অন্তর প্রবেশ এবং এই তাঁর লীলাবতার অনুসরণ লীলা। এ যেন একই অগ্নি কাষ্ঠাদি বিভিন্ন যোনিতে প্রবেশ ক'রে নিজেই গুপ্ত সুপ্ত হ'য়ে থাকে আবার নানা ভাবে প্রকাশ পায়। বিশ্বাত্মা সেই পুরুষও তেমনি ভাবে অগ্নির মত

বিশ্বের সর্বত্র প্রবেশ করেন, তেমনি ভাবে গুপ্ত হ'য়ে থাকেন তেমনি ভাবে প্রকাশ পান।

যথাহ্যবহিতোবহ্নি দারুষেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্।
অসৌ গুণময়ৈ ভাবৈ র্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ।
স্বনির্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুংক্তে ভূতেষু তদ্গুণান্।
ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোক ভাবনঃ
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যক্-নরাদিষু॥ ভাগ ১।২।৩২—৩৪

অতএব শ্রীকৃষ্ণ যখন লীলা মানুষ, তখন তাঁর সব কাজই লীলা। শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গের সম্ভোগও তাঁর লীলা। বিশ্বের তাবৎ তন্মাত্র স্বরূপেই তাঁর প্রবেশ যখন ভাগবত সিদ্ধান্ত, তখন শ্রীরাধার অধর রস পান এটি তো স্পর্শ তন্মাত্র। এবং তাঁর অঙ্গ গন্ধ গ্রহণ এ হোলো গন্ধ তন্মাত্র। ইত্যাদি।

আর যদিও লীলা শব্দটি যুবকের বেশভূষার অনুকরণে যুবতীর বেশভুষা করা অর্থ, তা হ'লেই বা শ্রীকৃষ্ণ লীলার সঙ্গে তার বিরোধ কোথায়? শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তির প্রকাশ।

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ চৈ চঃ ১।৪
(এই সিদ্ধান্ত সহজিয়া চণ্ডী দাসেরও)

যাঁরা বলেন সম্ভোগ শব্দটিতো প্রাকৃত ভাষায় (USE) (enjoyment) বিলাসী ও বিলাসিনীর অনুরক্তি ও দর্শন স্পর্শনাদি অথবা—

চুম্বন পরিস্তুণাদি বহু ভেদাৎ।
অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগ শৃঙ্গারঃ॥
সাহিত্য দর্পণ। ৩।২১১

কিন্তু তাঁদের জানা উচিৎ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা সম্ভোগ বা অন্যোন্য সম্ভোগ শব্দার্থ প্রাকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় না। তিনি নিজে লীলা মনুষ্য অবতার যখন, তখন লীলার উপকরণে সব রসই তাঁর সম্ভোগে আসে।

তাছাড়া বৃহদ্-আরণ্যক, ও ছান্দোগ্য উপনিষদের অধ্যাত্ম বাদটির ছায়া ঘেঁসে ঘেঁসে সহজিয়ারা ভাগবতীয় ভক্তিবাদটিকে অদ্ভূত রকমে নূতন রূপ দিয়েছে—

বৃহদ্ আরণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে যেটি অধ্যাত্মবাদ অর্থাৎ "য আত্মা সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যঃ অন্তরো যৎ সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ইত্যধিভূতমধ্যাত্মম্"

এই অধ্যাত্ম বাদটিই আবার ছান্দোগ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশখণ্ডে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি।

ঔপনিষদিক এই অধ্যাত্মবাদে যেটি ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্বা মাত্রে তন্মাত্রত্ব বোধ করার ইঙ্গিত, সেইটিকেই অভিন্নাত্মা, অভিন্ন লীলা ব'লে তাঁরা শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা সম্ভোগকে ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

কিন্তু ভক্তিরসবাদের শ্লোকের ব্যাখ্যা ভিন্ন। সে ব্যাখ্যা ভাগবতীয় ভক্তিধারায় নূতন রূপ নিয়েছে গৌড়ের আচার্য্যদের লেখনীতে। সে তথ্যকে চাপা দেবার ফন্দি করেই শ্রীচরিতামৃতে অমনতর লীলা সম্ভোগের পঞ্চরস, পঞ্চতন্মাত্রের এবং পঞ্চতত্ত্বের উপস্থাপনা।

শ্রীজীব যে ঔপনিষদিক অধ্যাত্ম বিদ্যাটিকে শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২ শ্লোক এবং ১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দিয়ে ঈশ্বর বিগ্রহের এবং তাঁর স্বরূপ শক্তির এবং এই সৃষ্টিময় বিশ্বকে ভক্তিবাদের উজ্জীবন ক'রে তুলেছেন—সহজিয়ারা সে পথ মাড়ান না।

আচার্য্য শ্রীজীব বলেছেন—শ্রীভগবানের আবির্ভাব স্বেচ্ছাময়ত্বই প্রকাশ করে, এবং সে প্রকাশ পাঞ্চভৌতিক ভূতময় নয়।

"স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি" তাছাড়া আরও দেখিয়েছেন—

শ্রীভগবান সকলের মধ্যে অবস্থান করেন, এবং অবস্থানের ক্ষেত্রগুলি মায়া বা মিথ্যা নয়, তাও সত্য, তাঁর আবির্ভাবের স্থানও সত্য—

"তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া" ইত্যাদি—

এই ভক্তিবাদের ব্যাখ্যায় মানব মানবীর দেহ সম্ভোগের মত এবং নিভৃত পরিবেশে রমণ রমণীর লীলা রসেরও কিছু থাকে না।

কিন্তু সহজিয়ারা ভক্তিবাদের সেই ভাগবতীয় ধারাটিকে চাপা দিয়ে, ভারতীয় জাতির হৃদয় মর্মের প্রাণ পুরুষ পতিত উদ্ধারতা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সহজিয়া রসের সাধকরূপে চিত্রিত ক'রে শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেম সেবাকে উপেয় ক'রে, পরকীয়া রসবাদের মুখ্যত্ব স্থাপন করার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে উপায় মাত্র করে এক অভিনব 'রসিক গৌরাঙ্গ খাড়া ক'রেছেন।

তাঁদের এই প্রচেষ্টা দেখে স্বতই সন্দেহ করার অবসর এসেছে যে তাহ'লে সত্যই কি সেই ভাগবতীয় ভক্তিরসের মহাকবি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মহাকাব্যের লেখক পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক ?

নাকি তাঁর নামের আড়ালে কোন সহজিয়া রসিকই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্বাংশ ও লীলা অংশের সমন্বয় সাধন করার ছলে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সহজিয়া উপাসনাকে পোক্ত ক'রতে সহজ ভক্তিরসে আচার, এবং সহজ প্রেমের সন্ধান দিতে এই কাজ ক'রেছেন ?

—০—

শ্রীনিত্যানন্দ

(সমীক্ষা ও পরিক্রমা)

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা "ভারতের স্বাধীনতা" লাভ। কিন্তু এ স্বাধীনতা অল্প-আয়াসে আসে নাই এবং ভারতকে তা কেউ দান করে নাই; এটি এসেছে বিদেশী শাসকের সঙ্গে বহু সংগ্রাম ক'রে, বহু দুঃখ পীড়ন, বহু দেশপ্রেমিকের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার মলিন প্রতিক্রিয়া আজও সব ভারতবাসির মন থেকে বিদূরিত হয় নাই, যে প্রতিক্রিয়ার অন্তস্তলে আছে বহু পুরাতন মলিনতা সংস্কার। সে সংস্কার খুব বেশী আছে ব'লেই আজও স্বাধীন ভারতের যাঁরা কর্ণধার তাঁদে হিমসিম খেতে হ'চ্ছে সেই বহু পুরাতন তিনটি পাপ-দূর ক'রতে—দারিদ্র্য অজ্ঞতা আর উচ্চবর্ণের কাছে অবহেলিত জনতার পাতিত্য।

এই তিন শ্রেণীর মালিন্যকে আজও এক শ্রেণীর লোক ব্যাখ্যা ক'রে চ'লেছেন ভাগ্য বা পূর্বজন্মের কর্মের প্রভাবেই এসব অবস্থা অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এবং চলবে। তাই ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চ বর্ণ থেকে আগত রাষ্ট্র কর্ণধারবৃন্দ, কখন আন্দোলনের মাধ্যমে কখনও জুলুম করে সেগুলিকে বিতাড়িত ক'রতে 'বদ্ধপরিকর' ব'লে ঘোষণা ক'রে চ'লেছেন।

এসব দৃষ্টান্তকে প্রত্যক্ষ ক'রেই বলা যায়, অতীতের পরাধীন ভারতের প্রতিটি প্রদে (যখন অহিন্দু শাসকের আয়ত্বে থেকে ভারতের প্রায় প্রদেশই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল দারিদ্র্য, মূর্খতা ও পাতিত্যের কি ভয়াবহ রূপই না ছিল, এবং সে সবের প্রতিক্রি কত বিচিত্র রূপই না দেখেছিলেন প্রদেশবাসিরা ?

তাঁদেরই কি অন্তঃশক্তির সঞ্চার আজও দিকে দিকে ছড়িয়ে নেই ? নিশ্চয় আছে আর সেগুলিকেই সমাজ থেকে অপসারিত করার জন্যই কি পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হয় নাই ?

নইলে শ্রীনিত্যানন্দের প্রকটিত জীবনের সহচর মহাকবি শ্রীবৃন্দাবন দাস কেমন ক' লিখলেন তাঁর অমর গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

> প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
> মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের ঘোষণা ব

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার বুঝেছিলেন, যে কোন রাষ্ট্রের (স্বাধীন বা পরাধীন) সং কাঠামোকে ক্ষয় ক'রতে এই ত্রিতয় পরিস্থিতিই প্রত্যক্ষ কারণ।

সেই জাগ্রত পুরুষ যুগলের এই উদাত্ত ঘোষণা, তা তাঁদের অন্তর্ধানের অব্যব কালের পর থেকেই কোথায় সমাহিত হ'য়ে গিয়েছে। একদিন যাঁরা ব'ললেন তো

মানুষ হও, কিন্তু তার জবাবে জনগণ তাঁদিকে শুনিয়েছেন 'প্রভু আপনারা ভগবান আপনারা অবতার।

আরও পরবর্ত্তিকালে কতকগুলি গ্রন্থের মাধ্যমে ঘোষিত হোলো, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল অভিনব ধরণে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্ত্তন ক'রতে, আর জীবে কৃষ্ণপ্রেম দান ক'রতে।

আরও কিছুদিনের মধ্যে আরও কতকগুলি গ্রন্থের মাধ্যমে সেই বৈষ্ণবধর্মটি নূতন এক সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রলো। যাতে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের প্রাধান্য অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্বক্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম, এইটি জানাতেই শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা ক'রতে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রাচীন বৈষ্ণবতাবাদের নবরূপ দান ক'রলেন।

তারপরের যুগে এসে আরও বিচিত্ররূপ সৃষ্টি ক'রেছেন আরও কয়েকজন স্মরণীয় ভাগবত পুরুষ। তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইনি নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের জীবনীকারদের মধ্যে অন্যতম, ঘোষণা ক'রলেন—

এইত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের চিত্ত ও চরিত্রকে জানাবার জন্য এইভাবে ক্রম পরিণত লেখার গুণে, আজকের বিশ্বে অথবা আজকের ভারতের জনমানসে এই সংস্কারই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের "পরকীয়া রতির" আস্বাদনেই আত্মমজ্জন ক'রে এবং সেই পরকীয়া রতির আস্বাদন মুগ্ধতায় শ্রীগৌরাঙ্গের সমগ্র জীবনটি মগ্ন হ'য়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখার গুণে এই দাঁড়িয়েছে যে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া রতির প্রণয় রহস্যের ঘনীভূত মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

এই শেষোক্ত চিন্তাধারাটি কিন্তু যতদিন শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ জীবিত ছিলেন, ততদিন এমন মতবাদের প্রচার হয়নি।

এটি হয়েছে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের অন্যতম শক্তিধর বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাবের পর থেকে। ঐ সময় থেকেই জনমানসে প্রচার করা হ'য়েছে যে, এই পরকীয়া রতিবাদটিকে পূর্ণ রূপ দিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্ত্তি গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। এই প্রচারের পিছনে কি কৌশল অবলম্বন করা হ'য়েছিল সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রেছি এই গ্রন্থের প্রথম দিকে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরকীয়া রতির আস্বাদক শ্রীগৌরাঙ্গ এই মতবাদ য'ারা প্রচার ক'... আসছেন ত'ারাই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও উড়িষ্যার রায় রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য দেবের পরকীয়া রতির আস্বাদনে গুরুবর্গ বলে মাল্যদান ক'রেছেন।

অতএব শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া রতির আস্বাদনের মধ্যে উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম ও রা... রামানন্দের প্রভাব কিভাবে বিস্তৃত, সেটি সংক্ষেপে জানিয়ে পরবর্তি অধ্যায়ে বিস্ত... করে দেখাবো।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় উচ্চ শ্রেণীর মানুষ কিভাবে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী... মূর্খতার অন্ধকারে রেখে দারিদ্র্য ও পাতিত্যের গহ্বরে ফেলে তাদের কানে "কর্মফল... ভাগ্যের ফলশ্রুতি শুনিয়ে শুনিয়ে এক বিশেষ সংস্কার বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছেন, তাকে বিদূরিত করার জন্য অসাধারণ প্রতিভাশালী —নিরভিমান দয়াল পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দে... অকুতোভয় সাহসিক কাজ তাঁর সেই কর্মশক্তির দ্বারাই বাংলার অবহেলিত মানুষে... দল ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে অভিনব বাংলা, অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যম প্রস্তুত করেছিলেন, সে... পরিস্ফুট ক'রতে শ্রীনিত্যানন্দের জীবন দ্রষ্টা 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাসে... আলেখ্যটি উপস্থাপিত ক'রবো।

আরব্ধ প্রসঙ্গ—

অনেকের কাছে এখনও অস্পষ্ট যে উড়িষ্যার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য প্রবর্তি... বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগত কেন শ্রীনিত্যানন্দকে শুধুমাত্র বলদেবের অবতার ঘোষ... করেই থেমে গিয়েছেন, আর রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ ব'লে শ্রীগৌরাঙ্গকে চিহ্নি... ক'রেছেন—

অনেকেই জানেন, ঐসময়টি প্রতাপশালী রাজা প্রতাপ রুদ্রের শাসনাধীন উড়িষ্যা... এক ঐতিহাসিক কাল। ঐ সময়েই উড়িষ্যার মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লো... য'ারা চিরাচরিত প্রথায় অন্তরে বৌদ্ধ ধর্মাসক্ত থেকেও রাজকীয় তাড়নায় নির্দে... শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ে নিজেদিকে সামিল ক'রে নিতে বাধ্য হন। অথ... তাঁদের দ্বারা তেমনি ধরণের বাহ্য আচারের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁরা কিন্তু অন্তরে পো... ক'রতেন বৌদ্ধ ধর্মের অনায়াস লভ্য সিদ্ধান্ত বাদের মুখ্য বক্তব্যকে।

কারণ, উড়িষ্যায় যে ধরণে বৈষ্ণব ধর্মের আবরণ ও আচরণ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছি... তার সাক্ষাৎ নেতৃত্ব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করেন নাই, ক'রেছিলেন বিখ্যা... পাঁচজন, য'ারা বৈষ্ণব ধর্মাবৃত বৌদ্ধ সাধক। সেই পাঁচ জন—অচ্যুত, অনন্ত, যশোব... জগন্নাথ ও বলরাম।

এ'দের প্রায় সবারই রচিত গ্রন্থ আছে।

সে সব গ্রন্থের অনুশীলন ক'রে পরবর্তি কালে আরও বহু গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে।

১) অচ্যুতের গ্রন্থাবলি

গুরু ভক্তি গীতা। শূন্য সংহিতা। অনাকার সংহিতা।

গোপালঙ্ক উগাল ও ব্রহ্ম শাঙ্কুলি।

২) যশোবন্তের একখানি

শূন্য সংহিতা

৩) জগন্নাথ দাসের একখানি
তুলাভিনা
(৪) বলরাম দাসের বিরাটগীতা ও ভগবদ গীতাঙ্ক উৎকল "পয়ার"। এঁদের রচিত বলি উৎকলে প্রচলিত ওড়িষী ভাষায়।

এই সব গ্রন্থকারের কেউই বলেন নাই শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ভক্তিরস র ধারাই আমাদের বৈষ্ণবীয় উপাসনার ধারা, অথবা তাঁদের ভাগবতীয় মতবাদই াদের চরম লক্ষ্য অথবা ভাগবতের গৌড়ীয় ব্যাখ্যার 'পঞ্চম' পুরুষার্থ' প্রেমের সাধনাই াদের সাধনা।

তাঁরা যা যা' বলেছেন সবই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৌত্রান্তিক মতবাদের চিন্তাধারাটিকে ভাবে পোষণ ক'রে এবং বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা আচ্ছন্ন করে; এটি খুব ক্কার হ'য়ে আছে সেই পঞ্চসখার গ্রন্থ রাজির বক্তব্যের মাধ্যমে।

১। বলরাম দাসের বিরাট গীতার বিশেষ স্থল—
শুন্যার ব্রহ্মসিনা আহি
সেঠার নাম থির বহি॥ [শূন্যবাদের গম্ভীর ধ্বনি]

২। জগন্নাথ দাসের তুলাভিনা গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায়
সকল মন্ত্র তীর্থ জ্ঞান।
বইল শূন্য এ প্রমাণ॥

৩। অচ্যুতানন্দের শূন্য সংহিতায় পরিস্কার বলা হয়েছে—
কোনও একদিন তিনি দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ ক'রছিলেন, এমন সময় ভগবান বুদ্ধ তাঁর টে আবির্ভূত হ'য়ে আদেশ ক'রলেন "ওহে কলি যুগে আবার আমি বুদ্ধ রূপেই প্রকাশ রছি, কিন্তু তোমরা আমার ভাবকে গোপন ক'রে রাখবে, তোমরা পাঁচজন আমার টি শক্তি বা আত্মা, তোমরা আমার আদি শক্তি এবং সংঘের শরণাপন্ন হও। ও হে যুত! বলরাম প্রভৃতি আর চার জনকে বল আমি যা ব'লেছি তাই খুব সাবধানে াশ প্রচার ক'রবে

এই পঞ্চ সখাই উড়িষ্যার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব কবি। এঁরাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শে৷ পাদে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাঁচটি স্তম্ভ। (শূন্য সংহিতা ১২৯)

এঁদেরই প্রখ্যাত গ্রন্থ 'যশোমালিকা।' তার ১৮১ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে।
"কলিযুগে, ভক্তরা প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস ক'রছেন। সাক্ষাৎ ভাবে বুদ্ধের দর্শন হবে না।

এই পঞ্চ সখার মর্যাদা উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বেশ সু-প্রতিষ্ঠিত। বাংলায় ও কলে যে কোনও সময়ে যে কোন বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে যে 'পঞ্চতত্ত্বের' আসন পাতা হয় ঐ পঞ্চ সখাকে স্মরণ ক'রে, এ ব্যাপারে খুব লক্ষণীয় যে, বাংলাতেও বৈষ্ণবীয় নাম-র্ত্তনের অনুষ্ঠানে পঞ্চতত্ত্বের আসন পাতা অবশ্য কৃত্য। তবে বাংলার বৈষ্ণব আচারের াবে তার ব্যাখ্যা ভিন্ন, তাঁরা বলেন, এই পঞ্চতত্ত্বের আসন মানেই শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈত ও গদাধরের আসন। অবশ্য শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীবাসের ন শ্রীনরহরি সরকারের ওটি আসন বলেই প্রচার করেন। তাঁদের গ্রন্থাবলিতেও তত্ত্ব মানেই নরহরিকে নিয়ে, এই পঞ্চতত্ত্ব বাদটি শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীবের মধ্যে কেউ

এতটুকুও ইঙ্গিত করেন নাই। এটি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই প্রথম দেখা যায়। (১)

ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক পণ্ডিত মাত্রই জানেন যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের সময়ে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্মের অস্তিত্ব ভালই ছিল। কিন্তু তার ধারা দুটিপথে প্রবাহিত হোতো, একটি পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের, আর একটি শ্রীরায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের মতবাদেকে ভিত্তি ক'রে। দ্বিতীয় ধারাটি সহজিয়া পন্থীদের সিদ্ধান্তিত।

পঞ্চসখা সম্প্রদায় যে ধারাটিকে পরিচালনা ক'রতেন তাতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকৃত।

এ সম্বন্ধে অচ্যুতানন্দ তাঁর 'ব্রহ্মজ্ঞান শাস্কুলি' গ্রন্থের একাদশ কল্পে লিখেছে

যে আত্ম জ্ঞানী সাধনার
তা পদে অচ্যুত কিঙ্কর॥

তা ছাড়া তাঁর গোপালঙ্ক উগালের অষ্টম খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায়

"এই পঞ্চসখা যুগে যুগে আবির্ভূত হন, শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেম প্রচারের জন্য, এ যুগে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের আবির্ভাব হ'য়েছে।

শ্রীজগন্নাথ দাস হ'লেন পূর্বযুগের "শ্রীদামসখা"

রাধাকৃষ্ণর লীলা প্রকাশিবা পাই।
জনম হইল আম্ভে পঞ্চসখা তাঁই॥

এই পঞ্চসখা কে কে তার পরিচয় দিয়েছেন—'গোপালঙ্ক উগালের' অষ্টম খণ্ডে ১২ পৃষ্ঠায়—

এঁরা সকলেই ষোড়শ শতাব্দীর পুরুষ, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের সময় যিনি ছিলেন 'সুব... তিনিই এবার অনন্ত। যিনি ছিলেন সুবাহু, এবার তিনি অচ্যুত, যিনি ছিলেন শ্রীদা... তিনি এবার জগন্নাথ। এবার যিনি যশোবন্ত, পূর্বে তিনি ছিলেন সুদাম। আর যি... ছিলেন বলরাম তিনিই এবার বলরাম।'

এর দ্বারা খুব পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, উড়িষ্যায় প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব গ্রন্থে এবং গৌড়ের বৈষ্ণব তত্ত্ব নিরূপণের ব্যাপারে সাধকদের জন্মান্তর পরিগ্রহের প... তত্ত্বের দিক থেকে অভেদ বাদ, এক হয়েও অন্য ক্ষেত্রে ভেদ। তাছাড়া উড়িষ্যার প... সখার প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দৃষ্টিকোণ তত্ত্বাংশে সম্পূর্ণ পৃথক। তবুও গৌড়োৎকলে... এক শ্রেণীর ভক্ত উভয় স্থানের বৈষ্ণব ধর্মকে অভিন্ন করে দেখার প্রয়াস পান।

এটি পরিস্ফুট হয়েছে গোপালঙ্ক উগালের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীচিত্তরঞ্জন দা... মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তিনি ঐ গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"রাধা ভাবরে ভগবানঙ্কু মাধুর্য্য রূপের ধ্যান করি আপনাকু লীন করি দে... হেউছি, বৈষ্ণব সাধনার মূল সূত্র, ওড়িষারে সে গৌড়ীয় মার্কা রাধা ভাবনা কাঁহি?"

তারপর ঐ লেখকই বলরাম দাসের শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ভূমিকায় লিখেছেন—

১।• এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃ... ও শ্রীনিত্যানন্দ সন্দর্ভের প্রথমে দেওয়া হ'য়েছে।

"শ্রীচৈতন্যের ধর্মের সমূলসার পরকীয়া প্রেমের নাম গন্ধ পঞ্চ সখাদের সাহিত্যের নহি।"

অতএব উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রথম ধারাটির সঙ্গে দ্বিতীয় ধারাটি [শ্রীরায় রামানন্দের] ভিন্ন পথে সমান্তরালে চলতো।

দ্বিতীয় ধারাটি কেমন ও কি তার দৃষ্টিভঙ্গী? এই ধারাটির খাঁটি খাঁটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত গ্রন্থ না কি প্রচুর ছিল, কিন্তু সে সবই লোক প্রচারণায় সীমাবদ্ধ। এখন প্রচারিত মাত্র দুখানি।

(১) ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত।

(২) দিবাকর দাসের জগন্নাথ চরিতামৃত।

রায় রামানন্দের প্রবর্তিত ধারায় এঁরা স্থান পেলেও, দেখা যায় উক্ত দু'জন গ্রন্থকারই পঞ্চ সখা সম্প্রদায়ের পুরুষ, এবং দুই জনই বাংলার বৈষ্ণবধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গকে রীতিমত সম্মাননাও দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের অনুভূত তত্ত্ববাদকে বেশ বিশিষ্টস্থানই দিয়েছেন। তবে এমন সব উদ্ভট সংবাদের সমাবেশও করেছেন, যা পাঠ ক'রলে সহজেই মনে হবে, উভয় গ্রন্থকারই নানা ভুল সংবাদই সংগ্রহ করেছিলেন।

কিছুটা আবার গৌড়ের সঙ্গে মিলও রেখেছেন. যেমন শ্রীনিত্যানন্দ হলেন বলরামের অবতার। এ সিদ্ধান্ত বাংলাতেও প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বর দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন—উনি স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং পুরীধামের প্রভু জগন্নাথের অবতার। এটি বলেছেন চৈতন্য ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে।

ভক্তবৎসল জগন্নাথ, অব্যয় অনাদি অচ্যুত,
মর্ত্তে মনুষ্য দেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি॥
নদীয়া নগ্রে অবতার, পশু জন্মরু কলে পার।

আবার ঐ অধ্যায়েই তিনি এমন সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যা সহজিয়াদের সঙ্গে অবিকল মিলে যায় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কৃষ্ণ ও রাধা প্রসঙ্গের সঙ্গেও এক হ'য়ে যায়। উড়িষ্যার পণ্ডিত মহল বলেন—এ অংশে কোন প্রক্ষিপ্ত কিছু নাই।

প্রসঙ্গটি এই রকম—

একদিন শ্রীরাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে এবং তাঁর অধর চুম্বন ক'রতে ক'রতে ব'ললেন আমাদের আবার মর্ত্তে আবির্ভাব হবে। তুমি এবং আমি একত্র হব—

রাধিকা দেখি হস হস, অধর চুম্বে পীতবাস।
বেলে শুন প্রিয়বতী, জন্ম হৈব আম্ভ নিতি
তুম্ভ হইবে অবতার—.

এর পর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন কথা এমন ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন যা পাঠ ক'রলে সহজেই মনে হবে, গ্রন্থকারের এই উপাদান সংগৃহীত হয়েছে গৌড়ের

গ্রন্থমালা থেকে। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়েছেন কিছু আড্ডু বাড্ডু ঘটনা। কিছু নমুনা দিই—

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ডেকে গৌড়ে জন্ম গ্রহণের আদেশ ক'রলেন এবং বলে দিলেন—ওইখানে আমার নাম প্রচারের ভার (শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের ভার) তোমাতে অর্পিত হবে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে—নদীয়ার পুরন্দর মিশ্রের ভগ্নী চন্দ্রকান্ত দেবীর গর্ভে নিত্যানন্দ নামে বলরামের জন্ম হয়। সেদিন ছিল মকর সংক্রান্তি এবং শুক্লা সপ্তমী আর বৃহস্পতিবার। নিত্যানন্দের পিতার নাম হারু মিশ্র।

শ্রীনিত্যানন্দের নয় বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম। সে সংবাদ পেয়েই শ্রীনিত্যানন্দের জননী চন্দ্রকান্ত দেবী নবদ্বীপে আসবেন স্থির করলেন।

মায়ের প্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দ তৃপ্তি পেলেন, কারণ তিনি জানতেন আমি বলরাম এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে জন্ম নেবেনই। তাই তিনি গ্রাম থেকে নবদ্বীপে এলেন। সময় লাগলো সাতদিন।

যথা সময়ে দুই ভাইয়ের মিলন হোলো। নবদ্বীপের জনগণও আনন্দিত হ'লেন।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ ক'রে ভারতের নানা তীর্থ-ভ্রমণ করতে লাগলেন, সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ বরাবর তাঁর সঙ্গেই থাকলেন।

পরে উভয়ে নীলাচলে এসে বাস ক'রলেন। তবে মাঝে একবার গৌড়দেশে আগমন ক'রলেন।

এরপর দুই ভাই-ই সংসার ত্যাগী হলেন। তাই বংশ রক্ষার আশাই রইল না তাঁদের। এর জন্য শ্রীনিত্যানন্দের মাতা চন্দ্রকান্ত দেবী আক্ষেপ ক'রলেন, তা শুনেই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দকে আদেশ করলেন, তিনি যেন অচিরে সংসারী হন।

ঐ আদেশ পেয়েই তিনি এলেন নদীয়ায়। এখানে থাকতেন অনন্ত চক্রবর্তী। তাঁর পত্নী জাম্ববতী। এঁদের ছিল দুই কন্যা, বসুমতী ও জাহ্নবী। উভয়েই যমজ ভগ্নী।

ওই যমজ ভগ্নী দুটিকেই শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ ক'রলেন। এঁরা পূর্ব জন্মে ছিলেন রেবতীর দুটি শক্তিতে একত্র।

এঁদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব একটি ভবিষ্যৎ বাণী ক'রছেন—শ্রীনিত্যানন্দের প্রথম পুত্রের সাত বৎসর বয়সের সময় শ্রীনিত্যানন্দ এই ধরা থেকে বিদায় নেবেন।

অচিরাৎ তা অব্যর্থ হলো। শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সাত বৎসর বয়সে তাই ঘটলো। সেটি আশ্বিন মাসের জন্মাষ্টমী তিথি। ইত্যাদি—

এমনি উদ্ভট কাহিনীতে ভরা ঈশ্বর দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত। ইতিহাসের প্রতি ঈশ্বর দাসের নিষ্ঠা না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবান ভক্ত।

উড়িষ্যার ঈশ্বরদাস যেভাবেই যা সংগ্রহ করুন, আর জোড়া তালিই দিন—বাংলার বৃন্দাবনদাস লিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি ছায়াকে তিনি অনুসরণই করেছেন (১) শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দ ৯ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ (২) শ্রীনিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ

শিষ্যদের মধ্যে ১২ জন প্রধান। বিশেষ করে (১) গৌরীদাস (২) উদ্ধারণ দত্ত (৩) সুন্দরানন্দ এই তিন জনের বিশেষ গুণাবলীর কথা ঈশ্বরদাস সংগ্রহ ক'রেছিলেন।

তাঁর এইভাবে কথা কাহিনী সংগ্রহ করার ভিতর দিয়ে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব মনে করেন—ঈশ্বর দাসেরই কৃতিত্ব বাংলা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগ সাধন! আরও একটি কৃতিত্ব, ঈশ্বর দাস ব'লেছেন—অনন্ত মহান্তি ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য (ঐ গ্রন্থের ৬৪ অধ্যায়)

তিনি আরও ব'লেছেন, শ্রীনিত্যানন্দের অন্যান্য আরও শিষ্যরা ওড়িষ্যার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রায় একত্র হ'য়ে ইষ্টালাপ ক'রতেন; কিন্তু এই সঙ্গেই তিনি আর এক উৎকট সংবাদও লিপিবদ্ধ ক'রেছেন যে, গৌরীদাস পণ্ডিত ছিলেন সত্যিকারের তত্ত্বজ্ঞানী ও পঞ্চ সখার অন্যতম বলরাম দাসের শ্রীগুরুদেব।

কিন্তু এ সংবাদ বাংলার গ্রন্থকারদের লেখায় একটু ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না।

পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ তাঁর গুরু গীতায় ব'লেছেন, "শ্রীকৃষ্ণই আবার কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আর তাঁর সঙ্গে ব্রজের সখারাও বাংলায় এবং ওড়িষ্যায় নানা নামে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তবে বিশেষ ক'রে শ্রীনিত্যানন্দের যে দ্বাদশ জন পার্ষদ বা দ্বাদশ গোপাল—তাঁদের মধ্যে পাঁচজন তত্ত্বতঃ পঞ্চ সখারই অন্যতম, এবং ওঁরা উৎকলেই আবির্ভূত—"

> অনন্ত যে শিশু অভিরাম পুন হোই।
> গউরী দাস পণ্ডিত বলরাম কহি॥
> সুবাহু অটন্তি পুন উদ্ধব যে দত্ত।
> সুন্দরানন্দ যে মুই অটই অচ্যুত।
>
> গুরু ভক্তি গীতা। [১ম খণ্ড—৩২ ছন্দ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ জগন্নাথ চরিতামৃত।

এর রচয়িতা দিবাকর দাস। নির্মাণ কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ, অথবা অষ্টাদশের প্রথম।

দিবাকর দাসের গুরু পরম্পরা হোলো—আদি গুরু জগন্নাথ দাস। তাঁর শিষ্য বনমালী দাস। তাঁর শিষ্য কেলি কৃষ্ণদাস। তাঁর শিষ্য নবীন কিশোর। তাঁরই শিষ্য দিবাকর দাস। অতএব এঁদের দৃষ্টি গুরু পরম্পরা ক্রমে সেই পঞ্চসখা কেন্দ্রিক। কিন্তু তাঁদের পর পর চিন্তাধারাটি রায় রামানন্দের ধারাতেই পর্য্যবসিত হয়, এটি অনিচ্ছায় কিংবা আরও গুপ্ত ইচ্ছায় প্রসর্পিত।

অথচ খুব পরিষ্কার যে অতিবড়ি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও পঞ্চসখা সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ্য পুরুষ জগন্নাথ দাস ছিলেন গুপ্ত বৌদ্ধ সমাজের রক্ষক এবং বাহ্যতঃ বৈষ্ণব সহজিয়া বাদের সাধক।

দিবাকর দাস ব'লেছেন—শ্রীচৈতন্যদেব বড়ই কৃপা প্রকাশ করে শ্রীজগন্নাথ দাসকে "অতিবড়ি" আখ্যা দিয়েছেন। সেই থেকেই ওঁর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম "অতিবড়ি" সম্প্রদায়।

দিবাকর দাস আরও বলেছেন জগন্নাথ দাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের ঐরূপ করুণা প্রকাশ করার জন্য গৌড়ের ভক্তবৃন্দ খুব ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েন।

সে ঈর্ষা তাঁদের এত প্রবল হয় যে, শ্রীরূপ সনাতনের মত ভক্তরাও সে দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তাঁরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে নীলাচল ধাম ত্যাগ ক'রে চলে যাবার সংকল্প করেন।

এ সংবাদ শুনে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদিকে একটি চিঠির মাধ্যমে উপদেশ দেন—অমন ধরণের ঈর্ষা তোমরা পরিত্যাগ কর, শান্ত হও। এ চিঠিটি হরিদাস ঠাকুরের হাতে দেন।

তাঁর হাত থেকে চিঠি পেয়ে রূপ সনাতন ও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব এক বাক্যে এই সিদ্ধান্ত ক'রলেন—শ্রীচৈতন্যের এই উপদেশ আমরা অগ্রাহ্য করছি—

ন দেখি চৈতন্য চরণ
ন যিব শ্রীক্ষেত্রংক পুন॥

ওঁদের ওই ক্রোধের উপশম না হওয়ায় জগন্নাথ দাস নিজে যান তাঁদের কাছে এবং তাঁদের ক্রোধ দূর ক'রতে চেষ্টা ক'রে সফলকাম হন।

আবার শ্রীরূপ সনাতন পুরীতে ফিরে আসেন—কিন্তু গোপনে গোপনে চেষ্টা ক'রতে থাকেন যাতে শ্রীচৈতন্যদেব আর নীলাচলে না থাকেন; এবং অন্যত্র তীর্থ দর্শন করার ছলে এ স্থান ত্যাগ ক'রে যান।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে জানান—

রতিঃকৃষ্ণে মতিঃকৃষ্ণে, গতির্গঙ্গা তটে তটে॥
জীবিতে মরণে বাপি নীলাচল পতির্গতিঃ॥

শ্রীচৈতন্যের এইরূপ দৃঢ়তার কথা শুনে গৌড়ের ভক্তসহ শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি নিজেরাই উড়িষ্যা ত্যাগ ক'রে চলে যান। শেষে তাঁরা বৃন্দাবনে অবস্থান ক'রতে থাকেন।

তাঁদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন—তাঁদের মধ্যে মুখ্যতম দ্বাদশজন গৌড়ে ফিরে যান। ওঁরাই গৌড়ের এক একটি স্থানে পৃথক পৃথক "পীঠ" স্থাপন করেন।

এই দ্বাদশ জনের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দও একজন। দিবাকর দাসের মতে শ্রীনিত্যানন্দও একজন মহান্ত বৈষ্ণব।

এই প্রসঙ্গেই দিবাকর দাস সেই বারজন মহান্ত বৈষ্ণবের পাটের নামোল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

খরোদা গ্রাম পাট কলে, নিত্যানন্দ প্রভু রহিলে।
শান্তি পুরেন শ্রীঅদ্বৈত, পাট তাহাংর বিদিত।
খানা কোলি বিপ্রোনগর পাট অভিরাম ঠাকুর।
চন্দন পুরী পাট যেহি, তাই শ্রীদামক গোসাই॥
মল্লি পড়ারে হে'উ পাট তাঁহি জগদীশ পণ্ডিত।
রামকেলি গ্রাম পাটরে রূপক গোসাই তঁহিরে।
অগ্রদ্বীপ ঘাট যা কহি, তঁহিরে শ্রীঘোষ গোসাই॥
বাজী-পুররে পাট সাজে আচার্য গোসাইঙ্ক বিজে॥

বরানগর পাট সুন্দর শ্রীভাগবতাচার্য্যাঙ্কর।
পানিহাটি গ্রাম পাটয়ে সুন্দরানন্দ ঠাকুরে ॥
এ সনে দ্বাদশ গোঁসাই মহিমা প্রকাশিলে তাঁই ॥

দিবাকর দাসের পয়ারে মহান্তদের নাম ধামের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাঁদের সকলেই যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট কালে ঐ ঐ স্থানে বসবাস ক'রেছিলেন এটা অনৈতিহাসিক কাণ্ড। অন্তত: শ্রীনিবাস আচার্য্যের ক্ষেত্রে তো বটেই তাছাড়া অনেকের ক্ষেত্রেও।

তা ছাড়া ঐভাবে তিনি যে গল্প ফেঁদেছেন. তার দ্বারা এইটুকু বোঝা যায় যে, গৌড়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের একটা প্রচণ্ড বিরোধ ছিল। তাই উড়িষ্যার বৈষ্ণবরা অতিবড়ি সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করলেন, কিন্তু গৌড়ের নয়।

তারপর আরও বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়েছেন ঐ পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে, ওখানে ব'লেছেন—গৌড়ের বৈষ্ণবীয় রসবাদটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তরা আস্বাদনই করেন নাই।

নিত্যানন্দ আদি সমেতে, দ্বাদশ গোপাল সঙ্গতে
অমর বৈকুণ্ঠয়ে জাত এ ন জানন্তি প্রেমতত্ত্ব।

দিবাকর দাসের বক্তব্যে একটা ব্যাপারের সন্ধান মেলে যে, রায় রামানন্দ পরিচালিত বৈষ্ণব ধর্মে যে পরকীয়া রতিবাদ ও সহজিয়া বাদের মিলন ঘটিয়ে একটা কিছু যে ঘটান হ'য়েছিল বা ঘটান আছে—সে দলে নিত্যানন্দের স্থান হয়নি। তাই তিনি উড়িষ্যাবাসির কাছে মহান্ত বৈষ্ণব মাত্র। তাছাড়া আর একটি কথা, শ্রীনিত্যানন্দ নাকি গৌড়ের বৈষ্ণব মন্ত্রে নিষ্ঠাবান ছিলেন না।

হরে রাম কৃষ্ণ ত্রিনাম, মহাপ্রভুঙ্কর ভজন ॥
নিত্যানন্দ প্রভৃতি যেতে, হরে কৃষ্ণ ভজতি কর্থে।

দিবাকর দাসের জগন্নাথ চরিতামৃতের বাচন ভঙ্গিতে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পঞ্চসখার যে বৈষ্ণব ধর্ম, সেটি তাঁর আমলে তত প্রাধান্য পেতো না।

তখনকার প্রচলিত বৈষ্ণবীয় ধারাটি রায় রামানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হোতো। তিনি ব'লেছেন—বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান বক্তব্য পরকীয়া রতির আস্বাদন। যেহেতু দিবাকর দাসের মতে জগন্নাথ দাস শ্রীরাধার হাস্য থেকে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন এবং তাঁরই অংশ বলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদনও পুরোপুরি জাত ছিলেন—

শ্রীরাধাঙ্ক হাস্য ললিত, তঁহির-হেউছন্তি জাত ॥
ঐ ৭ম পৃষ্ঠা

জগন্নাথের শিষ্য ষোলজন। দিবাকর দাসও ছিলেন ঐ সাধনার পক্ষপাতী। শ্রীরাধার সখীর অংশে শ্রীজগন্নাথের জন্ম।

শ্রীঅতিবড়ি যে গোঁসাই, প্রধান অংশে জন্ম তাঁই।
তাঙ্কর যে ষোল শিষ্য, সে ষোল সখীঙ্কর অংশ।
ঐ ৪ পৃষ্ঠা।

দিবাকর দাসের স্পষ্ট অভিমত হোলো—মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য রাগমার্গে ভজনই আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

তাঁর এই অভিমতের দ্বারা বোঝা যায়—তখন রায় রামানন্দের প্রচুর প্রভাবের ফলেই ওড়িষায় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে রীতিমত দ্রুত গতিতে রাগ মার্গের উপাসনা চালু হ'য়ে গিয়েছে।

এঁর এই মতবাদটির সঙ্গে গৌড়ের বৈষ্ণবদের উপাসনা রীতিটি কেমন ক'রে যে অভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে, সে সংবাদ প্রসঙ্গক্রমে এই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' ও নিত্যানন্দ গ্রন্থে সমালোচনা বিস্তৃত ক'রে দেখিয়েছি।

এই তথ্য শ্রীচরিতামৃতে প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। কারণ শ্রীজীবের প্রকট কাল পর্য্যন্ত (১৬০০ খ্রী:) শ্রীগৌরাঙ্গের অমন পরকীয়া রতির আস্বাদন করার রীতির সংবাদ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

অতএব উড়িষ্যায় আর গৌড়ে বৈষ্ণবধর্মে এই ধরণের উপাসনা রীতিটি এর পর থেকেই অভিন্ন।

শ্রীনিত্যানন্দ কিন্তু এই পরকীয়া রতির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আছেন, তা সে উড়িষ্যাতেও এবং বাংলার বৈষ্ণব ধর্মেও। কারণ—কোন পদাবলীকারই শ্রীনিত্যানন্দকে কখনও রস কীর্ত্তনের মুখপত্র ক'রে একটিও পদ লেখেননি। অর্থাৎ রস কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা আছে—নিত্যানন্দ চন্দ্রিকা নাই। রাই মান ক'রলে তদ্‌ভাবাঢ্য গৌরও মান করেন, আবার রাস ক'রলে গৌরও রাসরসে ভাবাঢ্য হয়ে যান। কিন্তু নিতাই তা হন না।

এদিক থেকে উড়িষ্যার ঐ ধরণের বৈষ্ণব ধর্মটিতে অর্থাৎ রায় রামানন্দ পরিচালিত ধর্মটিতে নিত্যানন্দকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যাপারে উড়িষ্যা নিঃসন্দেহে অগ্রণী।

উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া রতির আস্বাদক "রাই—কানু" মিলিত বিগ্রহ যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি এত দৃঢ়তা পোষণ করে যে, আজকের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত একজন অধ্যাপকও আমাকে চিঠি দিয়ে পরিষ্কার জানিয়েছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সর্বাধিক মান্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, প্রভৃতি গ্রন্থে যথাবৎ অবস্থিত পয়ারগুলির বক্তব্য অকাট্য সত্য। কোথাও প্রক্ষিপ্ত নাই; এ বিষয়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতবৃন্দ যে ধরণেই গবেষণা ক'রে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করুন না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরকীয়া রতির (শ্রীকৃষ্ণরাধার) আস্বাদন যে উড়িষ্যা ও গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের প্রামাণ্য তথ্য, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। (১)

—শ্রীরামানন্দরায় সহজ বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু রায় রামানন্দের প্রাপ্তি কি, আর

---

(১) আমার লেখা এই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ গ্রন্থের অংশগুলি বালাশোর জেলায় (ভদ্রক) মাধব নগর, বাউদ পুরের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকিশোরী কিঙ্কর দাস এম, এ (দ্বিপ্রস্থ) বি টি মহাশয় দুখানি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়ে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন, তাতে তাঁর ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মনের ভাষাগুলি বর্জন ক'রে বাকী অংশ অবিকল তুলে দিলাম। [গ্রন্থকার]

সহজিয়া প্রীতি কি, তা 'প্রেম বিবর্ত্ত' গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—

পরস্ত্রী দর্শন স্পর্শন, সেবন বুদ্ধি হৃদে আছে যার।
পীরিতি শিক্ষায় জানিবে নিশ্চয়, নাহি তার অধিকার॥
রামানন্দ বিনা তাহে অধিকার, কেহ নাহি পায় আর।

ঐ অধ্যায়েই শ্রীরঘুনাথ দাসের প্রশ্নের উত্তরে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলিলেন—

আমি কিংবা রামানন্দ অথবা পণ্ডিত।
কেহ না বুঝিবে তত্ত্ব প্রভুর উদিত॥
তবে যদি গৌরচন্দ্র জিহ্বায় বসিয়া।
বলাইবে নিজ তত্ত্ব সরূপ হইয়া।
তখনি জানিবে হৈল সুসত্য প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দ পাবে রঘুনাথ দাস॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি কর্ণামৃত রায়ের গীতি
এ সব অমূল্য শাস্ত্র মান।
এসবে নাহিক কাম এ সব প্রেমের ধাম
অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান॥
স্ত্রী পুরুষ বিবরণ যে কিছু তঁহি বর্ণন
সে সব উপমা মাত্র সার।...ইত্যাদি

এরপর, দাস মহাশয় আরও লিখেছেন যে, কানাই খুটিয়া রচিত "মহাভাব প্রকাশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় বৃন্তে বর্ণনা ক'রেছেন যে, রায় রামানন্দ সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমরসে বিভোর হয়ে থাকতেন, তিনি—

রামানন্দ রায় পদ পাইলেক সেহু। পরম মিত্র নৃপর অটন্তিহ সেহু॥
সর্বদা কৃষ্ণ রসে মজ্জি থাই মন। সর্বদা কৃষ্ণ চরণে রত থাএ মন॥
এমন্ত কৃষ্ণ রসের বাই (পাগল) সেহু হেলা।
রাজার গহন সেহু চালি ন পারিলা॥
সেই অটে মহাপাত্র প্রতাপ রুদ্রর। মাত্রক অটই ভক্ত ভাবি নিরন্তর॥

সদা কৃষ্ণ রসে রহি থাই মতি।
সদা বলে কৃষ্ণ প্রেমে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি॥
ইত্যাদি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দকে বিশেষ প্রীতি করিতেন, তিনি প্রতাপরুদ্র এবং কানাই খুটিয়া প্রভৃতি ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলে, তাঁহারা দেখিলেন এক জ্যোতি আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তাহাতেই মহাপ্রভুকে ভাবাবিষ্ট করায়—

এথাত সাক্ষাতরে আস্তে দেখি তাই।
নৃত্যকালে দুই জ্যোতি হেলা ছু'য়াছু'ই॥

নীল ধবল মুরতি একা অন্তরে হেলা।
যুগল পরম জ্যোতি তঁহু প্রকাশিলা॥

তখন প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করিলেন এবং সেই সময়েই প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুকে বলিলেন, আপনি রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ—

অপনিত নদীয়ার পূর্ণতম শশী।
অপনিত স্বয়ং অটপূর্ণ ব্রহ্ম রাশি॥
অপনিত স্বয়ং রাধা অঙ্গ অবতার।
অপনিত সর্বজ্ঞান ভক্তি রস সার॥

রামানন্দের প্রশ্নের মধ্যেই মহাভাবের রাধা তত্ত্ব, গোপী তত্ত্ব, জগন্নাথ তত্ত্ব প্রভৃতি কি জিনিষ, তাহা মহাপ্রভু নিজ মুখে প্রকাশ করেন। এসবের কথা আমরা রামানন্দ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

রাধা অটে নারীরূপ যোগ মায়া যেনু।
পীত বস্ত্র পরিধান করি থায় তেনু
মানিনী মানঙ্কর সে মানিনী অটন্তি।
মন্দ গামিনী মানঙ্কু শ্রেষ্ঠ গামিনী বোলন্তি॥
সুন্দরী মানঙ্কু মধ্যে সে সর্ব সুন্দরী।
কৃষ্ণ রূপ মোহিনী তেজ রূপ ধরি॥
অশরীর শরীররে নিত্য সে রমন্তি।
ব্রজ কিশোরঙ্কু সঙ্গে সে ক্রীড়া করন্তি॥
কেবে শরীরের সেহু শরীর বহই।
পুন অদৃশ্য হোই ন কৃষ্ণঙ্কু ক্রীড়ই॥
রাধা যে ভাব রূপসী ভাবর তাঙ্কর।
ভাবময়ী যেনু নাম অটে তাহাঙ্কর॥
হৃদয়র ভাব বা কেলি থাকু সর্বে কহে।
সেহু রাধা জান এথি নাম বহে॥
ভাবাবেশে যেঁউ জন কৃষ্ণর সেবই।
সেহু রাধা ভাব মধ্যে প্রাপত হুতাই॥
ভাবরে মজিল কলে কৃষ্ণ আরাধনা।
রাধা ভাব ভাবে তাহা অটই ধারণা॥

রায় রামানন্দ ছিলেন শুদ্ধ ক্ষেত্র। তিনি আরোপে রাধা কৃষ্ণ ভজনা করিতেন! তাঁহার অভিমতই পণ্ডিত জগদানন্দের প্রেম বিবর্ত্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া মহাভাব প্রকাশ গ্রন্থেও দেখা যায়, স্বরূপ গোস্বামীপাদ সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন—

এ থকু তনভিয়ে এক সন্দেহ আছই।
প্রকাশ করিল প্রভু স্বরূপ গোঁসাই॥

আপনি অটস্থি সাক্ষাৎ যে অবতার।
ভাব রূপী মহাভাব প্রকৃতি স্বরূপ॥

তাহা ছাড়া প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থটির মঙ্গলাচরণেও দেখা যায় স্বরূপ দামোদরের রচিত" রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি..." এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা লইয়াই পণ্ডিত জগদানন্দও গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

অতএব রাধা কৃষ্ণ দুই এক হইয়া। অধুনা প্রকট মোর চৈতন্য গোঁসাই॥
অতএব একআত্মা শব্দ শ্রীচৈতন্য। বুঝেন পণ্ডিতগণ স্বরূপাদি ধন্য॥
ইত্যাদি

তারপর ঐ গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে—

"পীরিতি কি রূপ" এই প্রশ্ন তুলিয়া তার ব্যাখ্যায় স্বরূপ দামোদরের উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বারা পীরিতি কি তত্ত্ব এবং তারই মূর্তিমান রূপ যে শ্রীমহাপ্রভু এইটি বুঝান হইয়াছে।

দাস মহাশয়ের প্রেরিত এই পত্রে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, উৎকলে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মটির অন্তরে যে চিন্তাধারাটি অদ্যাবধি বর্ত্তমান, সেটির মৌল উৎস রায় রামানন্দ প্রবর্তিত তত্ত্ববাদ।

ও তত্ত্ববাদে শ্রীনিত্যানন্দের স্থান নাই। কারণ তিনি পরকীয়ারতির আস্বাদন করেন নাই।

আমারও বক্তব্য তাই যে, পঞ্চদশ শতাব্দার যুগচিহ্নিত পুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের মত সমাজের জনদরদী তীক্ষ্ণ, মেধাবী অসাধারণ প্রতিভাশালী, দয়ালু, জনরাষ্ট্র হৃদয় সেই পুরুষকে যাঁরা মধ্যযুগীয় রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ব'লে নির্ণীত করেছেন—(শ্রীরূপ, সনাতন, সার্বভৌম, শ্রীজীব, মুরারি গুপ্ত, কর্ণপুর, শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভৃতি, তাঁরাও কল্পনা ক'রতে পারেন নাই,—তাঁদের পরবর্ত্তীকালে বাংলায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম গ্রহণ ক'রে কোন ধূর্ত্ত সহজিয়াবাদী লেখক যে, ষোড়শ শতাব্দীর পর অমন পুরুষরত্নকে সহজিয়াদের সিদ্ধান্ত "রূপে স্বরূপ আরোপ" বাদের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে—শ্রীগৌরাঙ্গকে পরকীয়া রতির আস্বাদক ও তাঁকে রাধা কৃষ্ণের প্রণয় বিকারের নির্য্যাস রসমূর্তি ব'লে চিহ্নিত ক'রবেন এবং সেই রূপটিকেই প্রচার ক'রবেন।

এরই জন্য দেখাতে চাই যে, উড়িষ্যায় ও গৌড়ে যে একটি সহজিয়াবাদের যোগ-সূত্রের ক্ষেত্র খুব বেশী কাজ ক'রেছে এবং আজও ক'রছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরণের পরকীয়া রতিবাদে শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীবের কোথাও সম্মতি নাই। তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপও তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের বক্তব্যটি কি, তা তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

সে সব গ্রন্থের সিদ্ধান্তবাদই গৌড়ের বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান মেরুদণ্ড। সেটির পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পেয়েছিল শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রে, তাই ছিল শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম কথা এবং আদর্শ প্রচার; এইটি বিধৃত ক'রেছেন শ্রীনিত্যানন্দের জীবন দ্রষ্টা শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস দেখেছেন শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রথম আগমন ক'রেছিলেন নন্দন

আচার্য্যের বাড়িতে।

ঐতিহাসিকদের নিরীক্ষায় শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে উপস্থিতি ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে। কারণ, তাঁর আগমনের কয়েকদিন পরেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা। ঐ তিথিতেই ব্যাস পূজার আয়োজন হয়।

নন্দন আচার্য্য ছিলেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। গ্রহবিপ্র নামেই তাঁর বংশ পরিচয়। এঁর আদি নিবাস ছিল তারকেশ্বরের কাছে 'বাহিরখণ্ড' গ্রামে। পরে নবদ্বীপের দক্ষিণ পাড়ায় এসে বাস করেন। এ পাড়ার পূর্ব নাম "শ্রীহট্টিয়া পাড়া"।

বহু পূর্বে ঢাকার (সুবর্ণ গ্রাম) ভাতখণ্ড সমাজের ব্যক্তি ইনি। এঁর দেহের মধ্যে একটি পদ ছিল খঞ্জ, শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর বর্গের মধ্যে নন্দন আচার্য্যের নাম পঠিত হয়।

যে সময় শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ ক'রে নীলাচলে ফিরে আসেন, সে সংবাদ পেয়ে গৌড়বাসীদের সঙ্গে ইনিও পুরীধামে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অভ্যর্থনার জন্য, এঁরও মন খুব ব্যাকুল হয়—

নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥

এঁরই আলয়ে শ্রীনিত্যানন্দের অবস্থান প্রথম ঘটে। ওইখানেই ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ আসেন শ্রীনিত্যানন্দকে দেখতে—

ভক্ত গোষ্ঠীসহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধিয়ানে॥

তার পর আচার্যের বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়িতে বহুদিন যাবৎ অবস্থান করেন। পত্নী তাঁর মালিনীদেবী। শ্রীবাস ও মালিনীদেবী শ্রীনিত্যানন্দকে পুত্র স্নেহে ডুবিয়ে রাখেন।

শ্রীনিত্যানন্দও সেই স্নেহে এত মুগ্ধ হ'য়ে যান যে, সর্বদাই মনে করেন এই মাতা-পিতার ইচ্ছা ছাড়া আমার এতটুকু স্বাধীনতা নাই।

তখনকার নবদ্বীপ বাসীর বিস্ময় লাগে আগন্তুক এই শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতের এ বাড়িতে অবস্থান ও তাঁর প্রতি পুত্র স্নেহের ঐকান্তিকতা দেখে। শ্রীনিত্যানন্দের বয়স তখন প্রায় ৩২ বৎসর।

ভাগবত পুরুষ এবং অবধূতের বেশধারী শ্রীনিত্যানন্দ। এঁকে সবার আগে অনুভব করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। তাই তাঁরই অনুভূতির প্রত্যক্ষ মূর্তি--শ্রীনিত্যানন্দকে দর্শন ক'রতে, শ্রীগৌরাঙ্গের মনে জাগে সেই মহাভাগবতের লক্ষণটি, তাঁর আচরণ দেখেই তিনি সবাইকে বলেন "যিনি ভগবৎ কথা শুনতে পাগল, ব'লতে পাগল, যিনি কখনও উন্মাদ কখনও শিশু, কখনও নির্লজ্জ, কখনও সলাজ, যিনি কখনও কাঁদেন কখনও হাঁসেন, কখনও গম্ভীর কখনও লোক বাহ্য, কখনও লোকাপেক্ষ কখনও বৈরাগী, কখনও আসক্ত-মনা, কখনও কঠোর, কখনও গলিত চিত্তের দৈন্য আবেগে অবস্থান করেন, তিনিই ভাগবৎ অবধূত, চলুন সবাই, তেমনি মহাভাগবত পরমহংস অবধূত এসেছেন আমাদের নবদ্বীপে, নিজেকে গোপন ক'রে—অবস্থান ক'রছেন এখানে, কবে বা চলে যাবেন,

লাক প্রকাশ্য হয়েও এখন গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রছেন, চলুন চলুন, দর্শন ক'রে আসি, সই মহা ভাগবতকে. আপনারা মিলিয়ে দেখবেন মহা ভাগবতের লক্ষণ তাঁতে অহরহঃ প্রকাশ—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

ভা ১১।৩।৩৯-৪০।

শ্রীগৌরাঙ্গের অনুভূত স্বরূপের প্রত্যক্ষ মূর্তি শ্রীনিত্যানন্দের এই অবস্থাটি বহু আগে থেকেই পরিপূর্ণ রূপে ব্যক্ত হ'য়ে ছিল, যখন তিনি ভারতের প্রতিটি তীর্থ দর্শনের জন্য পদব্রজে ভ্রমণ ক'রেছেন। সেই পথভ্রমণ কালেই বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাপুরুষ মাধবেন্দ্র পুরীর সান্নিধ্য লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস সেই ইতিহাসের বর্ণনায় লিখেছেন—

কথোদিনে নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র সঙ্গে।
ভ্রমেণ-শ্রীকৃষ্ণ কথা পরমানন্দ রঙ্গে॥

চৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড।

সেই মাধবেন্দ্র পুরী ও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমী, তিনি অহর্নিশি মত্ত থাকতেন কৃষ্ণ কথায়। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের মেঘনিভ বর্ণের আভা যদি আকাশে দেখতে পেতেন তাতেও তিনি ব্যাকুল হ'য়ে হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ ব'লে ভূমিতে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়তেন।

এ'রই সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য লাভ করেন শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁরই সঙ্গে ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন তাঁর। উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে দিবারাত্রি ভরপুর হ'য়ে থাকতেন—

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন॥
মেঘ দেখিলেই—মাত্র হয়ে অচেতন॥

অহর্নিশি কৃষ্ণ প্রেমে মদ্যপের প্রায়। হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়।
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে। ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ॥ নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥

রাত্রিদিন কেহো নাহি জানে প্রেম রসে।
কতকাল যায় কেহো ক্ষণ হেন বাসে
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥

কৃষ্ণপ্রেমী মাধবেন্দ্র প্রবীণ পুরুষ, তিনিও প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ এই শ্রীনিত্যানন্দ। তাই তাঁকেও ব'লতে হ'য়েছে, এত দীর্ঘ পথ, আর এত বিশাল তীর্থরাজি, এসব দর্শন স্পর্শনের সাক্ষাৎ ফল লাভ আমার হ'য়েছে শ্রীনিত্যানন্দকে লাভ ক'রে।

ইনি আমায় গুরু বুদ্ধি করেন, তবুও আমাকে স্পষ্ট করে এ'কে বলতে হ'য়েছে, যাস, ওইটুকুই থাক, কারণ ওসম্বন্ধটি গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, ওটি আমার সঙ্গে আপনার অবশ্যই

ঘ'টেছে, এটি তো লোকায়তিক রীতি। আপনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অখণ্ড বিগ্রহ, আমার জীবনে লাভ হ'য়েছে তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, এরই জন্য—আমাকে সুদীর্ঘ দিন তিনি পথে পথে ঘুরিয়েছেন—

এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন করেন রতি মতি ॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় ॥
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥
এই মত অন্যো অন্যো দুই মহামতি।
কৃষ্ণ প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাত্রি ॥

এমনি ভাবে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতেই শ্রীনিত্যানন্দ কেমন যেন প্রেরণা পেলেন শ্রীগোবিন্দ আবার নরতনু ধারণ ক'রে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই প্রেরণা বশেই এসেছিলেন নবদ্বীপে—

নবদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ আছে গুপ্ত ভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাসের এই আলেখ্যটির অন্তরালে ব্যক্তি মনের এক চিরায়ত প্রবাহকেই বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন প্রেরণায় মন সর্বদাই অনুকূল পরিবেশ খোঁজে, গুণ যেমন নির্গুণ হ'য়েও বস্তু আশ্রয় ক'রে উভয়ে অভিন্ন হ'য়ে যায়, ঠিক তেমনি মহান্‌দের জীবন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র থেকেও অস্বতন্ত্র এবং অনুকূল আশ্রয়ে এসে যেন কর্মাবদ্ধই হ'য়ে যায়। শ্রীনিত্যানন্দের মনের স্বাভাবিক গতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহে টলমল, এটি কারও কাছে শিক্ষা পেয়ে গড়ে ওঠেনি তাঁর, কারণ তাঁর শৈশবের জীবনে বর্ণ-পরিচয়গত শিক্ষা লাভেরও এতটুকু সম্পর্ক ঘটারও অবসর ঘটেনি, সেই শৈশবেই তিনি এক পরিব্রাজক অবধূতের সঙ্গ লাভ ক'রে গৃহ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছেন। তারপর বিশাল ভারতের বিশাল মানব সমাজের চরিত্র অনুশীলন ক'রতে ক'রতে প্রায় উনিশটি বৎসর অতিক্রম ক'রে নবদ্বীপ এসেছেন।

তাই তাঁর অন্তরে এই প্রেরণাটি তিনি স্বতই পেয়েছিলেন। আর অনুভব ক'রেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের মানবসমাজে কি অদ্ভুত কি বিচিত্র মানসীকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে দৈব আর কর্মফল এবং ভাগ্যচিন্তাই তাদিকে সহনশীল করেছে। শোষক করেছে সেই সুযোগে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা মানুষের প্রতি মানুষেরঅদম্য প্রভুত্বের প্রয়াস কি আশ্চর্য্য শক্তিতে ব'য়ে চ'লেছে। এতো ঈশ্বরের বিধান নয়। এতো চতুর মানুষেরই বিধান। এমনি এক অনুভূতির মধ্যে প্রেরণা পেয়ে ছিলেন, নিশ্চয় আমার মনের ভূমির মত এমনি এক জীবন দ্রষ্টা কেউ আবির্ভূত হ'য়েছেন বঙ্গ ভূমিতে। বঙ্গ ভূমি অন্য ভূখণ্ড থেকে বেশী পতিত ভূমি।

তেমনি ধারণা তেমনি প্রেরণা নিয়েই ভারত পর্যটক অকুতোভয় মানবদরদী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমী শ্রীনিত্যানন্দ এসেছিলেন বঙ্গ ভূখণ্ডের অন্যতম রাজধানী নবদ্বীপে।

যারা তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাঁরা শুনেছিলেন তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? শ্রীনিত্যানন্দ ব'লেছেন তাঁদিকে—

শুনলাম নদীয়ায় শ্রীহরি কীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, সে প্রতিষ্ঠা শ্রীনারায়ণ স্বয়ংই ক'রেছেন, উদ্দেশ্য পতিত উদ্ধার। আমিও পতিত—

নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন
কেহ বলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুই পাতকী হেথায়॥

চৈতন্য ভাগবত। মধ্য। ৪অঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় পাতকীর দলের রূপ কেমন ছিল ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। পাতিত্য, দারিদ্র্য ও মূর্খতা এই তিনই হোলো পাতকীর সংজ্ঞা। তেমন অবস্থা থেকে মুক্ত হ'য়ে উন্নীত হওয়ার চিত্র বিংশ শতাব্দীর বাংলার গ্রামে নগরে কতখানি ঘটেছে আগামী যুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস শুনেছেন, অমনি আর এক জনদরদী পতিত উদ্ধারক কৃষ্ণপ্রেমী পুরুষ নদীয়ার নবদ্বীপে ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন এই মহা অবধুতকে দেখার জন্য অচিরেই তাঁর দর্শন পান, যিনি—

মহা অবধুত বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গতিস্থান দেখি মহাধীর।
অহর্নিশি বদনে বোলয়ে কৃষ্ণ নাম।
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার
অজানুলম্বিতভুজ স-পীবর বক্ষ।
আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়।

এঁকেই দেখার জন্য আর কাছে পাবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর পার্ষদ নিয়ে সেই খানে উপনীত হ'লেন, যেখানে সেই মহা অবধুত আত্মগোপন করার মত ভাব নিয়ে ধ্যান গম্ভীর হ'য়ে বসে আছেন. তাঁরও মনে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন বাসনা—

বসিয়া আছেন এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন এক তেজঃ পুঞ্জ সম॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহা ভক্তি যোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হোলো। শুভ দৃষ্টিপাতের মধ্যে উভয়েই উভয়ের মনোমধ্যে প্রবেশ ক'রলেন নীরবে—

সম্ভ্রমে রহিল সর্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বোলয় রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর।
এক দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়।

হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায় ॥
এই মত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত ॥
না বোলে না করে কিছু সভেই স্তম্ভিত ॥

উভয়ের নয়ন উভয়ের রূপ দর্শনে আর উভয়ের মন উভয়ের মনোবীক্ষণে নীরব নিথর হয়ে রইলো। উভয়েই উভয়ের কাছে আগন্তুক। তবুও নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গই পূর্বভাষী হ'লেন। কারণ তাঁরই নদীয়ায় শ্রীনিত্যানন্দের আগমন।

শ্রীনিত্যানন্দ তখনও শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানানন্দে মগ্নচিত্ত হ'য়ে আছেন। সেটি উপলব্ধি ক'রেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর ধ্যেয় বস্তুর একটি মধুর সুন্দর রূপকে বাণীময় ক'রে তুলতে শ্রীবাসকে ইঙ্গিত ক'রলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেছিলেন এ শ্লোক শোনামাত্রই মহাভাগবতের হৃদয় তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলবে, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ অভিন্ন হ'য়ে উঠবে, এইটুকু স্মরণ ক'রতে ক'রতেই শুনছেন শ্রীবাস তখন গান ক'রছেন—

বর্হাপীড়ং নরবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপ-বৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীত-কীর্ত্তিঃ ॥

এই শ্লোক শোনা মাত্রই শ্রীনিত্যানন্দ আরও আবিষ্ট হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'লেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝলেন এঁর এই মূর্চ্ছার উদয় কেন ? কিসে এটির উপশম হবে, তাই ঐ শ্লোকেটিকেই বার বার আবৃত্তি করার ইঙ্গিত ক'রলেন।

ধীরে ধীরে মূর্চ্ছার অবসান হো'লো

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া নাহিক চেতন ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
পঢ় পঢ় শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।
শ্লোক শুনি কথোক্ষণে পাইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈলা নয়নের জলে ॥
বিশ্বম্ভর মুখ চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
অন্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহাশ্বসে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥

এক মহাভাগবতের সঙ্গে অপর এক মহাভাগবতের এই মিলনটি ষোড়শ শতাব্দীর আদিতে বাংলার এক যুগ সন্ধির কাল।

এই মিলনের অল্প কিছুদিন পরেই মানবশ্রেণীর পতিতউন্নেতা সেই পুরুষ যুগলই, বাংলার অবহেলিত সমাজের অভ্যন্তরে স্মরণাতীত কাল থেকে সঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে যে মালিন্য রাশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তাকে বিদূরিত ক'রতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন,

য়েই এটি সন্ধিকাল, উভয়েই দয়াল উভয়েই জীবপ্রেম আর কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ।

এঁদের এই মিলনের সংবাদ নদীয়ার গ্রামে নগরে অচিরেই ছড়িয়ে প'ড়লো। শ্রীগৌ-ঙ্গ নিজেই সে সংবাদটি শ্রীঅদ্বৈতের কাছে পাঠালেন। রামাই পণ্ডিত হ'লেন সে সংবাদের হক। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে বিশেষ ক'রে জানালেন—আপনি সস্ত্রীক এখানে আসুন।

সংবাদ পেয়েই শান্তিপুর থেকে শ্রীঅদ্বৈত সস্ত্রীক এলেন নবদ্বীপে।

রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা॥
তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥

আর এক প্রবীণ মহাভাগবত শ্রীঅদ্বৈত। তাঁর বহু দিনের আশা, আমার বাংলার হরি কীর্ত্তনের ধ্বনি সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়বে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক হ'য়ে যাবার সূত্র পাবে, ঐক্য সাধন ক'রতে বাহুবিদ্যা বা ধনের অধিকারিরা আজও পারেনি আর পারবেও া, ওরা তো আরও গণ্ডী সৃষ্টি করে।

তাই তিনিও আর এক কৃষ্ণ প্রেমিকের আশায় অপেক্ষা ক'রছিলেন। এল সেই শুভক্ষণ গৌরাঙ্গের পাঠান সংবাদে তা জানতে পেরে আর কাল বিলম্ব না ক'রেই নবদ্বীপে টে এলেন—

হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভযাত্রা উদ্‌যোগ করিলেন শুভক্ষণে॥

নবদ্বীপ নগরে ত্রিমূর্ত্তির সম্মেলন ঘটলো। তাই আর কাল বিলম্ব না ক'রে স্থানীয় ভক্ত বৃন্দকে আহ্বান ক'রে সেই দিনই তাঁরা সর্ব সমক্ষে ঘোষণা ক'রলেন (প্রস্তাব শ্রীঅদ্বৈ-তের, আর অনুমোদন শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ সহ অন্যান্যের)

অদ্বৈত বোলেন, যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।
বিদ্যা, ধন, কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জ্ঞান বাধে।
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥

সে দিনের সেই ছোট্ট ঘরোয়া সম্মিলনের প্রস্তাবই পরবর্ত্তি যুগে এক ঐতিহাসিক দলিলের খসড়া রচনা—

এসব বাক্যের সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ, নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার।

তাঁদের মানবতাবাদের ঐক্য সূত্রের ভিত্তি স্থাপনের সেই ঘোষণাটি সারা নবদ্বীপ এবং নদীয়ায় অচিরেই ছড়িয়ে প'ড়লো। এঁরাও নিজেদের সেই প্রতিজ্ঞা বাণীর ঘোষণাকে পালন করার জন্য দৃঢ়ব্রত গ্রহণ ক'রলেন।

এদিকে, এমনি ধরণের কিছু একটা যে হ'তে চ'লেছে, তা নবদ্বীপের উচ্চশ্রেণীর লোক আগে থেকেই জানতেন, যাঁরা এতদিন ধ'রে সমাজের মধ্যে পাংক্তেয় অপাংক্তেয় শ্রেণীতে-দের পুরাতন ধারাকে পুষ্ট ক'রতে ঈশ্বরীয় বিধান ব'লে আত্মসর্বস্ব তাদের শোষক হ'য়ে দিন অতিবাহিত ক'রতেন, তাঁরাই ঐ ত্রিমূর্ত্তির ঘোষণা বাণীতে প্রমাদ গুণলেন—

যাঁরা তাঁদের স্মরণাতীত কাল থেকে অজ্ঞাত কারণেই, বুঝে আসছিলেন যে, কা
ফলেই মানুষের উচ্চবর্ণে জন্ম, বিদ্যা, কর্মপ্রবৃত্তি, ঘটে তাঁরাই সর্বাপেক্ষা বিমর্ষমনা হলেন।
বৈদিক আচার বিবর্জিত বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদে প্রচলিত সমাজবাদকে আঁকড়ে থেকে
অহিন্দু শাসকশ্রেণীর সঙ্গে গোপনে আঁতাত রেখে এবং বাংলার হিন্দুয়ানীর সদর দুয়ার ব
ক'য়ে, খিড়কী দুয়ারটি উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে পরমানন্দে এক শ্রেণীর মানুষকে অবহেলা
চোখে দেখতেন, তাঁদের মনে ঐ ত্রিরত্নের প্রতিজ্ঞা বাণীর ঘোষণায় আঘাত লাগলে
সজোরে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সেই অবধূত পুরুষ তাঁদের প্রতিভাকে সফল ক'র
অগ্রসর হ'লেন। তাতেও বাংলার উচ্চ শ্রেণী আরও চমকিত হ'তে লাগলেন। তাই তাঁ
কৃতিত্বের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী উচ্চ শ্রেণীটি বিশেষ চিন্তিতই হ'য়ে প'ড়লেন-

যখন— চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ গ্রামে।
তখন— ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
অর্থাৎ— গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড পড়ি কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দে নিন্দে বৃথা করি উপহাস॥

চৈঃ ভা মধ্যখণ্ড

এদিকে নিত্যানন্দ প্রমুখ জনদরদী যাঁরা, তাঁরা বাংলার অবহেলিত, পতিতে
দলকে একত্র ক'রতে প্রথম সূত্র স্থাপন ক'রলেন শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের উচ্চ রোলে
মাধ্যমে।

সুস্বরে তাল মান লয়ের সঙ্গে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই কলিযুগের সর্ব মানবের ঐ
সাধনা। হিন্দু অহিন্দু যিনি যাই হোন, এই সাধনার যজ্ঞক্ষেত্রে সকলের সম
অধিকার। জাতি, পংক্তি, ধন, মান, বিদ্যা, কুল প্রভৃতি কোন সংস্কারই এ সাধনা
বাধা সৃষ্টি করে না, এতেই আত্মার নির্মুক্ত সংস্কারে প্রতিষ্ঠা ও বিপুল আনন্দ লাভ হ

ভারতের অতি পুরাতন এই ভাগবতীয় সাধনা। সেই সাধনারই পুনরুজ্জী
ক'রতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীঅদ্বৈত ব্রত গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁরা সেটি
প্রতিষ্ঠা ক'রেই তাকে পূর্ণ রূপ দিতে, শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতিকে তাঁদের প্রচা
সাহায্যের সঙ্গী ক'রে নিলেন।

প্রতিদিনের সন্ধ্যায় তাঁরা সংকীর্ত্তন যজ্ঞের বেদী স্থাপন করেন শ্রীবাসের গৃহে,
সময় তাঁর বাড়ীর সদর দুয়ার বন্ধ ক'রে জনমানসে এক অভিনব আকর্ষণ ও কৌতূহলে
আবরণ সৃষ্টি করেন। ভাগীরথীর বারি যেমন উন্নত পতিত যে কোন মানুষের ম
অন্তর্বহিঃ শুদ্ধির অলক্ষ্য অমোঘ শক্তির সঞ্চার ক'রে তার স্রোতোধারায় টেনে আ
শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহে শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের উচ্চধ্বনিও তেমনি জনমানসকে আকর্ষণ ক'
তাকে সেই নামযজ্ঞের বেদী মূলে টেনে আনার আয়োজন ক'রলেন, সেই ভাবেই তাঁ
প্রতি নিশায় সুস্বরে নাম সংকীর্ত্তনের রোল তোলেন, আর এই ভাবেই তাঁদের অভি
ধারার সেই ব্রত পালনের প্রথম ধাপ পূর্ণ হতে লাগলো—

আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥

সংকীর্তন করিয়া সকল গণ মনে।
ভক্তি স্বরূপিণী গঙ্গা করায় মজ্জনে ॥
জগৎ উদ্ধার হউক শুনি কৃষ্ণ নাম।
পরমার্থ সে তোমরা সভার ধন প্রাণ ॥

এঁদের ঐভাবে প্রতি নিশায় শ্রীহরি কীর্ত্তনের রোল নবদ্বীপবাসীর উচ্চশ্রেণীর মনে নূতন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রলো—

শুনিয়া পাষণ্ডী সব মরয়ে বলিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥

অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের মন তাড়ি, মদ্য, মাংস সেবন প্রভৃতি যে সব আচারে নিবদ্ধ থাকতো, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়েছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস। এমনিভাবে প্রথম দু'চার জনের মধ্যে বলাবলি শুরু হয়, তারপর তাঁরা প্রকাশ্যে বলাবলি ক'রতে লাগলেন—

চারি প্রহর নিশি নিদ্রা যাইতে না পাই।
বোল বোল হুঙ্কার শুনিয়ে সদাই ॥
কটুক্তি বলিয়া মরে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দের গভীর আবেশে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন মগ্ন হ'য়ে যান, তখন শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে জড়িয়ে ধরেন, আর সেই ফাঁকে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যান্দের চরণ ধূলি গ্রহণ করেন, কারণ অন্য সময় তা সম্ভব নয়, সীতানাথ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত পুরুষোত্তম তাঁর কাছে।

ধরিয়া বলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি ॥

এই ভাবেই তাঁদের প্রতি নিশার মহান কৃত্যটি যখন সাধিত হ'তে থাকে, তখন সে দৃশ্যটি দেখতে যাঁরা লুকিয়ে থাকতেন এদিক ওদিকে, তাঁরাই আবার প্রকাশ্যে এসে ব'লতেন—

কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥

তা ছাড়া তাঁরা ব'লতে শুরু করলেন, গৌরাঙ্গের মধ্যে এতদিন এতটা বাড়াবাড়ির কিছু দেখা যায় নি, যেদিন থেকে ওই নিত্যানন্দের আগমন এই নবদ্বীপে, তারপর থেকেই এদের এই সব কার্য্যকলাপ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে, প্রতি রাত্রেই এদের নিঃসঙ্কোচ চীৎকার আর হরি ধ্বনি—

কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ ॥

অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দও যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈতের আরব্ধ কাজটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিলেন, সেটি নবদ্বীপ বাসীর চোখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যাবেশ পরিমুক্ত এবং মহা অবধূত পুরুষ। তাঁর

এ আবেশ দেখেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে ব'ললেন—ওই দেখ কৃষ্ণ প্রেমের কি অদ্ভুত স্বভাব—

ইহার ব্যভার কর্ম কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয়॥

এস এস, এই তো মহা সুযোগ। বাহ্যস্মৃতিতে ইনি যখন থাকবেন, তখন এঁর চরণের ধূলিবিধৌত বারি আমরা কোন প্রকারেই গ্রহণ করতে পারি না, ইনি তো তখনই দৈন্যভরে আমাদিকে ঠেলে দিয়ে উচ্চ সম্মান দান করেন। আজ ভালই সুযোগ পেয়েছি, চল দ্রুত গিয়ে এঁর চরণস্পৃষ্ট বারি গ্রহণ ক'রে ধন্য হই—

প্রভু বলে, মহামত্ত আছেন নিত্যানন্দ।
বাহ্যজ্ঞান নাই এঁহো কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত॥
এই যোগে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই ইঙ্গিত পাবামাত্র—

আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়।
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর রায়॥
সভে নিত্যানন্দ পাদোদক করি পান।
মত্ত প্রায় হরি বলি করায় আহ্বান॥

তারপরই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের অসাধারণ শক্তির প্রভাব কিভাবে বিস্তীর্ণ হবে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে কি মহৎ কাজটি গঠিত হবে তার ইঙ্গিত ক'রে ব'ললেন—

হাতে তিন তালি দিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সভারে কহেন প্রভু অ-মায়া উত্তর॥
প্রভু ব'লে "এই নিত্যানন্দ স্বরূপের।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমার॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের এই ইঙ্গিতই তাঁর শেষ বক্তব্য। এর পরই তিনি শ্রীনিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ কর্ম প্রচারের দ্বারা নিজের অভীপ্সীত কাজে তাঁকে দেখাতে চাইলেন, এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতি পর্বটির পূর্ব-রূপ দান ক'রতে প্রায় তাঁর একটি বৎসর লেগে গেল।

তারই মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দের সহযোগী হিসাবে, অগণিত ভক্তের সাহচর্য্যকে নিয়ে বাংলার সেই ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের এক যুগান্তকারি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন, তাতে—

বৎসরেক নামমাত্র, কত যুগ গেল।
চৈতন্য আনন্দে কেহ কিছু না গণিল॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য

শ্রীগৌরাঙ্গের আরদ্ধ 'ভক্তসংঘ' যেদিন পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ ক'রলো, তারপরই তিনি একটি প্রভাতে অকস্মাৎ আদেশ ক'রলেন—

'যাও নিতাই, যাও হরিদাস, তোমরা দুজনেই নদীয়ার পথে পথে গিয়ে জনে জনে শোনাও—

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ গুণ শিখ।

রুদ্ধদ্বার শ্রীবাসের গৃহে পূর্ণ একটি বৎসর কাল একান্ত অন্তরঙ্গ জনের দ্বারা গঠিত ভক্তসংঘ ও তার সদস্যদের মধ্যে মাত্র দু'ই জন মহাভাগবত গৃহসন্ন্যাসীকেই তিনি বেছে নিলেন তাঁর আরদ্ধ কার্য্যের প্রচারের জন্য; এবং এও তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন যে এ ধরণের প্রচারে কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে।

কারণ তখনকার সমগ্র বাংলায় যাঁরা ছিলেন উচ্চ বর্ণের শাসক, তাঁরা ফেলে আসা দ্বাদশ শতাব্দীর সেন বংশের দ্বারা প্রবর্ত্তিত তন্ত্রাচার ও তন্ত্রধর্মের উর্দ্ধে আর কোন ধর্ম আছে বলে মানতেন না এবং মারফৎদারী আচারে অভ্যস্থও ছিলেন না। আর যাঁরা ছিলেন নিম্ন-বর্ণের, তাঁরা তো উচ্চ বর্ণের দ্বারা বার বার অবহেলার ফলে প্রায় নিরক্ষর এবং দরিদ্র। তাঁরই মধ্যে যাঁরা ধনে ও শিক্ষায় কিছুটা উন্নত, তাঁদেরও এমন সামর্থ ছিল না যে, উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন ক'রে এবং রাজ আশ্রয় থেকে এমন অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান করা। প্রত্যক্ষ শাসকবর্গ ছিলেন অহিন্দু। তার উপর হিন্দুর উচ্চ বর্ণের অনেকেই ছিলেন অহিন্দু শাসকের সঙ্গে গুপ্ত আতাতে আবদ্ধ। আতাত যে ছিল সেট —*

এমন এক যুগ প্রবাহে প্রবাহিত সমাজে মানবের মহামিলনের ঐক্য মন্ত্র প্রচার ক'রলেই, উচ্চ বর্ণের কাছ থেকে প্রবল বিরোধিতা তো আসবেই। সর্ব বর্ণের সমন্বয় সাধক শ্রীহরি কীর্ত্তণের ধ্বনি শুনলেই তাঁদের পুঞ্জীভূত সংস্কারে ধাক্কা লাগবেই। হয়তো এমনও ঘ'টতে পারে যে, এর জন্য কোন মুখ্য প্রবর্ত্তকের প্রাণ সংশয় যেমন স্বাভাবিক গৃহত্যাগ করাওএকান্ত প্রয়োজন ঘ'টবে। কিন্তু যাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় সন্ন্যাসই গ্রহণ ক'রেছেন তাঁরাই এ কাজে যোগ্য প্রচারক।

নিশ্চয় তেমনি অনুশীলন জেগেছিল শ্রীগৌরাঙ্গের। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ওই দুই সন্ন্যাসী মহাভাগবতকে। যাঁরা সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্তহ' য়েও জন সাধারণের কাছে তাঁদের একজনের দেহ হিন্দুর, আর একজনের দেহ অহিন্দু পাঠান কুলের।

হয়তো তেমনি ভাবনা করে শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ ক'রলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।

* এমন কলঙ্ক জনক প্রসঙ্গ, হলায়ুধকেও স্পর্শ ক'রেছে এবং তাঁদের অনেক রাঢ়ী, অনেক বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর জমিদার ব্রাহ্মণকেও সেসকল গ্রাস করেছিল (বাংলার ইতিহাস)।

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বৈ আর না বলিবে বোলাই বা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই আদেশ যেন তাঁর সুপরিকল্পিত, তাই সহজেই এ আদেশ তাঁরা নিলেন। কারণ আদেশ পালক দুজনের দেহই সন্ন্যাসীর।

"দোহান সন্ন্যাসী বেশ যান ঘরে ঘরে"।

তারপর এঁরা যথা আদেশ তথা কার্যে ব্রতী হলেন। এতদিন ভাব আর ভাবনা মাত্রকে সম্বল ক'রে যাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন আবেশে ডুবে ছিলেন, তাঁরা এই এক বৎসরের কীর্ত্তন মহাযজ্ঞের মধ্যে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লুকানো আছে, সেটা উপলব্ধি ক'রতে পারেন নাই, তাঁরা এতদিন ভাব আর ভাবনার মধ্য দিয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গতা লাভ ক'রে ছিলেন কিন্তু সেই ভাব ও ভাবনার ভিত্তি যে বাস্তবের মধ্যে, সেটির আভাসও পান নাই তাঁরা, তাই তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটতম আদেশটি যখন শুনলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসেরই প্রতি এই আদেশ,তখন তাঁরা—

আজ্ঞা শুনি হাসে সব বৈষ্ণব মণ্ডল।

চৈঃ ভা।

কিন্তু এ' দুই জনের মনে সে ধরণের হাসি আসে নি।

তাঁরা— আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি হাস ॥

উভয়েই শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ পালন ক'রলেন তৎক্ষণাৎ। অর্থাৎ অন্যান্য সকলে তাঁর আদেশ শুনেই হাসলেন কিন্তু কাজের গুরুত্ব দিলেন না, আর এঁরা আদেশ পালন ক'রে এগিয়ে এসে হাসলেন, কারণ কাজের গুরুত্ব কতখানি তা সেই মহাভাগবত সন্ন্যাসী দুই জনেই পরিষ্কার বুঝলেন। আর যিনি উদ্যোক্তা, তিনি তো গৃহী, আর যাঁরা গৃহ পরিজনের সম্পর্ক ছাড়াও সর্বস্ব ত্যাগী, সংসারে আসক্তি রাখার মত কিছুই যাঁদের নাই, ভবিষ্যতেও যাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়া জানেন না, তাঁরাই এলেন পতিত উন্নয়নের মহান ব্রতের প্রত্যক্ষ সাধনা ক'রতে। হাসি তো তাঁদের পাবেই, এবং যাঁরা হেলায় সব কিছু ছেড়ে এসেছেন, তাঁরা তো সমাজের কত বিচিত্র মনের রূপ ও কাজ দেখেছেন।

আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।

আর, তারই মাঝে— "বোল গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥

এই কাজই তাঁদের অবশ্য কৃত্য হলো, ফলাফল নিমাই-এর করে—

তাঁরা নদীয়ার গ্রামে গঞ্জে নগরের পথে পথে গৃহীর দ্বারে দ্বারে ওই গৌরআদেশ পালন করেন, আর দিনান্তে ফিরে এসে শ্রীগৌর সমীপে নিবেদন করেন, কোথায় তারা গিয়েছিলেন, তাঁরা কি দেখলেন, কি শুনলেন কি বাধা কি আনুকূল্য পেলেন, এগুলি নিখুঁত ক'রে সব বলেন—

"এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর স্থানে কহে গিয়া ॥

দিনান্তে উভয় মহাভাগবতের মুখে প্রতিবেদন শোনার মধ্য দিয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্যই সেই আগত দিনের প্রবল বাধা কি আসবে, তারই একটি প্রকৃত তথ্যরূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। এতে যে বাধাই আসুক সে বাধা যে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য জীবন বিনিময়েও তা পূর্ণ ক'রবেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তা ভাল ক'রেই জানেন, আর শ্রীহরিদাস তো বহু পূর্ব থেকেই সর্বপ্রকার বাধা সহনে নির্মুক্ত আকাশের মত চিত্ত নিয়ে এখানে এসেছেন তাও তিনি জানেন।

তাই তিনি দিনান্তে যখন শোনেন—

ভব্য ভব্য লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥
এ মত প্রকট কেনে করিব সুজনে।
আর বার আইলে ধরি লইব দুজনে ॥

চৈঃ ভাগ মধ্য।

এসব প্রতিবেদন তো স্বাভাবিক; কিন্তু বাংলার উচ্চ বর্ণের বিকৃত রূপের প্রতিচ্ছবি যাঁদের মধ্যে প্রকটিত তাঁদের সঙ্গে এখনও কোন সংঘর্ষের বা প্রতিক্রিয়ার একটুও সংবাদ পেলেন না।

কিন্তু অচিরেই তা পেলেন। নবদ্বীপের মধ্যে আঢ়কাঠি শাসক যে ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁদের বিকৃত মনের প্রতিচ্ছবি যাঁরা, তাঁদের অন্যতম দু'জন ছিলেন সমগ্র নদীয়ার প্রতিনিধি এবং মূর্তিমান আতঙ্ক, সে দু'জনের প্রত্যক্ষ রূপ কি তা তখনও শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস দেখতে পান নি।

তাঁরা জগন্নাথ ও মাধব। পরিচিত নাম জগাই মাধাই। এঁরা ছিলেন ধনী মানী ব্রাহ্মণ কুলজাত পুরুষ। অহরহ মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, পথ ও পথিকের আতঙ্ক, খুন, জখম, ডাকাইতি, অগ্নিদাহন ইত্যাদি কাজে তাঁরা শৈশব থেকেই অভ্যস্ত, তাঁদিকে শাসন ক'রে শাসকের কারাগারে পাঠান বা অন্য কোন প্রকারে শাস্তি দেওয়া সাহস কার আছে? সে রকম প্রয়াসের সংকল্পও কারোর মনে জাগে নি, তাঁরা জানতেন—

"মহা দস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল।
সেই দুই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহ দাহে সর্বক্ষণ ॥

সমাজ এঁদের সায়েস্তা ক'রতে পারেনি, এরা ধনীর সন্তান এবং জাতি পরিচয়ে ব্রাহ্মণ। দুই দিক থেকেই এরা নির্বাধ। নিম্নবর্ণের পক্ষে তো সায়েস্তা করা অসম্ভব ব্যাপার, আর দরিদ্রের পক্ষেও তা কল্পনার ঊর্দ্ধে।

এমন অবাধগতি দস্যুদের সম্মুখে না পড়া পর্য্যন্ত—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিদিনের প্রতিবেদন শোনার মধ্যে, তাঁর প্রতিজ্ঞাত আন্দোলনটিকে সফল করার জন্যই যেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছিলেন, কিন্তু সে উৎকণ্ঠার অবসান ঘটলো অচিরেই। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস

প্রতিদিনের মত সেদিনও নাম প্রচারে বহির্গত হ'য়েছেন, পথে দেখলেন দু'ই জন মাতাল, ত'ারা পরস্পরের প্রতি অতিকদর্য ব্যবহার ও কটুক্তির দ্বারা নিজেদিকে তৃপ্ত ক'রছে। অনেকে ত'াদের এই দুর্দশা দেখে পলায়নও ক'রছে, কেউ বা আমোদ উপভোগও ক'রছে।

দুই জনে পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়
দূরে থাকি লোক সব, পথে দেখে দ্বন্দ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ।
ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
চ কার ব কার শব্দ উচ্চ করি বোলে ॥
দুই জনা কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে, থাকি দূরে ॥

আশপাশের লোককে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—

লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
কোন জাতি দুই জনে? হেন মত কেনে ॥

ব্যক্তি পরিচয়ের আগে জাতি পরিচয় জানা দরকার তখনকার দিনের আলাপের প্রথমে এই ছিল আদি ভাষণ। যদিও অনেকটা শুধ্‌রেছে এখনকার দিনে, তবুও তার নমুনা ভারতের প্রতি গ্রামে আজও মেলে। কোন ব্যক্তি দুর্বৃত্ত হ'লেও যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়, তবে তাকে সমঝে নেওয়ার অবসর থাকে, কিন্তু অব্রাহ্মণ হ'লে ঘৃণা ও ক্রোধের কারণ অবশ্যই থাকে তার ওপর। শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও মনুর বিধানে ব্রাহ্মণের লঘু দণ্ড হবে, এটা সমাজ স্বীকৃত ছিল।

তাই শ্রীনিত্যানন্দের প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা বললেন—

লোকে বলে 'গোঁসাই'? ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা, মহাকুলে উৎপন্ন।

সেই নবদ্বীপ বাসিরা আরও ব'ল্লেন—

সর্বকাল নদীয়ার পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে ॥
এই গুণবন্ত দুই পাশরিলা ধর্ম!
জন্ম হৈতে এ মত করয়ে অপকর্ম।
ছাড়িল গোষ্ঠীর লোক দুর্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥
এই দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায় ॥

নবদ্বীপ বাসীটি ব'লতে পারলেন না, এমন দু'জন দুরন্ত ব্যক্তিকে কেন সায়েস্তা করা যায় নি, অথবা করার চেষ্টাও কেন হয় নি। কারণ তাঁরা তো জানেন এদের এই দৌরাত্ম্য দেখেও জনরক্ষক শাসক উদাসীন—

"দেয়ানে নাহিক দেখা কোথায় কোটাল।"

শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে এর কারণটি যেমন পরিলক্ষিত হোলো, তেমনি বাহ্য দৃষ্টিতেও দেখলেন, এই বাংলার সমাজ শাসকগোষ্টীর মুখ্যনেতৃত্ব র'য়েছে ব্রাহ্মণ জাতির হাতে। তাঁদেরই অবহেলায় পাতিত্যের এই প্রতিচ্ছবি এই দুই ব্রাহ্মণদস্যু। এঁদের দ্বারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে দরিদ্র ও অবহেলিত যারা আর—উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও রয়েছে, একটি অবহেলিত মূর্খ ও দরিদ্র সমাজ।

অতএব উচ্চবর্ণের সংস্কার ও পতিতউন্নয়ন এই দুই কাজের ভারই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর ওপর অর্পণ ক'রেছেন।

শুনি নিত্যানন্দ বড করুণ হৃদয়।
দুই এর উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥

দয়ালু স্বভাব শ্রীনিত্যানন্দ, সহজেই বুঝলেন এই দুই জনের উদ্ধারের দ্বারাই সর্ববর্ণের মানুষের চিন্তা শক্তিকে নূতন খাতে বহাতে হ'বে, তার দ্বারাই সমাজের অনড় সংস্কারে নূতন প্রাণ সঞ্চার ক'রতে হবে। সে সঞ্চার সাধিত হবে শ্রীহরিচিন্তনের অভিনব আকর্ষণে। তা হ'লে উচ্চ বর্ণেরই প্রভুত্ব ও শোষণ ধর্মিতার অবসান হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ সুদীর্ঘ দিন সমগ্র ভারতের বিভিন্ন ভূমিতে পদব্রজে ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন, তাতে পরিষ্কার বুঝেছেন, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ জনগণকে বুঝিয়েছেন, জন্মগত অধিকার বলেই প্রভুত্ব করা তাঁদের ঈশ্বর দত্ত অধিকার। তারই জন্য তাঁরা নানান্ উপাখ্যানের মাধ্যমে পুরাণ বা পুরাতন বার্তার কাহিনী সৃষ্টি ক'রেছেন। তাঁরাই এমনি এক গল্প ফেঁদে বুঝিয়েছেন যে, বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত ক'রতে পারে একমাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁরাই বুঝিয়েছেন ব্রাহ্মণের অভিশাপে দেবতা এবং ঈশ্বর, যে কোন প্রাণী, সবাই সর্বদাই ভয়ে কাতর। অতএব ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রবাদই অপর যে কোন মানুষকে স্বর্গ ও নরকের কোন একটি স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। ব্রাহ্মণেরই মুখোচ্চারিত বাণীতে মৃৎ-কাষ্ঠ শিলার দ্বারা নির্মিত পুত্তলিকায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ব্রাহ্মণের মন্ত্রবাণীর দ্বারাই পুত্তলিকার প্রাণ বহির্গত হয়। তখন যেকোন মানুষ সেই মৃত পুত্তলিকাকে স্পর্শ ক'রতে পারে। ইত্যাদ কদর্য্য চিন্তার দ্বারা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদের পবিত্রতা নষ্ট ক'রে যে কুকর্ম সাধন ক'রে চলেছে, সেই ব্রাহ্মণজাতির অধঃপতনেরই প্রতিচ্ছবি এই দুইজন ব্রাহ্মণদস্যু। এঁদের উদ্ধার সাধন ক'রে এঁদের মস্তিষ্কে সংস্কারমুক্ত শ্রীহরির নাম-প্রেমের আধার ক'রে দেবো।

অচিরেই প্রকাশ পাবে যাদের ছায়া থেকে লোক দূরে স'রে যায়, তারাই হবে পবিত্র গঙ্গাবারি স্পর্শে শুচিতার মত প্রকটিত মূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণার এই দানই আমি বিলিয়ে যাব—

পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
এ দুইয়ে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে যে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥

তবে হবে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এই দুইয়ে করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
এখানে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন॥
যে যে জন এই দুইর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গা স্নান কৈল গিয়া॥
সেই সব জন যবে এ দোহারে দেখি।
গঙ্গা স্নান হেন মানে, তবে মোরে লেখি॥

শ্রীনিত্যানন্দের এই প্রতিজ্ঞাটি শুধু নীরব মানস পরিকল্পনা ছিল না। তিনি তাঁর সহগামী শ্রীহরিদাসের সমক্ষেই প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রলেন। তাঁর ঘোষিত এই প্রতিজ্ঞা বাণী শুনেই, শ্রীহরিদাসের ধারণা হোলো, হ্যাঁ, এবার কাজ এগিয়ে গেল, আর আমার দ্বিধা করার কিছু নাই।

শ্রীহরিদাসও জানেন, অহিন্দু শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অজ্ঞানতা পোষণ ক'রে শুধু "হিন্দু" এই নামটুকু শুনলেই মানবতাবাদ বিস্মৃত হ'য়ে, তারা হিন্দুধ্বংসে আত্মনিয়োগ করে। প্রভু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব এই দুইয়েরই কল্যাণ সাধন করার জন্যই।

তিনি শ্রীনিত্যানন্দের হর্ষপ্রফুল্ল মুখের পানে চেয়ে রইলেন, আর শ্রীনিত্যানন্দও তাঁর দিকে চেয়ে ব'ললেন—"ওহে হরিদাস! যারা অজ্ঞান, যারা পতিত, যারা মূর্খ, যারা তোমায় অশেষ বিশেষ লাঞ্ছনা দিয়েছে পীড়ন ক'রেছে, তাদের প্রতি তোমার ক্রোধ নাইতো? তুমি কি তাদের কল্যাণ সাধন ক'রতে প্রভুর প্রেরণা আদেশ পাও নাই? সেই শুভ কাজটি পূর্ণ ক'রতেই তো আজ আমাদিকে প্রভু পাঠিয়েছেন, সে সব ভোলো নাই তো?

প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবন গণে।
তাহারও করিলা ভাল, জান মনে মনে॥
আজ যদি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে॥
তোমার সংকল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে করিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা।

ক্ষণিকের মধ্যেই উভয়ে উভয়ের মানসব্রত অবগত হ'লেন,

হরিদাস বোলে 'প্রভু' শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয়॥

এইটুকু ব'লেই শ্রীহরিদাস মৃদু হেসে ব'ল্লেন—ঠাকুর! আমি একটা পশুর তুল্য আমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে? তা, আমাকে ভাঁড়াতে তোমার এত ছলা কৌশলের কি দরকার?

আমারে ভাণ্ডাহ যে পশুরে ভাণ্ডাহ।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ পরিখাহ ?

শ্রীহরিদাসের সুস্পষ্ট ভাষণের ফলে শ্রীনিত্যানন্দের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলে, তাঁকে বুকে টেনে নিলেন—

হাসি নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন ॥

দেখ হরিদাস ! আমাদের প্রতি প্রভুর আদেশ "জাতি নির্বিশেষে সবাইকে উপদেশ দিতে হবে "তোমরা কৃষ্ণ ভজ" বিশেষ ক'রে যারা আছে সবার নীচে, সবার কাছে অবজ্ঞাত হ'য়ে তাদিকেই—

বলিবার ভার মাত্র আমরা দুইর।

এইভাবে উভয়ে উভয়ের কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রে সেদিনের সমগ্র প্রতিবেদনটি জানাতে সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে উপনীত হ'লেন। সবই শোনালেন, কিন্তু তাঁদের শোনানর ভঙ্গিটি সেদিন এমন ভাবে পরিবেশিত হ'লো, যাতে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখেই প্রকাশ পায়, অতঃপর আদেশ দাতা শ্রীগৌরাঙ্গেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে নাকি ?

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ এবং জীবন যে অভিন্ন, তাই তিনিও যে এই পতিত উন্নয়নের কাজটিকে মাত্র উদাসীন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত রাখতে চাননা, দ্রুততার সংগে সম্পন্ন ক'রতে চান। কারণ বিপ্লব কখনও র'য়ে স'য়ে সিদ্ধ হয় না।

শ্রীনিত্যানন্দের জীবন হোলো, আগে আপন কর, উন্নয়নের কাজ তারই মধ্যে নিহিত. পাতিত্যের সমাধি তাতেই ঘটবে, তারপর তোমার ভক্তি প্রেমের প্রসঙ্গ, অর্থাৎ আগে উদ্ধরণ, তারপর দান। জগাই মাধাইকে আগে আপন ক'রে নাও, নির্মল চিত্ত নিয়ে উদ্ধৃত হোক আগে তারা, তারপর তাদিকে ভক্তি দিয়ে কৃষ্ণ ভজিও—

এই দু'এর উদ্ধার, পরে ভক্তি দান।
তবে জানি পাতকিপাবন হেন নাম ॥

এইটিই শ্রীনিত্যানন্দের স্বভাব প্রকৃতি। তাই শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের প্রকৃতিবার্ত্তাটি স্পষ্ট শুনিয়ে দিলেন।

তাতে শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে প্রচুর তৃপ্তি লাভ ক'রলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝলেন। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই পারবে এই পতিত উদ্ধারের কঠিন কাজটি সম্পন্ন ক'রতে। আমি তো এ কাজে তাঁর আদর্শ মাত্র। আর সেই কাজ তো আরম্ভও হ'য়ে গিয়েছে—

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর হইল উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥

হে নিতাই ! যাদের জন্য তোমার এই শুভ চিন্তা, তাদের কুশল তো অচিরেই এসে গিয়েছে—ভক্তবৃন্দ সমীপে আমি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা ক'রছি—নিতাইর শুভ দৃষ্টিপাতেই আমার মনস্কামনা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে—

বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল।

ভক্তবৃন্দও পরিস্কার বুঝলেন, সমাজে যারা অবহেলিত, পতিত, তাদিকে উন্নীত ক'রতে, উদ্ধার ক'রতে নিতাই সেই গুরুভার গ্রহণ ক'রলেন—

শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবত গণ।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা তখন॥

এই শুভ ঘোষণাটি আরও একজন পুরুষের কাছে সত্বর পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। যিনি সকলের আগে এমনি পরিকল্পনা ক'রে সমাগত শুভ দিনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন। যাঁর সদা দয়াল হৃদয় পতিত-উন্নয়নের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আজও কাঁদছে। যার সুতীব্র প্রেরণায় প্রকট জাগ্রত মূর্তি এই শ্রীনিত্যানন্দ। যাও যাও হরিদাস। দ্রুত যাও, শান্তি-পুরের সেই প্রবীণ পুরুষ সেই সীতানাথ অদ্বৈতের কাছে সংবাদ শুনিয়ে এস তাঁকে—

অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহ॥

শ্রীনিত্যানন্দের সমাজ সংস্কারের ব্রত গ্রহণ এবং তাঁকে দ্রুত গতিতে সাফল্যের রূপদান কোনও দিন র'য়ে স'য়ে বিচার ক'রে তিনি পরিচালনা করেন নাই, তাই অচিরেই প্রথম সাফল্য প্রকাশ ক'রলেন জগাই মাধাই নামক দুই ব্রাহ্মণদস্যুর পাতিত্য স্খালন ক'রে তাদিকে আপন ক'রে নিয়ে নিজের উদার চরিত্রের অনুগত ক'রে।

শ্রীগৌরাঙ্গ জানতেন শ্রীনিত্যানন্দের এই সংকল্পকে বিপর্য্যস্ত ক'রতে একটি প্রতি-ক্রিয়াশীলগোষ্ঠী নীরব থাকবে না, তাই কিছুদিনের জন্য ঐ ঘটনাকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে এবং বাহ্যত: শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে জন-জাগরণ আনতেই পূর্বের মত নগরের গ্রামের পথে পথে শ্রীহরিকীর্ত্তনের প্রবাহকে আরও প্রবল ভাবে প্রেরণা দিলেন। নিজে থাকলেন একান্ত গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ় রূপে সংকীর্তন করে নিরন্তর॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সেই গূঢ় উদ্দেশ্যকে নদীয়া তথা নবদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ ভিন্ন অর্থে প্রচার ক'রতে লাগলেন। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন, এক ধরণের ভাব উন্মাদনার বশেই বা নিমাই নিতাই নগর কীর্ত্তনের অভিনব বাতুল চেষ্টা চালাচ্ছেন, তথাপি তাঁদের আর একটি গোষ্ঠী ব্যাখ্যা ক'রেছিলেন, ভাব উন্মাদনায় পিছনে কিন্তু রহস্য অবশ্যই লুকিয়ে আছে, নইলে প্রতি রাত্রেই বা এরা কীর্ত্তনের আসর বসায় কেন? আর সে কীর্ত্তনে সর্ব সাধনের প্রবেশ নিষেধ করার জন্য দরজায় রীতিমত খিল অাঁটারই বা কি প্রয়োজন?

অমন উন্নত শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলের জগন্নাথ মাধব (জগাই মাধাই) যে আজ গৌর নিতাই-এর দলে ভিড়ে প'ড়লো, তাহ'লে তার মধ্যে কি কোন মতলব ছিল না? হ'তে পারে তারা কুকর্মাসক্ত, কিন্তু তাই ব'লে তাদিকে বোষ্টম ক'রে একেবারে অন্ধ ভক্ত ক'রে কীর্ত্তনীয়া ক'রে দেওয়াটার মধ্যে কি রহস্য নাই। তাছাড়া প্রতি রাত্রের কীর্ত্তনে বৈষ্ণবরা প্রহরাই বা দেয় কেন?

গূঢ় রূপে থাকয়ে সেবকগণ রঙ্গে?'

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর এই ধরণের অনুশীলনটি সমর্থন ক'রে, তাঁরা অভিমত প্রকাশ ক'রলেন "নিমাই নিতাইর এসব ব্যবহার রাজার গোচরে হ'চ্ছে না জেনে রেখো।"

অচিরেই ওরা বুঝবে কোনও গোপন মতলব সাধন ক'রতে হরিসংকীর্ত্তনের প্রচারণার ফল ?

এঁদের এই আলোচনাটি একদিন শ্রীগৌরাঙ্গকে শুনিয়েও দিলেন—

পাষণ্ডি সকল বোলে নিমাই পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইলে ত্বরিত ॥

তাঁরা আরও ব'ল্লেন, দেখ নিমাই! আমরা তোমার হিতৈষী প্রতিবেশী, অতএব আমাদের ভালর জন্যই ব'লছি "এই সব কীর্ত্তন টির্ত্তনের ব্যাপারে সাবধান হও—

মিথ্যা নহে লোক বাক্য সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্ জ্ঞানে সে কথা তোমারে বলিল ॥

এঁদের, গায়ে প'ড়ে ভাল কথা বলার ভিতর যে, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তা বুঝেই, শ্রীগৌরাঙ্গ বক্রউক্তিতে জবাবও দিলেন, "ভাল, ভাল, আপনাদের সদিচ্ছা অবশ্যই মানতে হবে, আপনারা আমাকে আপনাদের সঙ্গে শিশু নিমাই জ্ঞানেই তো হিতবাণী শোনাচ্ছেন, তবে কথা কি জানেন, রাজদর্শন তো সহজ নয়, এই ব্যাপারে যদি তা ঘটে, তা তো ভালই। অন্যে কোন প্রসঙ্গেই তো আমাকে কেউ খোঁজ ক'রবে না, এবার যদি তেমন ঘটে তো তা ঘটুক না।

প্রভু বোলে অস্তু অস্তু এসব বচন।
মোরো ইচ্ছা করো, রাজ দরশন ॥
পড়িনু সকল শাস্ত্র অল্প বয়সে।
শিশুজ্ঞান করি মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে।
মোরে খোঁজে হেন জন, কোথাও না পাই।
যে বা জন খোঁজে মোরে, মুই ইহা চাও ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এমনি ধরণের জবাবে স্থানীয় ব্যক্তিরা বুঝলেন, এ ধরণের ভয় দেখানোর কথায় ইনি নরম হবার নন, তাই তাঁরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, তাই হোক, রাজা নিজেই আপনার কীর্ত্তন শুনবেন। কিন্তু রাজা যে আপনার মত অত লেখাপড়া জানেন না, পাণ্ডিত্যও নেই তাঁর, তিনি যবন—

পাষণ্ডী বোলয়ে রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য চর্চা, রাজা সে যবন ॥

সেদিনের মত, অমনি অল্প হাল্কা ধরণের আলাপেই কেটে গেল। ঘটনাটিকে কিন্তু অত লঘু ক'রে দেখলেন না শ্রীগৌরাঙ্গ—

তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥

ভক্তবৃন্দকে ডেকে ব'ল্লেন, আজকের উক্তি প্রত্যুক্তি শুনেছেন আপনারা। তা যাক, আসুন আমরা কীর্ত্তন প্রসঙ্গ করি—

প্রভু বোল হৈব আজ্ঞি পাষণ্ড সম্ভাষ।
সংকীর্ত্তন কর সব দুঃখ যাউ নাশ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই ইঙ্গিত সর্বদার সহচর যাঁরা, তাঁরা ভাল ক'রেই বুঝলেন, সমাজে যাঁরা উচ্চবর্ণ, তাঁরা যে খুব গোপনে যবন রাজের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছেন এবং শ্রীহরিকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ যে সর্ববর্ণের সমন্বয় ঘটাতে চ'লেছেন এবং সেটির মূলকেই যে আঘাত ক'রতে চান, তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথম থেকেই তাঁর একান্ত সহচর পার্ষদ ভিন্ন অন্য কাউকে সান্নিধ্য দিতেন না, এই ইঙ্গিতের পর থেকেই নূতন একটি ধারার প্রবর্তন ক'রলেন, সেটি, দিবা ভাগেও পথে পথে ভক্ত বৃন্দের দ্বারা উচ্চ রোলে শ্রীহরিকীর্তন। উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ হোক্ নবদ্বীপের উচ্চবর্ণদের ব্যবহার। আর অবহেলিতদের আকর্ষণ। সে কীর্তনের মধ্যে নাম মন্ত্রের একটি অভিনব চিত্তাকর্ষক দীক্ষাদানের সুরও নিহিত ক'রলেন, যে মন্ত্রটিতে দীক্ষা লাভের জন্মগত অধিকার সকলেরই আছে। যে মন্ত্রের সাধনায় ঈশ্বর আরাধনা সহজেই হয়, যিনি নামরূপে সর্বদাই বর্তমান থেকে প্রতিটি মানুষকে আপনজন ব'লে গ্রহণ করেন, এমনি বোধ জাগ্রত হবে। এইটিই তাঁর নব কল্পিত কীর্তন ধারা।

তারপর, অচিরেই নবদ্বীপবাসী জনগণ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের পথে পথে কীর্তনের এক অভিনব স্বর ও তাঁদের দর্শন পেতে লাগল—

> কোন নগরিয়া বলে বসি থাক ভাই।
> নয়ন ভরিয়া দেখ, বসি এই ঠাঁই ॥
> সংসার উদ্ধার লাগি নিমাই পণ্ডিত।
> নদীয়ার মাঝে আসি, হইলা বিদিত ॥
> ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতিদ্বারে ॥
> করিবেন সংকীর্তন বলিয়া সভারে।
> দিবস হইলেই সব নগরিয়া গণ।
> প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥

প্রতিদিনের প্রভাত থেকেই তাঁরা পথে অপেক্ষা করেন, কখন আসবেন স্বগণ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ কীর্তন ক'রতে ক'রতে। তারপর অচিরেই তাঁরা তাঁদিকে দর্শন করেন আর শুনতে পান—

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
> হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এতেই আছে দীক্ষা মন্ত্রেরও উপদেশ। গণসহ কীর্তনের মাধ্যমে এই ভাবে অভিনব ধারায় কীর্তন কখনও শোনেন নাই নদীয়াবাসী।

> আপন স্বভাবে প্রভু করে উপদেশ।
> কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥

মাঝে মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়ান, আর সবাইকে ডেকে বলেন—তোমরা এই মন্ত্রটি জপ ক

> প্রভু বলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
> ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

এই মন্ত্রের উপদেশেই নদীয়ার অবহেলিত যাঁরা, তাঁরা অনায়াসেই শ্রীগৌরাঙ্গে

মন্ত্র শিষ্য হ'তে লাগলেন, সকলেই পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে দীক্ষামন্ত্র। বাংলায় এভাবে প্রকাশ্যে দীক্ষা দানের প্রচার ইতঃপূর্বে কেউ কখনও শোনেন নাই।

প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সভে গেলা নিজ বাস॥

সেই দিন থেকেই তাঁরা গুরুদত্ত মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা পেতে লাগলেন, এতদিন ব্রাহ্মণ সমাজের কোন ব্যক্তিই যা কখনও করেন নাই, তাঁরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য ব্যক্তি শূদ্র, সৎশূদ্র ও অন্ত্যজ ব'লেই সমগ্র বাংলার মানুষের প্রায় সাড়ে তিনভাগ ব্যক্তিকে অবহেলার চোখে দেখে আসছিলেন।

আজ সেই অবহেলিতের দলই পেলেন নূতন জীবন, উন্নত অভিনব সংস্কৃতির স্বাদ। তাঁরা তাঁদের ধ্যানের মূর্তি আর তাঁকে আরাধনা করার মন্ত্র পেয়ে নব জীবন লাভ ক'রলেন—

নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায় মনে করে ধ্যান॥

কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের শ্রীগুরুদেবের নূতন আদেশ শুনলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব'ললেন, তোমরা যে মন্ত্র পেয়েছ সেটি দীক্ষামন্ত্র, আর নিরন্তর জপের মন্ত্র একবার শোন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই, তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

অহর্নিশি নাম কীর্ত্তনের আদর্শ বাণীও তাঁরা লাভ ক'রলেন। তারপর থেকেই—

সন্ধ্যা হইলে আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥

শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে শিষ্যবৃন্দের দীক্ষা লাভ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। দীক্ষা মন্ত্র দান করার পর গুরুদেবের কাছে আর জাতি বর্ণের পার্থক্যের প্রশ্নই থাকে না। সবাই তখন আপন জন। সকলেই শ্রীগুরুদেবের অঙ্গস্পর্শ ও আলিঙ্গন লাভের যোগ্যতা লাভ করে। নদীয়ার সমাজের অবহেলিতের দল সেই সৌভাগ্যই লাভ ক'রলো। এই বাস্তব ঘটনা লক্ষ্য করেই একদিন এই বাংলায় একটি পদ রচিত হয়—

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"

চৈতন্য ভাগবত রচয়িতাও তাকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছেন—তাঁর গ্রন্থে—

এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করেন করান নিত্য শচীর নন্দন।
সভারে আনিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেন সভাকারে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে সকলে একান্ত আপন জন হ'য়েই সংকীর্তনের রোলে নবদ্বীপ মাতিয়ে তুললেন। তাঁর এই অন্তরঙ্গতাও কারুণ্য প্রকাশের প্রত্যক্ষ ফল লাভে, বাংলায়

চিরকালের অবহেলিত অবদমিত পতিত শ্রেণীর বুকে নূতন বল সঞ্চারিত হোলো, তাঁদের মুখে ফুটে উঠলো সেই উল্লাসের ধ্বনি, যেটি এতদিন একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের উচ্চার্যই হোতো না, তাঁরা বুক ফুলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সুস্বরে গাইতে লাগলেন—

ওঁ হরি রাম রাম, ওঁ হরি রাম—
হরি ওঁ রাম রাম, হরি ওঁ রাম।
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম ॥

এমনি এক অলক্ষ্য ব্যাপ্ত শক্তি সঞ্চার ক'রে নিত্যাই তাঁরা হরিনামের কীর্ত্তন ক'রে চললেন—

দান করি হরিনাম বলিতে বলিতে।
সপার্ষদ নৃত্য করেন নদীয়ার পথে ॥

তাঁদের এই ভাবে তাঁর নর্ত্তন কীর্ত্তনে পথের যে কোনও পথিকও এসে তাতে যোগ দিতেন—

দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়া গণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সভে করেন কীর্ত্তন ॥

সর্ব বর্ণের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের এই নর্ত্তন কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারতেন না এক শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা হাস্য পরিহাস করতেন—

বহির্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে।

বহির্মুখ যাঁরা. তাঁরা ঐ নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করেন, শ্রবণ করেন—দূর থেকে, তাঁরা যে শুধু হাস্য পরিহাসই ক'রতেন না, ভিতরে ভিতরে এমন একটি কাণ্ড ক'রছিলেন— যেটি প্রকাশ পেয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যে, সেটি অকস্মাৎ কাজির অত্যাচারের দিনে।

সেদিন নবদ্বীপের পথে পথে সর্ব সাধারণ যখন কীর্ত্তনে প্রমত্ত, ঠিক সেই সময়েই কাজী আসছিলেন সেই পথে, তাঁর এমন হঠাৎ আসাটার পিছনে কি কারণ ছিল, সেটি সহজেই অনুমান ক'রেছিলেন ভক্তের দল,—

কাজি শুনতে পেলেন সংকীর্ত্তনের বাদ্য ভাণ্ডের সঙ্গে উচ্চরোলের কীর্ত্তন—

একদিন দৈবে যেন কাজি পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দিকে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥

কাজির সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে লেখা আছে—

'কাফিরের (মূর্ত্তি পূজকের) কোন কলরবই মুসলমানের একেশ্বর চিন্তার অনুকূল নয় ॥

যারা আল্লাহ ও পয়গম্বরদের অস্বীকার করে, তারা কাফির···তাদের লাঞ্ছনায় আযাব তৈরী ক'রেছি—।

(অনুবাদ) আল কুরান, ষষ্ঠ পারা, ১৫১ সুরা নিছা।

সেই শাস্ত্রবাণী স্মরণ ক'রেই সংকীর্ত্তন গায়কদের লাঞ্ছনা করার জন্য অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিলেন।

কাজির এই অত্যাচার আকস্মিক নয়। তিনি ব'ললেন, দেখি তোদের নেতা নিমাই আচার্য কি ক'রতে পারে—

কাজি বোলে ধর ধর আজি করে'। কার্য্য।
আজি বা কি করে, তোর নিমাই আচার্য্য ॥

ঐটুকু মাত্র ব'লেই তিনি—

যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার করিল দ্বারে ॥

এমনি অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণাও ক'রলেন—নদীয়ায় এই ধরণের হিন্দুয়ানি চ'লবে না। নিমাইয়ের দল যেন এই ধরণের কাণ্ড ক'রতে আর অগ্রসর না হয়।

কাজি বোলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়ায়।
করিমু ইহার শাস্তি নাগাল পাইয়া ॥

আমার আদেশ পালন হ'চ্ছে কিনা, আমি এবং আমার লোক এসে টহল দেবে। সত্যই সেই ব্যবস্থাই ক'রলেন তিনি।

এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লইয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া ॥

কাজির প্রহরায় নবদ্বীপে বেশ আলোড়ন প'ড়ে গেলো। জন সাধারণ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। কেউ কেউ এমনও ভাবলেন, থাক্ তবে পথ কীর্ত্তন, মনে মনেই কীর্ত্তন করি। এ'দের আতঙ্ক দেখে এক শ্রেণীর লোক খুবই তৃপ্তি পেলেন, তাঁরা ব'ললেন—

পুরাণে তো কোথাও এমন হুড়োহুড়ি ক'রে ঈশ্বরচিন্তার কোন কথাই লেখা নাই, তবুও এরা এই সব কাণ্ড ক'রছে, এর ফল শীগ্‌গির পাবে এরা, ঈশ্বরই এর ব্যবস্থা ক'রবেন, শাস্ত্রে তাই বলে—

লইতে পার বা যদি, লও মনে মনে।
হুড়া হুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে ॥
লঙ্ঘিলে শাস্ত্রের বাক্য এই শাস্তি হয়।
জাতি করিয়া ও এগুলার নাহি ভয় ॥

এবার মজাটা দেখুক, নিমাই পণ্ডিত এবার কেমন ক'রে কীর্ত্তনিয়া ভক্তদিকে রক্ষা ক'রতে পারে দেখি। কাজি ওর দর্প চূর্ণ ক'রবেই—

নিমাই পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে ॥

আর ওই যে নিতাই, উনি তো একেবারে বেপরোয়া, ওঁকে পেয়েই নিমাইয়ের বল বেড়ে গিয়েছে। আমরা উচিৎ কথা বলি, তাই আমরা হ'য়েছি পাষণ্ড, উঃ নদীয়ায় কি ভণ্ডামিই না ঘ'টলো—

নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন দিন বাহিরায় রঙ্গ ॥

উচিৎ বলিতেই হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥

সেদিনে কাজির অত্যাচারে এবং পরবর্তী সময়ে কাজির প্রহরীদের ব্যবহারে আতঙ্কিত শঙ্কিত হ'য়েই কীর্ত্তনকারির দল এসে, শ্রীগৌরাঙ্গের ; নিত্যানন্দের কাছে—নিবেদন ক'রলেন, "আমাদিগে কি নদীয়া ছেড়ে চ'লে যেতে হবে ? কাজির লোকজন নদীয়ার পথে এসে ঘোরা ফেরা ক'রছে।

আপনাদের কাছে এসে নিবেদন ক'রলাম—

নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে ?
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে ॥

এতদিন তাঁরা উচ্চবর্ণের অবজ্ঞায় থেকেও কোন দিন কারোর কাছে বলেন নাই যে, নবদ্বীপ নদীয়া ছেড়ে চ'লে যাবার শঙ্কা ঘ'টেছে, কারণ—তাঁরা মনে ক'রতেন, এই আমাদের নিয়তি, এই আমাদের কর্মফল। কিন্তু এখন তাঁদের জাগ্রত চেতনায় বুঝেছেন, মানুষের তৈরী এই অত্যাচার, এটা ঈশ্বরের আঘাত নয়, পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে মানুষেরই আঘাত। অর্থাৎ—ভাগ্যবাদিরাও বুঝেছেন, এটা ভাগ্যান্বেষিদের কাণ্ড।

এমনি ভাবে আহতমনদের আবেদনগুলি শুনেই, শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ অন্যান্য পার্ষদবৃন্দকে। নিতাই ! সাবধান হও, দ্রুত প্রস্তুত হও, অচিরেই এর বিহিত ব্যবস্থা ক'রতে হবে, প্রতিটি বৈষ্ণবের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দাও—আর আমাদের আপনজনের কাছেও শঙ্খনাদে ঘোষণা কর, দেখি কে কি করতে পারে—

কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্তিধর ॥
সর্ব নবদ্বীপে আজ করিমু কীর্ত্তন।
প্রভু বোলে, নিত্যানন্দ ! হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সর্ব—বৈষ্ণবের স্থান।
দেখো মোরে কোন কর্ম করে কোন জন ॥

এমনিটি যে ঘ'টবেই শ্রীগৌরাঙ্গ তা বহু পূর্বেই বুঝেছিলেন, এ ঘটনা যে কাজির স্বেচ্ছাকৃত নয়, এটি হিন্দুদেরই একটি বিশেষ ধরণের উচ্চ শ্রেণীর গোপন প্রচেষ্টা, তাও জানতেন।

কিন্তু হিন্দুদের এই গোপন তৎপরতাকে বাধা দিতে গেলেই, কাজির প্রকাশ্য অত্যাচারকেই আবার আহ্বান করা হবে, কারণ, আপাত দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান উভয় নাগরিকই রাজ শাসনের আওতায় সমান শাসন পাবার যোগ্য হ'লেও, শাসক শ্রেণীর কাছে কিন্তু মুসলমানই আনুকূল্য পাবার বেশী অধিকারী, এক্ষেত্রে কাজির শাসনকেই খর্বিত করার বেশী প্রয়োজন, তারই দ্বারা হিন্দুদের বিশেষ গোপন প্ররোচনাটি অবশ্যই নিরাশ হবে। এমনটি মনে ক'রেই শ্রীগৌরাঙ্গ এক অভিনব বিজয়াস্ত্রের উদ্ভাবন ক'রলেন যার নাম 'ঘেরাও করা'।

এ অস্ত্র প্রয়োগ ক'রতে গেলে, প্রথমেই হয়তো কিছুটা বিশৃঙ্খলার পরিবেশ ঘটা সম্ভব নয়, কিন্তু কাজির সাহায্য ক'রতে নিশ্চয় কোনও হিন্দুই অগ্রসর হবে না, তাতে ন্দুর বিশেষ শ্রেণীর গুপ্ত প্ররোচনাটি নগ্ন হ'য়ে প'ড়বে, আর তেমন ক্ষেত্রে ঐ বিশেষ শ্রণীর প্রকৃত রূপটির যে পরাভব সৃষ্টি, তাও ভাল ক'রে কাজি বুঝবেন, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ কাশ্যেই ঘোষণা করলেন—

দেখ, আজি কাজির পোড়াও ঘর দ্বার।
কোন কর্ম করে দেখো, রাজা বা তাহার॥

এই ভাবে তাঁর ঘোষণা বাণীর মর্মবীজটি হোলো, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচার রা নয়, নিজের অনমনীয় অথচ কোমল ও স্নেহ প্রীতির ব্যবহারের দ্বারা তাকে অনু- ল পথে আনা। স্নেহ ও প্রেমের শাসন অক্ষয়, দণ্ডের দ্বারা যে শাসন সেটি প্রতিক্রিয়ার থ প্রস্তুত করে। তাই অমন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব'ল্লেন—

প্রেম ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল
পাষণ্ডী গণের হইব আজি কাল।
চল চল ভাঙ্গি সব, নগরিয়াগণ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥

সবাই নির্ভয় হও। মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত ক'রেই সকলেই একত্র হও, প্রস্তুত 'য়ে এস—হাঁ্যা—বাড়ি থেকে আসার সময় প্রত্যেকে একটা ক'রে মশাল নিয়ে এসো—

তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥

যথা ঘোষণা তথা কাজ। নবদ্বীপের একটি নির্বাচিত স্থানে যথাসময়ে সকলে এসে উপস্থিত হ'লেন, প্রত্যেকের হাতে মশাল, আর মশালের তেল ফুরিয়ে গেলে, আরও তেল দিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য আর একটি ক'রে তেলের ভাঁড়ও সঙ্গে এনেছেন সবাই।

দেখতে দেখতে বেলা গেল। তারপরই শুরু হোলো সংকীর্ত্তনের বিপুল সমাবেশ। সকলের আগে শ্রীঅদ্বৈতের দল। দ্বিতীয় দল শ্রীহরিদাসের। তৃতীয় শ্রীবাসের, আর সবার শেষে শ্রীনিত্যানন্দ সহ শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। পরে পরে থাকলেন গদাধর' বক্রেশ্বর, মুরারি, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস' রামাই, গোবিন্দানন্দ, চন্দ্রশেখর' বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর, গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য্য ও শুক্লাম্বর প্রভৃতির দল। অর্থ্যাৎ প্রতিদলে যদি কম ক'রেও পঞ্চাশজন থাকেন, তবে অন্ততঃ দেড় হাজার সহকর্মী নিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ তাঁদের সংকীর্ত্তনের বিরাট মণ্ডলী নিয়ে যাত্রা ক'রলেন।

যাত্রার শুভ সংকেত হোলো। "হরিবোল—এই মাত্র ইঙ্গিত ধ্বনি শুনেই সংকীর্ত্তন-বাহিনী অগ্রসর হ'লেন। বাহিনীর মুখে প্রবল রোলে উঠেছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত শিক্ষায় সেই ধ্বনি, যেটি এতদিন কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারোর মুখেই উচ্চারিত হোতো না—

হরি ওঁ রাম রাম হরি ওঁং রাম ॥

প্রথমে তাঁরা গঙ্গার তীরে এসে উপনীত হ'লেন, তারপর মাধাই ঘাটে।

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সভার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে।

এখান থেকে কাজির বাড়ি বেশী দূরে ছিলনা, তাই কাজির উদ্দেশে স্পর্দ্ধা-ব্যঞ্জনার সুরে চৎীকার আর তেমনি উচ্চ রোলে কীর্ত্তনের ধ্বনি তুললেন। এঁদের এমনি ধরণের উল্লাস শুনে হিন্দুদের সেই বিশেষ শ্রেণীর লোকের হৃদয় যেন জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলো—

মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া।

পাষণ্ডীদের মনে কল্পনা ছিল, এদের এমনি ধরণে পাগলামির চীৎকার শুনে কাজি এসে প'ড়লে সব ঠাণ্ডা ক'রে দেব—

সকল পাষণ্ডী মেলি গণে মনে মনে।
গোঁসাই করেন, কাজি আইসে এইক্ষণে।

কিন্তু তাঁদের সে কল্পনার ফল দেখা দিলো না। বরং সংকীর্ত্তন—বাহিনী তেমনি উল্লাসের সঙ্গে নবদ্বীপের প্রান্তসীমা সিমুলিয়ায় এসে উপস্থিত হ'লো। ক্রমেই সে বাহিনী কাজির বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

ওদিকে কাজিও বুঝতে পেরেছিলেন এমন স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে এখুনি কিছু করা ঠিক নয়, আর আগেই জানা দরকার, এমন ভাবে হিন্দুয়ানিকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্য কি?

মোর বোল লঙ্ঘিয়া, কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আস, তবে চলিব আপনি॥

কাজির লোক, ব্যাপার কি জানার জন্য এগিয়ে এসেই, মাথার পাগড়ি খুলে লুকিয়ে অন্য পথে গিয়ে কাজিকে সংবাদ দিলে। সে ব'ল্লে 'হুজুর! নবদ্বীপের যে কীর্ত্তন কারীর দলের ওপর এবং আমরা যাদের উপর অত্যাচার ক'রেছি, তারাই আরও অনেক লোকজন নিয়ে, এ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে, আর ব'লছে—বেরিয়ে এস কাজি! আজ আমরাই তোমায় উত্তম সাজা দেবো।

যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা॥

দূতমুখে সে কথা শুনেই, কাজি পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ ক'রলেন হিন্দুরা অত্যাচার, অস্ত্রভয়, দণ্ডভয় অপেক্ষা জাত মারার ভয় বেশী করে, ওদের উপযুক্ত শাস্তি হোলো "জাত মারার ব্যবস্থা করা—ওদের ধর্ম অপেক্ষা জাত বড়।

তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে।

এদিকে তখন শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনের দল কাজির দুয়ারে এসে উপস্থিত। কাজি হ'লেন পুরোপুরি অসহায়, তাঁর বাড়ির চারদিকে শুরু হ'য়েছে 'ঘেরাও। কাজি সদর বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘেরাওকে আরও বাড়িয়ে তুললেন,।

তাঁর দুয়ারে তখন প্রবল চাৎকার, আর—প্রবল করাঘাতের শব্দ। সবার ওপরে ভেসে আসছে—শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠধ্বনি।

তারই মধ্যে কিছু ভক্ত উচ্ছৃংখল আচরণ ক'রে, কাজির বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে

ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেটি ছিল বাইরের মহল। বাগান বাড়ী।

সহচরদের এই আচরণ থামাতে সঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরোধ ক'রলেন, থাক এসব কাজ, কাজি যখন আমাদের করায়ত্ত্ব এবং অনিচ্ছাতেও বাধ্য হ'য়েছে এবং তিনি কোনও রকম প্রতিরোধ করারই আয়োজন করেন নাই, তখন. সু-উচ্চরোলে শুধু কীর্ত্তন করাই উচিত।

সত্যই, কাজি তখন আর তার কোন রকম প্রতিরোধে করার ব্যবস্থাই করেন নাই। এই বিশাল অহিংস সত্যাগ্রহী বৈষ্ণবের দলকে এতটুকুও প্রত্যাঘাত কর'লেন না। হয়তো কাজীর প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাবটাই বৈষ্ণবের কীর্ত্তনের রোলের প্রভাবে কেমন এক অদ্ভুত ভাবেই অন্যপথে চিন্তার পথ নিয়েছিল। মুসলিম সংস্কৃতির দূরদৃষ্টিই বা প্রতিহত হ'য়ে যায়' এই ভেবেই বা কাজি আনমনা হ'য়ে নিশ্চুপ হ'য়ে ছিলেন। আর শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অমোঘবীর্যপ্রভাবই বা কাজিকে বিচলিত ক'রে তাঁকে একটা আপোষ আলোচনার পথে আনতে চাইলে॥

এক্ষেত্রে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের বিস্ময়কর আচরণই যে কাজির মতিগতিকে ভিন্ন পথে প্রভাবিত ক'রেছিল, তা নিঃসন্দেহ,কারণ—কাজির সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের যে প্রতিরোধ আক্রমণ, তার ধরণ ছিল অভিনব, তেমনি অভিনব আচরণও হয়েছিল ওই সুস্বরে কীর্ত্তনের মধ্যেই, শ্রীহরিনামের সুমধুর অকর্ষণ-আস্বাদন অনুভব করানর মধ্যেই ছিল শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অপূর্ব নৃত্য ও অলৌকিক প্রভাবের অনুভবটির প্রকটীকরণ।

আবার তার সঙ্গে দয়ালু মনের উন্নয়ন উদ্ধরণ বাসনা, সে বাসনাই তরল হ'য়ে চোখে ছিল তাঁদের অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন॥ মুখে ছিল শ্রীহরি কীর্ত্তনের ধ্বনি।

এমন অভিনব ধরণে প্রতিরোধ আন্দোলনই কাজিকে অচিরেই প্রভাবিত ক'রেছিল —তাই, কাজি ও তাঁর সহচর বৃন্দ বিস্মিত হ'য়ে দেখেছিলেন—

কেহো বোলে 'বামনা এতেক কান্দে কেনে।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেনে॥
কেহো বলে বামন আছাড যত খায়।
সেই দুঃখে কান্দে ওরা বুঝিয়ে সদায়॥

অত্যাচারীর অত্যাচারকে দমন করতে' ঘেরাও করার আন্দোলনের মাধ্যমে নয়নজলে তার হৃদয় শোধন করাই ছিল শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অভিনব বিজয় অস্ত্র। সে অস্ত্রের আঘাতেই সেদিন দুর্দান্ত কাজির হৃদয় বিগলিত হ'য়েছিলো; হিন্দু মুসলমানের কৃত্রিম বিরোধকে যারা আরও উজ্জীবিত ক'রতে চায়, তাদের কু-বাসনাও সেদিন তাঁরা দূরীভূত হ'রে ষোড়শ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে এক নূতন ইতিহাসের পত্তন ক'রলেন।

কাজী এমনি ভাবেই পরাভূত হ'য়ে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির আসনকে নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন। জীবপ্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সেদিন বিজয়ী হ'য়ে, আবার নবদ্বীপে তেমনি উল্লাসের সঙ্গে ফিরে এলেন।

কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্বলোকরায়।
সংকীর্ত্তন নৃত্য রসে নাচি ফিরি যায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিজয় বার্ত্তা শুনে নবদ্বীপের সেই উচ্চ শ্রেণীর পাষণ্ডীর দল বিষন্ন হ'য়েছিলেন।

পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্ত ভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদে ভাবে বৈষ্ণবের রঙ্গ॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥

তারপর থেকেই আরও নূতন উদ্যম নিয়েই—তাঁরা নবদ্বীপের পথে পথে অবাধ গতিতে সংকীর্ত্তন ও পতিত উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রলেন। সহচরবৃন্দও পরিপূর্ণ নির্ভয় হ'লেন। (আজও হিন্দু মুসলমানের সেই সম্প্রীতির নিদর্শন কর্ত্তিত চন্দ্র বা "খুন্তি" বা সেই মোগল যুগের সরকারি পাঞ্জা নিয়ে নগরকীর্ত্তন বের হয়)

তাঁদের সেই বিজয় যাত্রার সাফল্যে, উচ্চশ্রেণীর মন অনেকখানি দমে গেল, এই ঐতিহাসিক ঘটনায় নদীয়া নবদ্বীপের প্রতিটি পথে, প্রতিটি গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সেই বিজয় বার্ত্তার অভিনন্দন প্রশস্তিতে ছেয়ে গেল—

কেহো বলে শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যার॥
কেহো বলে, জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।
কেহো বলে নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥
কেহো বলে, এই কাজ নিত্যানন্দ করে।
তিনি চৈতন্যের বড় সব শক্তি ধরে॥

সমগ্র নদীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোলো শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অবিসম্বাদি নেতৃত্ব, আর, বাংলার সেই অবহেলিত সমাজের মানুষরা হ'লেন উল্লসিত। সারা নদীয়া জুড়ে যেমন চ'লতে লাগলো সেই অবহেলিত মানুষের ঐক্যসম্মিলন, আর শ্রীহরিনামের সংকীর্ত্তন, তেমনি সর্ব্বত্র তার নেতৃবৃন্দের জয়োল্লাসের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠ্‌লো নবদ্বীপ।

যদিও এই বিজয়ের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রমুখের নেতৃত্বই প্রাধান্য লাভ ক'রলো, কিন্তু নীরবে সব কিছু বিকিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা ক'রলেন শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা মাত্র চিন্তার সাধকরূপেই আত্ম-প্রকাশ ক'রেছিলেন।

তারপর, অচিরেই তাঁরা বুঝলেন একাজের কেবল প্রবর্ত্তনই ক'রলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, কিন্তু একে আরও ব্যাপক আরও প্রকট ক'রে তুলতে, যে বিরাট শক্তির প্রয়োজন, তাতে থাকবে তাঁর প্রেরণা, আর বাকী কাজ শ্রীনিত্যানন্দের স্কন্ধে এসে আবর্ত্তিত হবে।

এই কাজটির পরিপূর্ণ রূপ দিতেই শ্রীনিত্যানন্দের জীবন প্রস্তুত। তবুও তিনি তাকে স্বাধীন ভাবে প্রবর্ত্তন করাটাকে, জীবনব্রতের নিয়মানুবর্ত্তিতার পরিপন্থি হিসাবেই গ্রহণ ক'রেছিলেন। সমাজ উন্নয়নের এই পবিত্র

াজে যদি সমগ্র জীবনই শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ নেতৃত্ব লাভ হয়, তাই হবে তার সর্বাধিক উল্লাসের ক্ষেত্র, কিন্তু অচিরেই আরও ভিন্নতর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি ভিন্ন পথেই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল।

তাতে এমন পরিবেশের উদ্ভব হোলো, যাতে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নদীয়া ছেড়ে চ'লে যান—

সে পরিবেশের মুখ্যতম আকর

কাজির হৃদয়ভাবের বিবর্ত্তন যখন নদীয়াবাসির চোখে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্লো, যাকে পরে বর্ণনা করা হয় কাজিবিজয়; তার পর থেকেই শ্রীগৌরাঙ্গ আরও উদ্দাম সংকীর্ত্তনরসে মত্তপ্রায় হ'য়ে গেলেন।

তাতে কিন্তু সমগ্র নদীয়া ও নবদ্বীপের সেই বিশেষ শ্রেণীর মনে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হোলো। তাঁরা মনে ক'রলেন এর পর আর শাসক গোষ্ঠীর কাছে আবেদন নিবেদন ক'রেও যে কিছু ফল হবে না, কারণ কাজি তো নিজেই শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হ'য়ে গিয়েছেন। অতঃপর জাতিধর্মের সর্বনাশ সাধন করাটা এই বৈষ্ণবদের কাছে খুবই সুলভ হবে।

ওই যে নিত্যানন্দ, উনি তো গৌরাঙ্গের আজ্ঞানুবর্ত্তী মহোচ্চকর্মী। উভয়ের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ, অতএব কোনও কৌশলে নবদ্বীপ থেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে অপসারিত ক'রলে নিত্যানন্দের আর কোন উদ্যমই থাকবে না।

আমাদের এখন এ'টিই হবে নূতন পথ। কয়েকদিন পরেই তাঁরা দেখলেন দিনের পর দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমেই ভাবোন্মত্ততার তরঙ্গে নিজেকে আরও ভাবাবিষ্ট ক'রে, যেকোন পথের পথিককেও এই ধর্মে আত্মসাৎ ক'রছেন। এমন কি তাঁরা দর্শনমাত্রে যবন দর্জিও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হ'য়ে গেল, অতএব সব একাকার করার কাজটি উনি এবার সম্পন্ন ক'রছেন, এ অসহ্য।

অচিরেই তাঁরা দেখলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমের তন্ময়তায় নিজে এত আবিষ্ট হ'য়ে প'ড়ছেন—যে, তারই আবেশে তিনি প্রতিটি পড়ুয়াকেই ব'লছেন—কৃষ্ণ বল, গোপী কৃষ্ণ বল।

হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
বিদিত কীর্ত্তন প্রভু হইলা সহায়।
হেন সে হইলা প্রভু হরিসংকীর্ত্তনে।
নাম শুনি মাত্র প্রভু পড়ে যে তে স্থানে॥
কি নগরে কি কবরে কিবা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব ভক্তগণ।
অন্যঅন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন এমন অবস্থায় তন্ময় যে, ব্রাহ্মণ শিক্ষিত বা উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গ

করা দূরে থাক—সামান্য একটু সময় মাত্র দেবী শচীর সন্তোষের জন্য তাঁর সঙ্গে আলাপ করা ছাড়া, সর্বদাই নানান জাতির যেসব বৈষ্ণব তঁদের গৃহেই অবস্থান করেন—

বৈষ্ণবের ঘরে প্রভু থাকে নিরন্তর।
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর॥
বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থাটি নবদ্বীপবাসী উচ্চ শ্রেণীর কাছে হাস্যকর হ'লেও এর ভিতর কিন্তু আর একটি অবস্থাকে তাঁরা সুনজরে দেখেন নাই। তাঁরা দেখতেন, শ্রীগৌরাঙ্গের ওই তন্ময়তার পিছনে অবশ্যই বিশেষ মতলব আছে। নইলে, তিনি নবদ্বীপের বালক দিগকে নিয়ে কীর্ত্তন করেন কি কারণে? বালক গণের বুদ্ধিতে যদি সর্বসময়, সর্ব্বসমন্বয় সব-একাকার আদর্শ—স্থাপন করা যায়, তা হ'লেই তো আগামী দিনে তাঁর সব মনস্কামনা পূর্ণ হবেই—,বালকরাই তো ভবিষ্যতের শক্তিস্তম্ভ—

সর্বগণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
বুলেন গঙ্গাতীরে সদা কীর্ত্তন করিয়া॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এইভাবে বালক দিগকেও কৃষ্ণমন্ত্রে শিক্ষিত করার আবেশটি যে নিছক ভাব তন্ময়তার—ঝোঁকে নয়, সেটি যে তাঁর পরিকল্পনা মাফিক, তা মনে ক'রেই একদিন এক পড়ুয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রশ্ন করেন, আপনি এসব পাগলামি কেন ক'রছেন— ও সব নাম ক'রে কি হবে? কেন শেখাচ্ছেন?

আর যায় কোথায়? শ্রীগৌরাঙ্গ যেন অমনি আর এক শিশু হ'য়েই ছাত্রটিকে তাড়া ক'রলেন। হাতে একটি লাঠি নিয়েই তার পিছনে ধাওয়া কর'লেন।

এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
আথে ব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে ধর ধর॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পড়ুয়া পালায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই চেষ্টাটিকে আর বাড়াতে না দিয়ে—সহচর বৃন্দ তাঁকে নিরস্ত ক'রলেন। কিন্তু পড়ুয়ার দল বুঝলেন -গোপী কৃষ্ণ বলা ওই কৃষ্ণপাগলটি ক্রমে সমগ্র সমাজটাকেই পাগল করার ছদ্মবেশে তাকিয়ে ভুল পথে পরিচালিত ক'রবে। ব্রাহ্মণ সন্তান হ'য়ে যদি ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে, তবে তো অন্য বর্ণের লোক আর পাপ পুণ্যের কোন বাঁধনই মানবে না। হরি কৃষ্ণ, গোপী কৃষ্ণ না ব'ললে, যে কোন জাতির লোকই ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তুলবে।

পড়ুয়াদের জল্পনা কল্পনা ক্রমে রূপায়িত হ,তে হ,তে, তাঁদের পিতা মাতার কানে আরও গভীর অর্থবহ হ'য়ে সে ঘটনাটি পল্লবিত হতে লাগলো।

তাঁরা বুঝলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সত্যই ব্রাহ্মণদ্বেষী। নিম্ন বর্ণের লোকের কাছে উনি এখন ঈশ্বর, বিষ্ণু ইত্যাদি শুনতে শুনতে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজেরই ধারণা হয়ে গিয়েছে—সত্যই

বুঝি উনি ভগবান, তাই এখন তিনি ব্রাহ্মণ সন্তানকে পদদলিত করতে চান, উঃ কি স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণকে আঘাত করার স্পৃহা ! ভাল, আমরা কিন্তু এ ব্যবহার নীরবে সহ্য করছি না—

কেহ বলে এতবা সম্ভ্রম কেন করি ?
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি ?
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি ?
তেঁহো মারিতে আমরা কেন সহি ?
রাজাতো নহেন, তিনি মারিবেন কেনে ?
আমরাও সমবায় হঁও সব জনে ॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র সুত।
আমরাও নহি অল্প মানুষের পুত্র ॥

ব্রাহ্মণ ছাত্রদেয় সমবায় আন্দোলনের একটা রূপ অচিরেই খাড়া হ'য়ে গেল। এ আন্দোলনের ফল কি হয়, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই সাক্ষ্য দেওয়া আছে আজও সেই ছাত্র আন্দোলন। বিরোধী পক্ষ এমনি একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। এতদিনে তাঁরা তা পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ কাজিকে দিয়ে তাঁদের গুপ্ত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরই এতদিন তাঁদের সেই চেষ্টাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল না।

এইবার ব্রাহ্মণ সমাজের সমবেত চেষ্টায় ছাত্র আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গকে নবদ্বীপ থেকে বিদায় নেবারই পথ প্রস্তুত ক,রলেন তাঁরা। এমনিটি যে ঘ'টতে চ'লেছে শ্রীগৌরাঙ্গ তা বুঝলেন শুধু নয়, সেটা আগেই বুঝেছিলেন।

এইমত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥

ব্রাহ্মণদের সমগ্র পরিকল্পনাটি সফল হওয়ার আগেই কি করা কর্ত্তব্য সেটি বেশ হেঁয়ালি* করেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর সহচর বৃন্দের কাছে জানালেন—

করিল শিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই হেঁয়ালীর মর্মার্থ কি, সব ভক্ত তা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অভিন্নমনা শ্রীনিত্যানন্দ সহজেই তা বুঝতে পারলেন তাই বিষন্ন হ'য়ে চুপ ক'রেই রইলেন।

হেঁয়ালীর অর্থ সভে নাপারে বুঝিতে।
কারণ না বুঝি, ভয় জন্মিলা সভাতে ॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন, প্রভুর অন্তর।
জানিলেন, প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইবে সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্বথায় ॥

---

*হেয়ালির—সংস্কৃত রূপ প্র-হেলিকা। প্রাদেশিক ভাষায় বিবর্ত্তিতরূপ পা হেলিয়া =হেলিয়া=হেঁয়ালি। কূটার্থক বাক্ প্রবন্ধ—riddice

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবনার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের ভাবনা অভিন্ন, তাই তিনি সহজেই বুঝলেন, সমাজ উন্নয়নের বিপুল কার্যভার এবার তাঁকেই গ্রহণ ক'রতে হবে।

এটি অতিসত্বর উপলব্ধি ক'রছেন শ্রীনিত্যানন্দ, এটি জেনেই তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দের দুটি হাত ধ'রে আরও নিভৃতে নিয়ে এলেন তাঁকে—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হাত ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত ব্যথা কি এবং কি কাজ শ্রীনিত্যানন্দকে গ্রহণ ক'রতে হবে সেদিনের নিভৃত আলাপে কিছুই গোপনীয় ক'রে রাখলেন না শ্রীনিত্যানন্দের কাছে—

প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়।
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল, আইলাঙ সংহারিতে।
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ, আরো হৈল কোটি পাশ॥
আমাকে মারিতে, যবে করিলেক মনে।
তখনই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥

অতএব—দেখ কালি শিখা সূত্র মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥

তা হ'লে, যে যে জন চাহিয়াছে মোরে মারি বারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস এইখানে এই পয়ারের উপনিবেশ করে একান্ত বাস্তবের সূত্র ধ'রেই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন ও সন্ন্যাসের কার্য কারণটি অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিস্কার দেখিয়েছেন, বাংলার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজ তৎকালে গুপ্তহত্যার চক্রান্ত ক'রতেন, কিন্তু সন্ন্যাসীকে হত্যা করাটা একান্ত অন্যায় কার্য্য ব'লেই মনে করতেন। তাই অপর এক সন্ন্যাসীদেহ শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন নির্ভয়মনা। আর শ্রীগৌরাঙ্গ যেভাবে চেয়েছিলেন সমাজবিপ্লবের নূতন রূপ দিতে, শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন সে ক্ষেত্রে খুব মৃদুপথে ওই আন্দোলনকে সফল ক'রতে। (ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সন্ন্যাসী হত্যা বেশী পাপ সৃষ্টি করে, এটা বৌদ্ধপ্রভাব, বাংলায় বৌদ্ধপ্রভাব বহু ক্ষেত্রে আজও প্রতিষ্ঠিত।)

শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেছিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখে সম্ভ্রম করাটা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তাদের সেই স্বাভাবিক কর্ত্তব্যের মাধ্যমেই আমার দান অবশ্য গ্রহণ ক'রবে—

তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥

কেননা— সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ, দেখোঁ কে মোহরে মারে॥

সময়োচিত পরিবেশে নরঘাতকদের কাছে একটি অমূল্য জীবনকে সমর্পণ ক'রে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না, অথচ জীবন ব্রতের উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়াটাই যাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন, তেমন পুরুষ রত্নের এই ভাবে ভিন্ন পথ অবলম্বন ছাড়া অন্য পথের সন্ধান কারোর কাছেই সম্ভব হয় নি, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ আরও পরিষ্কার ক'রে ব'ল্লেন—

তোমারে ক'হিনু এই আপন হৃদয়।
গার্হিস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এইভাবে মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ করার সুযোগ্য আধার শ্রীনিত্যানন্দই একমাত্র পুরুষ। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, তাঁর এই সংকল্পের বার্ত্তা শুনেই শ্রীনিত্যানন্দের মুখ বিষণ্ণ হ'য়ে গেল, তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব'ললেন—নিতাই! তুমি ব্যথা পেয়ো না, আমার সমস্ত কাজ তোমাকেই ক'রতে হবে অচিরে। এখন তুমিই বিধি বিধান দাও আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের। তুমি ভাল ক'রে জান, তুমি আমাকে যা করাও, আমি তাই করি।

যে রূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।

নিতাই! আর একটি কথা, যদি তুমি এইসব অবহেলিতদের উদ্ধার চাও, তবে আমার সন্ন্যাস গ্রহণকে অনুমোদন কর।

এমন ক'রে নিত্যানন্দে আত্মসমর্পণ করার ভাষা শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রথম নয়, এর আগেও ক'রেছেন, সে কিন্তু ঠারে ঠোরে। নিভৃতে ডেকে এনে নিতাইকে এমন পরমাত্মীয়ের ভাষা এই প্রথম।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের এইভাবে অবহেলিত পতিতদের উন্নয়নের ভার নিত্যানন্দে অর্পণ, আর তার সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দানটি নিত্যানন্দ এককভাবে অনুমোদন ক'রলেন না। কারণ, তিনি কোন সময়েই স্বাতন্ত্র্যবাদী নন, তাতে কৃতিকর্মের স্বয়ং প্রভুত্ব স্বীকার ও জন উন্নয়নের পথে গণশক্তিকে খর্ব করা হয়।

(এ চিন্তা এসেছে ভারতে অথর্ব বেদের আমল থেকে, সেটি বৌদ্ধরা গ্রহণ করেন "সংঘ শক্তি" নামে, আর গণশক্তি নাম এটি এ যুগের ভাষা) শ্রীনিত্যানন্দ গণশক্তির প্রবর্ত্তক, কারণ একনায়কত্ব তিনি চাননি, তা ইহার পরিণামে হবে একনায়কতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ, সেটা গণউদ্ধারের কার্য্য গণসম্মেলনের দ্বারাই নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ গণনায়কত্ব বা গণ নেতৃত্বটি হবে জনগণের অভিমতের বাইরে। তাছাড়া, উচ্চ বর্ণধারা বহু কালের সমবেত উপেক্ষার ফলেই যখন এই ভাবে জনসমাজের বিশাল অংশটি অবহেলিত হ'য়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে এককভাবে সংস্কার সাধনও কার্য্য সিদ্ধির পথে অনুকূল হবে না।

তাই, শ্রীগৌরাঙ্গের অভিমতটি যাচাই ক'রে, সর্বসম্মতির দ্বারাই নির্ণীত হোক, এমনি একটি বিকল্প প্রস্তাবই ক'রলেন। তার সঙ্গে একথাও ব'ল্লেন—যদিও আপনি একক ভাবেই নিজের সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্তটি ব্যক্ত ক'রেছেন, তবুও বলতে পারি, আপনাকে কেন্দ্র ক'রেই যখন এই বিরাট আন্দোলনের উদ্ভব তখন আপনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রতে পারেন না; এই সন্ন্যাস গ্রহণটি আপনারই স্বেচ্ছাময় ভাবের

কারণ, আপনি সকলের ভাবকেন্দ্র। অতএব আমার কথা, এ বিষয়ে আপনি সকলের অভিমত গ্রহণ করুন—

নিত্যানন্দ বোলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই করহ নিশ্চয়॥
তথাপিও হও তুমি সর্বলোক নাথ।
ভাল হয় যে মতে, সে বিদিত তোমাত॥
যেরূপে করিবে তুমি জগত উদ্ধার।
তুমি সে জানহ, তাহা কে জানয়ে আর॥
তথাপিহ, কহ সর্ব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বোলেন, তাহা শুনহ আপনে॥

গণনায়কের এই বাস্তব বোধটির মূল্য কি, তা শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেই তাঁর প্রস্তাবটি সাগ্রহে ও সাদরে গ্রহণ ক'রে সন্তোষ প্রকাশ করতে ক'রতে শ্রীনিত্যানন্দকে আলিঙ্গন ক'রলেন—

নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এইমত নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে, গৌর হরি॥

আর সময়ক্ষেপ না ক'রে, শ্রীগৌরাঙ্গ একাকীই গেলেন—মুকুন্দের আলয়ে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় অন্তরঙ্গ সেবকবৃন্দের অন্যতম। সুকণ্ঠ সুগায়ক এবং সময়োপযোগী ভগবদ্ গুণ কীর্ত্তন ক'রে, শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবকে উদ্দীপিত ক'রে, তাঁর চিত্তে পরম তৃপ্তি দান করেন। এ'রই বাড়ীতে উপনীত হ'লেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

তাঁকে অকস্মাৎ এইভাবে দর্শন ক'রে, মুকুন্দ পরম আনন্দ লাভ ক'রেই আপন স্বভাবেই প্রতিবারের মতই ভাব সম্বলিত কীর্ত্তন ক'রতে লাগলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর ভাব উদ্দীপনের আলাপ শুনতে শুনতে বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন—

মুকুন্দের বাসায় আইলা শ্রীগৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ॥
প্রভু বোলে গাও-গাও কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হোলো। তারপর সেই ভাবটির উপশম হ'তেই, শ্রীগৌরাঙ্গের অকস্মাৎ এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি, সেটি ধীরে ধীরে তাঁকে শোনাতে লাগলেন।

সে সংবাদ যত সংক্ষিপ্তই হোক, তাতে মুকুন্দের মন খুবই বিচলিত হোলো; সেই চঞ্চল মন নিয়েই মুকুন্দ ব'ল্লেন, প্রভু! এত দ্রুত কিছু ক'রো না, এখানে আরও কিছু-দিন কাটাও। তারপর তোমার যা ভাল লাগে তুমি তাই কোরো—

যদি তুমি এই মত করিবা নিশ্চয়।

দিন কথো এই রূপে করহ কীর্ত্তনে।
তবে তুমি করিহ সে, যে তোমার মনে॥

মুকুন্দের উত্তর শুনেই শ্রীগৌরাঙ্গ চুপ ক'রেই থাকলেন। এভাষা স্বতন্ত্র। সেখানে র অপেক্ষা না ক'রে, অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীগদাধরের আবাসে গমন ক'রলেন।

চলিলেন যেথায় আছেন গদাধর।

শ্রীগদাধরের আবেশ সেব্য সেবকের ভাবে। শ্রীগৌরাঙ্গই সেব্য, আর— সেবক। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর আলয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্র, শ্রীগদাধর অশেষ তৃপ্তি লাভ রই, তাঁর চরণ বন্দনা ক'রে মুখের পানে নীরব প্রশ্নের ভাষা নিয়ে চেয়ে রইলেন, গৌরাঙ্গ ব'ল্লেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কি। শুনেই গদাধর ব'ল্লেন—

যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা কি তোমাতেই ভর করে?
যতেক অদ্‌ভূত সেই তোমাতেই করে।
অন্তরে দুঃখিত হই, বোলে গদাধরে॥

শ্রীগদাধরের মমতাবোধ ভিন্ন ধরণের—তিনি সেই মমতার স্বরেই ব'ল্লেন— আচ্ছা :তা! তুমি যে সন্ন্যাসী হবে, তা তোমার অনাথা মায়ের কি হবে? তাঁকে ছেড়ে ব কি ক'রে? এতে, তোমার মাতৃহত্যার ভারই তো নিতে হবে। সবাই তাঁকে ছেড়ে য়েছে, এখন একমাত্র তুমিই তো তাঁর সম্বল। ভাল, তোমার যাতে সুখ হয় তাই , আমাদের আর বলার কি আছে।

তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর, চল যাও॥

শ্রীগদাধরের কথাতেও শ্রীগৌরাঙ্গ কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর ব্যথাটা াথার লেগেছে, তা বুঝলেন। এই সময়ের মধ্যেই, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের া, কিন্তু আর সেটা ঐ কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই চাপা রইলে না, সমস্ত ভক্ত মণ্ডলীর ়ই ছড়িয়ে প'ড়লো॥ তাঁরা বড়ই চিন্তিত দুঃখিত ও বিস্মিত হ'য়ে পরস্পর মুখ ওয়াচাযি ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন, "গৌরসুন্দর কবে কোথায় কার কাছে সন্ন্যাস নেবেন? র পর কোথায় অবস্থান ক'রবেন? আমরাই বা কি ক'রবো? কোথায় গিয়ে তাঁর যা পাব?

কোথায় যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিব"ও গিয়া।।

শ্রীগৌরাঙ্গ জানতেন সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে ভক্তরা খুব দুঃখ পাবেন। তাই তাঁদিকে লন—না তোমরা চিন্তিত হোয়োনা। তোমাদের ছেড়ে আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ আমার ক'রতেই হবে, এটা সবারই কল্যাণের জন্য নে রেখো। সমাজের বিনষ্টি সাধন করা তো সম্ভব নয়, তাই সকলের কল্যাণের জন্যই মার সন্ন্যাস।

লোক রক্ষার নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ।।

এমনি ভাবেই একটি সংকেত বাক্য শুনিয়ে প্রত্যেককে আলিঙ্গন আর প্রবোধ বাক্য

শুনিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ সেদিন বাড়ি ফিরে এলেন।

সভা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ বাসে গেলা।

বাড়ি ফিরে এসে কিন্তু মাতৃদেবীকে আর ব'লতে পারলেন না যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রবেন। কিন্তু শচীদেবী শুনেছেন লোক পরম্পরায় সে কথা।

পরম্পরায় এসকল যতেক আখ্যা'ন।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ।।

তিনি পুত্রকে এসম্বন্ধে কিছু ব'ললেন না, কিন্তু মায়ের মন, সর্বদাই আঁকুপাকু ক'রছে, রাত্রির নিদ্রাও যে চলে গেল, অনাহারেই রাত্রিটি কেটে গেল, প্রভাতের পূর্বেই দেখলেন, তাঁর প্রাণের নিমাই ত'ারই মত অনিদ্রায় কাটিয়েছে। তাই মনের বেদনায় ছট ফট করতে করতে সে ব্যথা আর চেপে রাখতে না পেরে, পুত্র গৌরসুন্দরের কাছে গিয়ে ব'ল্লেন বাপ্ নিমাই! এ কী কথা শুনছি? তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে? সেকি বাবা! আমি যে তোমারই মুখের পানে চেয়ে আজও বেঁচে আছি!

না যাইও না যাইও বাপ, আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ।।

এযে কত বড় ব্যথা, তাকি মা তাঁকে বোঝাতে পারেন? তাই ওই ক'টি কথাতেই তা প্রকাশ ক'রলেন শচীদেবী।

পুত্র শ্রীগৌর সুন্দরও শুনলেন, একটুও উত্তর দিলেন না। তিনিও তো সবই বুঝছেন, অথচ যে সংকল্প তিনি গ্রহণ ক'রেছেন, তারই গুরুত্ব সর্বাধিক। আরও কিছু সময় নীরবে মুখ নীচু ক'রে থাকলেন। পরে মাকে এমন ভাষায় সান্ত্বনা দিলেন যে, তা ছাড়া আর কোন ভাষাতেই ত'ার গৃহত্যাগের বেদনাকে থামান যায় না।

যেমন, বনবাসের প্রাক্ কালে কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামের বিনীত সদুপদেশ, কংস কারাগারে আবদ্ধ দেবকী দেবীর প্রতি অলৌকিক মূর্ত্তি বাসুদেবের ভাষণ, ইত্যাদি এমনি প্রতি ক্ষেত্রেই ত'ারা মাকে বুঝিয়েছেন—মাতা পুত্রের সম্বন্ধ যে নিত্য সম্বন্ধ, একি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় মা? কিন্তু মা? পুত্রকে সর্বজন হিতায় বাহুত সকলের কাছে সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি বিদায় দেন, এও তো তাই মা! আমি তো তোমারই মা! তোমাকে ছেড়ে আমার আর কি পরিচয়? সবাই বলে শচীনন্দন।

এমনি ভাবে বোঝাতেই মায়ের মন অনেকখানি শান্ত হোলো—

কহিলেন প্রভু, অতি রহস্য কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ জানতেন; এটা হোলো মায়ের ব্যথার সাময়িক উপশম। তবে তা সাময়িক হ'লেও এরই ভিতর আমাকে গৃহ ত্যাগ ক'রতে হবে, তাই গৃহ ত্যাগের পূর্ব দিনের সন্ধ্যায় আবার শ্রীনিত্যানন্দকে নিভৃতে ডেকে এনে, আরও তাঁর কিছু বক্তব্য ত'াকে শোনালেন।

যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিল নিভৃতে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বক্তব্য ছিল, এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রবো

স্থির ক'রেছি। নিকটেই কাটোয়া গ্রাম, ওখানে কেশবভারতী নামে একজন ভক্ত সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁরই কাছে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রবো এ সংবাদ তুমি মাত্র পাঁচ জনের কাছে জানাবে, মা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং মুকুন্দ।

এঁরাই যেন শোনেন। তাঁর যথা আদেশ, তাই পালন ক'রলেন শ্রীনিত্যানন্দ। ওই পাঁচ জনকেই জানালেন তিনি।

পঞ্চজন স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিতেই নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥

তারপর সেদিনের সন্ধ্যাটিও যথাযথ চর্য্যার সঙ্গে অতিবাহিত হ'লো। আর ওই পাঁচজন জানলেন আজকের রাত্রি শেষেই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছেড়ে যাবেন।

যথা সময়ে সান্ধ্যকৃত্য সমাপন ক'রে শয়ন ক'রতেও গেলেন। সে রাত্রে কিন্তু কাছে রাখলেন শ্রীহরিদাস আর শ্রীগদাধরকে। তবে এঁদের দু'জনের মধ্যে শ্রীগদাধরই জানতেন আজকের নিশাটিই মাত্র শ্রীগৌর সুন্দরকে এই গৃহীর স্বরূপে দেখতে পাব। এদিকে মা শচীদেবীর মনটি ভেসে রইলো অকূল চিন্তার সাগরজলে! তাঁর চোখে নিদ্রা এল না। সারারাত্রিটিই জেগে কাটালেন।

নিকটেই শুইলা হরিদাস গদাধর।

*   *   *   *

আই জানে আজি নিমাই করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ ॥

চোখের জলে রাত কাটান ছাড়া আর কি উপায় ছিল মায়ের?—ক্রমেই এক এক প্রহর কেটে গেল, আর মাত্র চার দণ্ড বাকী আছে, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ শয্যা ত্যাগ ক'রে যথা কৃত্য সমাপন করে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে, গৃহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হ'লেন—

দণ্ডচারি আছে মাত্র ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শয্যা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগদাধর ও শ্রীহরিদাসও জেগে উঠলেন। উভয়ের মধ্যে শ্রীগদাধরই জানতেন এত প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গের শয্যাত্যাগের হেতু কি? আর দেবী শচীতো আগেই জানতেন আজই সেই প্রভাত! তাই সকলের আগেই তিনি উঠেছেন, অন্তরের ব্যথাকে কোনও রকমে চেপে রেখে, দুয়ারে এসে ব'সলেন—

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন কতক্ষণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রস্তুত হ'য়ে এসে, মাকে ব'সে থাকতে দেখেই, তাঁর হাত দুটি ধ'রে অনুনয়ের সহিত তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ব'ল্লেন মা? তুমি আমার গৃহত্যাগের জন্য এতটুকুও দুঃখ কোরো না, তুমি আমার মা, তোমায় লালন পালন বহন ভার সবই আমার; তারপর মায়ের বুকে হাত রেখে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আরও বল্লেন মা মা! তোমার সব ভারই আমি নিয়েছি মা।

বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার।
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এমনি ধরণের আশ্বাস বাণী শুনছেন, আর শচীদেবী অঝোর ধারায় কাঁদছেন, একটি কথাও মুখ থেকে বের হ'চ্ছে না। মাকে এমনি অবস্থায় দেখতে দেখতেই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ক'রে চরণ ধূলি মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ ক'রলেন—

যতকিছু বোলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝোর নয়নে ॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তাঁরে চলিলা সত্বরে ॥

তাঁর গৃহত্যাগের পরবর্ত্তি কাজের ভার ন্যস্ত করা ছিল শ্রীচন্দ্রশেখরের উপর, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি ক'রলেন, কিন্তু একান্ত রক্ষক ও সহায়ক হ'য়ে রইলেন শ্রীনিত্যানন্দ। অর্থাৎ কাটোয়ায় আগমন এবং সন্ন্যাস কার্য্যের জন্য সর্বকার্য্য সমাধার ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যানন্দের উপস্থিতি ও তাঁর সক্রিয় ব্যবস্থা করার কার্যে একমাত্র প্রত্যক্ষ কৃতিমান্ হ'য়ে থাকলেন শ্রীনিত্যানন্দ।

আর যত লীলারস হৈল সেইস্থানে।
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে সর্ব তত্ত্ব জানে ॥

সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের নূতন নাম হোলো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। (১৫১০ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী।

এরপর আর একটি মাত্র রাত্রি অতিবাহিত হোলো সেই কাটোয়া নগরীতে। সে রাত্রিটিও সেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আবেশ-আনন্দের পরিবেশে উদ্‌যাপিত হোলো, সকলেই ভুলে ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহাশ্রম পরিত্যাগের জন্য সাংসারিক রীতিতে দুঃখ বেদনার কথা। ভুলিয়ে রেখেছিলেন কীর্ত্তনানন্দে শ্রীমুকুন্দ, আর আনন্দে হৃদয় ভরিয়ে রেখেছিলেন অভিন্ন হৃদয় শ্রীনিত্যানন্দ। এমনই এক দিব্য আনন্দে বিভোর হ'য়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতী মহাশয়কেও আলিঙ্গন ক'রে প্রমত্ত মনে সেই রাত্রিটি কাটিয়ে দিলেন।

সকাল হ'তেই শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্য আবেশ ফিরে এল, তিনি চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদটি অন্তরঙ্গ জন ও নবদ্বীপ বাসিকে জ্ঞাপন ক'রতে ব'ল্লেন।

তারপর, নিজেও কাটোয়া ত্যাগ ক'রে, কয়েক দিন রাঢবঙ্গে ভ্রমণ ক'রে অভিন্নমন শ্রীনিত্যানন্দকে ব'ল্লেন—'তুমিও একবার নবদ্বীপে যাও। তোমাকে দেখ্‌লে আমার আপনজন যাঁরা, তাঁরা তৃপ্তি পাবেন—

প্রভু বোলে নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥

নিতাই! এবার নীলাচলের পথেই হবে আমার যাত্রা। ওখানে যাবার আগে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়িতে থাকার ইচ্ছা, তবে সকলের আগে এখন ফুলিয়ায়, তুমি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে এস।

নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া নগর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন হৃদয় মরমীপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ এই প্রথম সঙ্গবিচ্ছিন্ন হ'য়ে দ্বীপে ফিরে গেলেন।

যথা সময়ে শচীদেবী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিয়ে গৌরাঙ্গের ইচ্ছাটি তিনি ক'রলেন। যতদূর সম্ভব, দ্রুত গিয়ে একত্র মিলিত হ'য়ে তাঁদিকে নিয়ে, নিত্যানন্দ ফিরে এলেন ফুলিয়া নগরে।

তারপর সকলের একান্ত অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুরে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তটি ক্ষণেই শ্রীগৌরাঙ্গের সান্নিধ্য নিয়ে পরবর্ত্তী দিনগুলি অতিবাহিত ক'রতে লাগলেন।

তারপরেই নুতনতর জীবনের আস্বাদ গ্রহণ ক'রতে শান্তিপুর ত্যাগ ক'রে নীচলের থ যাত্রা। সঙ্গী হ'লেন গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীনিত্যা- ন। (১৫১০ খ্রী, মার্চ—এপ্রিলে)।

যাত্রার পথটি হোলো দক্ষিণ বঙ্গের আটিসারা গ্রাম হ'য়ে। এটিই ছিল প্রাচীন । বঙ্গের শেষ প্রান্তে এসে, নৌকায় চ'ড়ে জলপথেই তাঁদের নীলাচল যাত্রা।

এই জল পথে আসতে আসতেই তাঁরা উৎকলের সীমান্তে এসে উপনীত হ'লেন।

প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে :

এরপরই তাঁদের যাত্রা হোলো তটপথে। দিনচর্য্যার কৃত্যও শুরু হোলো ভিক্ষার রা। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পাক ক'রলেন জগদানন্দ—

সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥

এমনি ভিক্ষা ক'রে ক'রেই তাঁরা অগ্রসর হ'তে লাগলেন নীলাচলের পথে, ক্রমে রা জলেশ্বর, বাঁশদহ, রেমুনা, যাজপুর, বৈতরণী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর হ'য়ে লাচলের ভূমিতে উপনীত হ'লেন।

প্রতিদিনের প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রতিটি কার্যে শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গী হ'য়ে র'ইলেন গৌরাঙ্গের। পথিমধ্যে কোনও কোনও দিন শ্রীগৌরাঙ্গ বের হ'তেন জগদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষায়।

নীলাচলে এসেই বাংলার প্রখ্যাত অধ্যাপক বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যান্যের পরিচয় ঘ'টলো। তাঁরই বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর প্রিয় পার্ষদ- ন্দ নীলাচলে অবস্থান ক'রতে লাগলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই, সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হোলো, সেই সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘ'টলো শ্রীনিত্যানন্দেরও। শ্রীগৌরাঙ্গই পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীনিত্যানন্দের। সেই পরিচয় ঘটানোর মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গ বিশেষ ভাবেই জানালেন আমার অবশিষ্ট কর্মের সাফল্য এই নিত্যানন্দের দ্বারাই ঘটাবো। আমি এঁকে মনে করি ইনি আমার দ্বিতীয় দেহ। এঁর প্রতি আপনি দৃঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রবেন এই আমার আশা—

আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ চন্দ্র।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো কেহো নাহি জানে।
আমি যারে জানাই, সেই জানে তানে॥

ইনি সর্বদাই আত্মগোপন ক'রে অবস্থান ক'রতে চান। আমি না জানালে এ'
জীবন পরিচিতি কারও জ্ঞাত হয় না।

এরপর, কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ হ'য়ে উঠলে
বিশেষ দর্শনীয় এবং মাননীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি। নীলাচল বাসির চোখে শ্রীনিত্যান
হ'লেন গৌরাঙ্গের অভিন্ন হৃদয় দ্বিতীয় তনুতুল্য মহান্ পুরুষ।

নীলাচল বাসী যত অপূর্ব দেখিয়া।
সর্বলোক হরি বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
এইত অচল জগন্নাথ সভে বোলে।
হেন নাহি, যে তাঁহানে দেখিয়া না ভোলে॥

তারপর যতদিন যায়, ততই আসতে লাগলেন উভয়ের পূর্ব পরিচিত মানন
প্রীতিভাজন, ও অন্তরঙ্গ জনবৃন্দ।

এঁদের মধ্যে এলেন পরমানন্দ পুরী। ইনি বহু তীর্থ পর্যটন ক'রে নীলাচলে এ
শুনলেন, এখানে এসেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, তার পর এলেন কৈশোর যৌবনে
একান্ত প্রিয় সহচর "স্বরূপ"। অর্থাৎ পুরুষোত্তম আচার্য্য, এঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরে কীর্ত
শুনতেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নবদ্বীপে অবস্থানের সময় ইনি এইপ্রিয়বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গকে কীর্তন গা
শুনিয়ে পরম আনন্দে ভুলিয়ে রাখতেন। তারপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় রামানন্দ এবং প
পরে দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান আচার্য্য প্রভৃতি। সকলেই তাঁদের প্রি
তম শ্রীগৌরাঙ্গকে একান্ত ভাবেই কাছে পেলেন, সঙ্গে পেলেন শ্রীনিত্যানন্দকেও।

নীলাচলে এসেই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের সর্বাধিক ভাবতন্ময় উদ্দাম উল্লা
ঐকান্তিক রূপটিকে জনগণের কাছে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, এমনি উল্লাস নিে
বিভোর হ'য়ে উদ্দাম স্বভাবেই শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে আবার শ্রীহরি কীর্ত্তনের স্রো
প্রবাহিত ক'রতে লাগলেন। তার ফলে, নীলাচল বাসীর কাছে শ্রীনিত্যানন্দও হ'
উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন তনু ও দ্বিতীয় প্রকাশ মূর্তি।

শ্রীনিত্যানন্দের সেই আবেশ এত তন্ময়তার সঙ্গে প্রতিভাত হ'তে লাগল যে, ওম
কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি শ্রীজগন্নাথ বলরামের মূর্তি দর্শন ক'রতে ক'রতেই, উচ্চ ল
দিয়ে ঐ বিগ্রহ যুগলকেই আলিঙ্গন ক'রে ব'সলেন—

শ্রীচৈতন্য রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম এক স্থানে নহে স্থির।
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারি গণে কেহো রাখিতে না পারে॥
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে।
একদিন উঠিলা সুবর্ণ সিংহাসনে॥

শ্রীনিত্যানন্দের এমনি ভাবাবেশ ও চেষ্টা দেখে জগন্নাথের সেবকদের ধারণা হ'লো, ই সাধারণ অবধূত ব্যক্তিই নন, আরও কিছু—

এ অবধূতের কভু মানবী শক্তি নয়।
বলরামে স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয় ?

পড়িহারির দল স্থির ক'রলেন, এ'কে অনুনয় বিনয় ক'রে, এ আচরণ থেকে নিরস্ত রলেই ইনি শান্ত হবেন—

এই মত চিন্তি পড়িহারি মহাশয়।
নিত্যানন্দে দেখিলেই করয়ে বিনয়॥

এইভাবে কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করার পর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই বার কয়েক দিনের জন্য নবদ্বীপে ফিরে এলেন। কেন এলেন, সে সংবাদ সকলের ছে জ্ঞাত হোলো না।

এবার নবদ্বীপে এসে যে বাড়ীতে প্রথম উপস্থিত হ'লেন, সেটি বিদ্যাবাচস্পতি হাশয়ের বাড়ী। বাচস্পতি হ'লেন সার্বভৌমের ভাই। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের ননীয় ব্যক্তি।

সার্বভৌম প্রতি বিদ্যা বাচস্পতি নাম"

o o o o

আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তাঁর ঘর।

এখানে উভয়ের উপস্থিত হওয়ার সংবাদ নবদ্বীপে ছড়িয়ে প'ড়লো, আর দলে দলে াক আসতে লাগলেন তাঁদিকে দেখতে।

এ ভিড় এড়াতেই তাঁরা অকস্মাৎ কাউকে কিছু না ব'লে, এক রকম লুকিয়েই চ'লে ালেন কুলিয়া গ্রামে।

নিত্যানন্দ আদি জন কথো সঙ্গে লইয়া।
চলিলেন বাচস্পতিকে না বলিয়া।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর।

সেখানেও তেমনি ভিড় হ'তে লাগলো এ'দের দর্শন কামনায়।

নবদ্বীপ থেকে এমনভাবে কুলিয়ায় আসা এই প্রথম। কারণ, শান্তিপুরেও গেলেন া, আর নবদ্বীপের বিশেষ অন্তরঙ্গদেরও বাড়ীতে গেলেন না।

কুলিয়ায় অল্প কিছুদিন অবস্থানের পরই শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা তটের পথ 'রে মথুরার পথে যাত্রা করলেন, কিন্তু অল্প দূর অগ্রসর হ'য়েই সে যাত্রা বন্ধ ক'রে দিলেন—

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ব'ললেন, না, এবারে আর মথুরা যাত্রা করা হোলো না থাক, আবার নীলাচলেই ফিরে যাব—

ভক্তগণ স্থানে এহি কহিলেন কথা।
আমি চলিবাঙ নীলাচল চন্দ্র যথা॥

তাই তাঁরা গঙ্গার ধারের সেই পথ ধ'রেই, আবার বিপরীত মুখে ফিরে আসতে আসতে, শান্তিপুরে এসে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে উপনীত হ'লেন—

হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈল অধিষ্ঠান।
সপার্ষদে শ্রীগৌর সুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈল অদ্বৈত ভবনে।

বহুদিন পর শ্রীনিত্যানন্দ সহ শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজ গৃহে উপস্থিত দেখে শ্রীঅদ্বৈত বড়ই তৃপ্তিলাভ ক'রলেন। তিনি উভয়ের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রলেন—

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হইল কোলাকুলি।
দুঁহা দেখি অন্তরে দোঁহেই কুতুহলী।

শ্রীঅদ্বৈতের আলয়েই বেশ কিছুদিন তাঁরা অবস্থান ক'রতে লাগলেন—

শ্রীচৈতন্য কথোদিন অদ্বৈত ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত ঘরে কীর্তন লীলায়।

অচিরেই সে সংবাদ পৌঁছে গেল নবদ্বীপে। একটি পালকী পাঠিয়ে শচীদেবীকেও শান্তিপুরে আনা হোলো।

শচীদেবীর তখন উন্মাদের দশা। কতদিন গৌরের মুখ দেখেন নাই। তার উপর শুনেছিলেন—নিমাই এত কাছে এসেও মাকে না দেখে মথুরা যাত্রা ক'রেছে। মথুরাই কি তার দেশ?

নিমাইর সংবাদ এবং পালকী এল বাড়ীতে। শচীদেবী আকুল ব্যাকুল-স্বরে কি কথাতে কি ব'লে বিহ্বল হ'য়ে নিমাইকে দেখতে এলেন। মাতা পুত্রের মিলনে কার আনন্দ বেশী হোলো, সেটি ভাষায় যত প্রকাশ ক'রেছেন বৃন্দাবন দাস, তার চেয়ে বেশী ক'রেছেন শ্রীনিত্যানন্দেরই তৃপ্তিভরা হৃদয়ের ভাষা দিয়ে—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আইর সম্ভাষে।
পরমানন্দ সিন্ধু মাঝে ভাসেন হরিষে।

শচীদেবী তক্ষুণি জানালেন, নিমাই যে কয়দিন অদ্বৈতের আবাসে থাকবে, সেই কয়দিন তিনিই রন্ধন ক'রে নিমাই নিতাই সহ সকলকে খাওয়াবেন—

প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভু স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি।

শ্রীঅদ্বৈতের বাড়িতেই সাক্ষাৎ হোলো মুরারি গুপ্তের। আর হোলো শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীর আকস্মিক আগমন ও সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন।

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়।

এতদিন পর্যন্ত শ্রীহরিদাস (পাঠান কুলজাত ও পরে ঠাকুর হরিদাস হ'য়ে আখ্যাত) এই শান্তিপুরেই অবস্থান ক'রছিলেন। তিনিও এলেন। তাঁরও হোলো অপার আনন্দ এ মিলনে।

এই এক শুভক্ষণে শুভ মিলনের বাসরে, নিত্যানন্দ আবার পূর্বের মত চঞ্চল উন্মত্ত

আবিষ্ট পুরুষের স্বভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে লাগলেন—

নিত্যানন্দ মহামল্ল প্রেম সুখময়।
বাল্য ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয়॥

আরও কয়েকদিন অবস্থান ক'রেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কুমারহট্টে (অধুনা হালিশহর) গেলেন। সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তো থাকলেনই, আরও কয়েকজন। কুমারহট্টে তখন বাস ক'রছেন শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম প্রিয় সহচর 'শ্রীবাস'। তাঁরই বাড়িতে এলেন এঁরা।

এঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে, চারপাশের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ একে একে আসতে লাগলেন—সর্বপ্রথম এলেন পুরন্দর আচার্য। তারপর বাসুদেব দত্ত ও পরে শিবানন্দ সেন।

শ্রীবাসের ছিল দরিদ্রের পরিবার। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সান্নিধ্য এবং গৌর পরিবারের নির্মল আনন্দ ভোগের আকাঙ্খা তাঁর এত প্রবল যে, তিনি নিজের দারিদ্রকে উপেক্ষাই ক'রতেন। এটি গৌরাঙ্গের দৃষ্টিতে বেশ তীক্ষ্ণ হ'য়েই দেখা দিয়েছিল, তাই—

প্রভু বোলে তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবে, কেমতে কুলাও?
আরো বলে, পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে হবে হইব সভার॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাস্তব দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়েই প্রকট হোলো শ্রীবাসের সংসার যাত্রা নির্বাহের ব্যাপারে। শ্রীবাস উত্তর দিলেন—নাঃ, আমার কোথাও যেতে হয় না, কেমন ক'রে সংসার যাত্রা নির্বাহ হয় বা হবে, সেটাও আমার মনে আসে না।

এমনি ধরণে উত্তর শুনেই শ্রীগৌরাঙ্গ আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তাতো বুঝলাম, কিন্তু তোমার পরিবারটিতো ছোট নয়, ভবিষ্যতের দিকেও তো দৃষ্টি রাখতে হবে, তা কিভাবে তার সমাধা ক'রবে?

প্রভু বোলে পরিবার অনেক তোমার।
নির্বাহ কেমতে তবে হইব সভার?

পুনরায় ঐ প্রশ্নেও শ্রীবাস উত্তর দিলেন, অদৃষ্টে (ভাগ্যে) যা আছে, তাই হবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা কি ক'রে জানবো।

শ্রীবাস বলেন, যার অদৃষ্টে যে থাকে।
সেই হইবেক, মিলিবেক যেতে পাকে॥

শ্রীবাসের উত্তর এক ধরণের নৈষ্কর্মবাদীর এবং পরিবার চালানর দায়িত্বের দিক থেকে ঔদাসীন্যের। তিনি সংসারী, বৈষ্ণব, তবুও এভাষা তাঁর মুখে। এতে যেন তিনি বোঝাতে চাইলেন, ভবিষ্যতের ভাবনার জন্য ভবিষ্যতের জীবনের প্রতিবেশই আমাকে গ'ড়ে তুলবে। এই যে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাঁদের সহচরবৃন্দের শুভ সান্নিধ্য ও পরমানন্দ লাভ, সে কি আমার ইচ্ছায় ঘটেছে?

তা'হলে ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ সমৃদ্ধির কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টির অধিকার আমার কোথায়?

শ্রীবাসের এই উত্তরের মধ্যে এমন ফাঁক থেকে যায়, যেটিকে কর্মবিমুখের উক্তি বলে গণ্য করা চলে। কারণ, সন্তানের শিক্ষাদান, তাঁদিকে বিধি বিধানের আওতায় আনার জন্য, তাদিকে পরিচালিত করাও তো অদৃষ্টের হাতে অর্পণ করা নয়। সেক্ষেত্রে কর্ম-পরাঙ্‌মুখ অথচ সামান্যতমও ভোগাপেক্ষী হওয়া এটা যেন কোনব্যক্তির, সন্ন্যাসী সাজাটাও যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, সেটা তো কপটতাই, কারণ এসব ক্ষেত্রে সন্ন্যাস আর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ একই পর্য্যায়ে পড়ে—

তেমনি বক্রোক্তি ক'রেই শ্রীগৌরাঙ্গ ব'ললেন—

প্রভু বোলে তুমি তবে করহ সন্ন্যাস।

এরও উত্তরে শ্রীবাস ব'ললেন—

ইহা না পারিমু মুই, বোলে শ্রীনিবাস॥

তৎক্ষণাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ ব'ললেন, এ কি রকম কথা?

তুমি সন্ন্যাসও নেবে না, আবার কারও দোরে ভিক্ষা ক'রে এনে, সংসার পালনও ক'রবে না, তা'হলে তোমার পরিবার পরিজনের পালন পোষণ হবে কি ক'রে? তোমার কথাবার্ত্তার ধরণ তো বুঝতে পারছি না—

প্রভু বোলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো ঘরে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ?
কিছুতো না বুঝো মুই তোমার বচন।

কি অদ্ভুত তোমার কথা। কোথাও যাও না, কারো কাছে ভিক্ষাও করো'না, কিংবা কেউ এসে তোমায় কিছু দেয়ও না, তাহ'লে? ধর কোনও লোক তোমার কাছে এসে কিছু দিলে না, তখন তুমি কি ক'রবে?

একালে তো কোথাও না গেলে, না আইলে॥
০বটমাত্র দ্বারে আসি কাহুকে না মিলে।
না মিলিলা যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বল দেখি বারে?

শ্রীগৌরাঙ্গের একই ধরণে বারবার পরীক্ষা মূলক প্রশ্নের জবাবে শ্রীবাস এমন উত্তর দিলেন, যার অর্থ হোলো কৃতিকর্মের অভিমান বশেই যদি, আমি আমার ইত্যাদি বোধের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তা'হলে সেই আমি বোধকে যদি কেউ ভগবৎচরণে সমর্পণ করে, আর দেহাভিমান বিসর্জন দেয়, তাতে কিসের বাধা? তাতেও যদি দেহাভিমান আবার জাগরূক হ'য়ে, সেই সমর্পণকে বাধা দেয়, তখন দেহটাকেই ভাগীরথীর স্রোতে বিসর্জন দেবো!

শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া
এক দুই তিন, এই কহিনু ভাঙ্গিয়া॥

শ্রীবাসের এমনি হেঁয়ালি সৃষ্টির উক্তিতে, কোন সদুত্তরই দেওয়া হোলো না। তাই

০বটমাত্র — চুপ চাপ বসো থাক।

শ্রীগৌরাঙ্গ আবার প্রশ্ন ক'রলেন—হ্যাঁহে শ্রীবাস ! আমার প্রশ্নের জবাবে, হাতে তিনটি তালি দিয়ে কি কি উত্তর দিলে ?

প্রভু বোলে এক দুই তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার কহ, কেনে তালি দিলা ?

শ্রীবাস বুঝলেন, আমার "গৃহ সন্ন্যাসটিই পরিষ্কার ক'রে জানতে চাচ্ছেন। নিরাসক্ত মনের অবস্থানই যে গৃহ সন্ন্যাস, এইটিই জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গের এই বঙ্কিম উক্তি। তা ছাড়া, সেই নিরাসক্তি আসে মহতের করুণা প্রভাবে, যেটি অখণ্ড আনন্দময় ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসের বলেই উদ্ভূত, গৃহসন্ন্যাসের এই তো আদর্শ, সে আদর্শ যার জীবনে আসে, সে কি তা বলতে পারে। তার বিরোধী প্রবৃত্তি যদি আসে, সেটা হবে আদর্শ লাভের প্রত্যবায়, সেটির প্রায়শ্চিত্ত হোলো দেহ বিসর্জন, এইটিই জানাতে শ্রীগৌরাঙ্গের এই বঙ্কিম উক্তি, এমনি মনে ক'রেই শ্রীবাস ব'ল্লেন, এতেও যদি তুমি না বুঝে থাক, তবে শোন—

শ্রীবাস বোলেন এই দঢান আমার।
তিন উপবাসেও না মিলে আহার।
তবে সত্য কহোঁ, ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুই সর্বথা গঙ্গায়।

শুধু আহার ব্যবহারের জন্যই কি তিনি দেহ দিয়ে পাঠিয়েছেন কাউকে ? ভাল, যদি শুধু আহার খোঁজার ভারই দিয়ে থাকেন দেহিকে, তবে তাঁর সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে, আহারের সঙ্গে সকল প্রাণীর অন্যান্য চেষ্টাও তো একই রীতিতে ঘটা উচিৎ ছিল ? তাতে কি তাঁর করুণার নিদর্শন থাকবে ? সেই-ই যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে দেহ-পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর করুণা প্রকাশটিরও বিলোপ ঘ'টবে ! এমনই যদি তোমার অভিপ্রায় হ'য়ে থাকে, তবে দেহপাতের আগে উপবাস, তারপর গঙ্গার স্রোতে দেহ বিসর্জনই ঘটাবো।

শ্রীবাসের হাতে তালির সঙ্গে তাঁর এই ভাবে গভীর আত্মসমর্পণের দৃষ্টিটি যে কত গভীর, সেটুকু বুঝতে পেরেই শ্রীগৌরাঙ্গ ব'ললেন—

কি বলিলি শ্রীবাস ? তোর হবে অন্নাভাবে উপবাস ? আর তাতে যদি মৃত্যু হয়, সেই কি হবে ঈশ্বরের করুণার চরম পরিণতি ? এই যদি তোর দৃঢ় ধারণা হ'য়ে থাকে, তবে জেনে রাখিস, তোকে দারিদ্র কখনই স্পর্শ ক'রবেনা, ঈশ্বর তোর দারিদ্র অবশ্যই দূর ক'রবেন—

প্রভু বোলে কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস ?
তোর কি অন্নের দুঃখে হইব উপবাস ?

শ্রীগৌরাঙ্গ এই উক্তি ক'রেই গীতার একটি শ্লোক (……যোগক্ষেমং বহাম্যহং") উচ্চারণ ক'রে ব'ল্লেন, ঈশ্বরে অনন্যনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য ঈশ্বরই তার সংসারের ভার গ্রহণ ক'রবেন।

এর পরই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপণ্ডিতকে ডেকে বললেন—তোমার দাদার ঈশ্বর আরাধনার পথে যেন অন্ন চিন্তা বাধা সৃষ্টি না করে।

কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রীরামপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ লাভ ক'রে ধন্য হ'লেন

সত্য সেবিলেন চৈতন্যের শ্রীনিবাস।

এরপর, আরও কয়েকদিন তাঁরা শ্রীবাসের বাড়িতে অবস্থান ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে আগমন ক'রলেন—

কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘবের ঘরে ॥

বহুদিন পর এমন অভুতপূর্ব আনন্দনিকেতনের দুই মহত্তম পুরুষকে বাড়িতে পেয়ে রাঘবের পরম তৃপ্তি হোলো।

এই পুরুষ যুগলও প্রভূত আনন্দ লাভ ক'রলেন, অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েকদিন যাবৎ রাঘবের বাড়িতে অতিবাহিত ক'রতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ।
রহিলেন কথোদিন রাঘব ভবন ॥

পানিহাটি গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে এঁদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। এঁদের দেখতে এলেন গদাধর দাস। পুরন্দর পণ্ডিত। বৈদ্য পরমেশ্বর দাস। রঘুনাথ বৈদ্য প্রভৃতি। এঁরা সকলেই এঁদের বিশেষ অন্তরঙ্গজন।

এইমত যথাযথ বৈষ্ণব আছিলা।
সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা।

এইখানেই একদিন নিভৃতে ডাকলেন রাঘব পণ্ডিতকে, সঙ্গে মাত্র শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁকে দেখিয়েই শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে ব'ল্লেন শোন! আমার মর্মের একটি কথা এই নিত্যানন্দ হ'লেন আমার দ্বিতীয় দেহ, এছাড়া আরও গোপনীয় এই কথা যে, এঁরই আদেশ নির্দেশ পালন ক'রে আমার জীবনের সব কিছু—

রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই।
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥

শেষের কথাগুলির অর্থ সুদূর প্রসারী। অর্থাৎ আমার অসম্পূর্ণ কাজের জীবনটি এই নিত্যানন্দই পূর্ণ ক'রবে, এবং এই তোমার এখান থেকেই তার সূচনা হবে।

এমনি ইঙ্গিত পূর্ণ কথা ক'য়ে একটি গম্ভীর পরিবেশ সৃজন ক'রলেক শ্রীগৌরাঙ্গ। তারপর আরও কয়েক দিন ঐ পানিহাটিতেই রাঘব পণ্ডিতের আবাসে কাটিয়ে নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এলেন বরাহনগরে। (এই বরাহনগর বিংশ শতাব্দীর বাংলায় একটি প্রখ্যাত চিহ্নিত ভূমি, এখানেই প্রখ্যাত বৈষ্ণবগুরু শ্রীরামদাস বাবাজী

মহাশয় সুদীর্ঘকাল অবস্থান ক'রে শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ ধারাটি ব্যক্তিজীবনে ও কীর্ত্তনের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং এখানেই তাঁর সমাধিমগ্ন দেহের পবিত্র স্মৃতি মন্দির, আর বাংলার অভিনব বৈষ্ণব ধর্মও প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য প্রাচীন পুঁথির একটি বিশাল আগারও স্থাপিত)।

এই বরাহনগরে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস ক'রতেন তিনি সুপণ্ডিত ও ও শ্রীমদ্-ভাগবতের পাঠক এবং কাব্যে ভাগবতের অনুবাদক।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।

এঁর জীবন পরিচয় পূর্ব থেকেই জানতেন। এঁর আলয়ে একটি দিন অবস্থান ক'রেই, গঙ্গার তীর ধ'রে নীলাচলে যাত্রার পথ ধরলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি লোকের অবস্থা (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীক) কেমন, তাই হয়তো জানানর ইচ্ছা শ্রীগৌরাঙ্গের মনে নিবদ্ধ ছিল। কারণ বাংলার এইসব পথ ও গ্রামকে নিয়েই নিত্যানন্দের পরবর্ত্তি অভিযান শুরু হবে। প্রতিটি গ্রামেই শ্রীগৌরাঙ্গের সমাজ উন্নয়নের পথে সহায়ক ও গুণগ্রাহী ভক্ত বাস ক'রতেন—

এই মতপ্রতি গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সভারি করিয়া মনোরথ পূর্ণকাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল ধাম॥

তারপর' পথ পর্য্যটনের প্রথা অনুযায়ী, পূর্বের রীতিতে যথাসময়ে এসে উপনীত হ'লেন নীলাচলে। এইবারই শ্রীগৌরাঙ্গ স্থির ক'রলেন স্থায়ীভাবে বাস ক'রবেন নীলাচলে এবং কাশী মিশ্রের আলয়ে।

হেন মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশী মিশ্র গৃহে কুতুহলে॥

এই কাশীমিশ্রের আবাসেই শ্রীনিত্যানন্দও থাকলেন শ্রীগৌরাঙ্গের সান্নিধ্যে পেয়ে। তিনি নীলাচলে অবস্থানের সময়, যতক্ষণ বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ক'রতেন শ্রীনিত্যানন্দ সেই সময়টিতে শ্রীগৌরাঙ্গেরই গুণগাথা ও জীবন চর্যার আলাপন ক'রে কাটাতেন, আর প্রতি কথাতেই সম্ভাষা ক'রতেন—"জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক শ্রীনিত্যানন্দমুখে অন্য॥
হেন মতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই॥

উভয়ের আনন্দময় জীবন উভয়ের কাছেই অনন্য আস্বাদ্য হয়। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গের মন ক্রমেই চঞ্চল হ'তে থাকে। তিনি মনে ক'রতেন এইভাবে নীলাচলে সন্ন্যাসীর জীবনানন্দ ভোগ করাই কি তাঁর আশৈশব স্বপ্নসাফল্য লাভ? এই কি সচেতন মনের সংঘাত সৃষ্টি করার জীবন?

ফেলে আসা বাংলার যে সামাজিক রূপ অদ্যাবধি দেখা হ'য়েছে, তার সংস্কার সাধন

করার ব্রতই তো গ্রহণ ক'রেছিলাম, সে ব্রত কি উদ্‌যাপিত হ'য়েছে? বাংলার বিরাট সমাজের যে অধঃপতন হ'য়েছে, তার উন্নয়ন কি এমনি এক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকার মধ্যে সাধিত হবে? নীলাচলে ব'সে ভক্তের স্তব প্রশস্তি গুণগাথা শোনা, আর তাতেই পরিতৃপ্ত হ'য়ে থাকলেই হবে? যাদের নৈতিক বল, সব দিক থেকেই বিপন্ন হ'য়ে গিয়েছে, তাদিকে উন্নত ক'রে তুলে ধরার জন্য, কার ওপর সে ভার ন্যস্ত ক'রে আসা হ'য়েছে? কে পারবে সেই উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা অবহেলা থেকে মুক্ত ক'রে মানুষকে উন্নত শিরে দাঁড় করিয়ে, তাকে বলাতে "আমরা এক জাতি এক প্রাণ?" ওই যে যারা নিজেদের প্রভুত্বকে কায়েম ক'রতে, ঈশ্বরের আর শাস্ত্রের বাণীর নাম দিয়ে, নিজেদেরই আসনকে দৃঢ় ক'রতে, মানুষের মধ্যে নানান্ জাতি বিভেদ সৃষ্টি ক'রে নিজেদিকে ভূদেব ভূসুর ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মৃত্তিকা,প্রস্তরে গঠিত প্রতিমার সম্মুখে ব'সে নিজেদের ভোজ্য পেয়ে; বসন ভূষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় তৎপর, তাদেরই হাতে বাংলার, সেই দুঃখী মানুষদিকে তুলে দিয়ে আসা হোলো? আর, কঠিন পরিশ্রম ভয়ঙ্কর বিপদকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে, যে নিতাই এ কাজে আরও জোরের সঙ্গে আমাকে টেনে এনে, বাংলার মানুষের কাছে এক অভিনব আদর্শ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রলেন, তাকেও অবজ্ঞা ক'রে, নীলাচলে নৈষ্কর্ম-সাধক সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করলাম?

এছাড়া তাঁর মনে আরও কয়েকটি প্রশ্ন অবশ্যই জেগে থাকবে, "যাদের অন্তরে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, জীবনে শান্তি আনার জন্য, সমাজে সহিষ্ণুতা শিক্ষার জন্য নিতাই নিজের জীবনকেই আদর্শ ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন, সেই নিতাই কি সত্যই আজ নীলাচলে ব'সে, শুধু আমারই প্রসঙ্গ নিয়ে জীবন পালন ক'রতে চান?

কিন্তু আমার বাংলায় এখনও তো সেই মহৎ প্রভাবের এতটুকু মলিনতা আসে নাই সেই দেখতেই তো গৌড় ভূমিতে আবার ফিরে যাওয়া? তাইতো শান্তিপুর, নবদ্বীপ কুমার হট্ট, পানিহাটি, বরাহনগর আর ভাগীরথীর তট ধ'রে, গ্রাম বাংলার পথে পথে আবার ফিরে আসা? কৈ কোথাও তো দেখি নাই অবহেলিত মানুষের দল তেমনি উন্মুখতা হারিয়েছে? কিন্তু ঐ ভাবে দেখা দিয়েই কি নিতাই তাদের দায় থেকে খালাস পাবেন?

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর আরও ভেবেছেন, সেই সব মানুষের মনকে এত কাছে পেয়েও এবং তাদের অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধা পেয়েও কৈ তাদিকে তো মানবতার সাম্মানিক আসনে বসান হয় নি? বাংলার গণমনে তো জাগরণ আনা হয় নি?

যে উচ্চবর্ণের আসনে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁরা নীচতা কুৎসিৎ স্বার্থপরতা, নিস্ফল দাম্ভিকতা প্রকাশ ছাড়া জনগণের জন্য কি ক'রেছেন? ঐশ্বরিক বিধি বিধানের কৃত্রিমবাণীর আস্ফালন সম্বল ক'রে ওরা নিরক্ষর দুর্বলের প্রতি চরম অবহেলা করাই কায়েম ক'রে আসছেন, এই কায়েমী স্বার্থবাদ কার প্রয়োজনে? কিসের প্রয়োজনে। তাও ওরা জানে না, সুযোগ মাত্র পেয়েই, ওরা উচ্চবর্ণের সংঘ সৃষ্টি ক'রে, প্রচারের শঠতায় জিইয়ে রেখেছে জাতি বৈষম্যের মিথ্যা ঈশ্বরীয় বাদ। এরা ধর্ম্মে উৎসবে শিক্ষায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক'রেছে, সর্ব্বত্রই নীতিহীন এক কুৎসিৎ স্বার্থ-সন্ধানীর প্রতি

যোগিতা, যার ফলে, সমগ্র বাংলায় ঐ বিষাক্ত কলুষ আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়ে র'য়েছে। যারা দরিদ্র তারা তো শাসক শ্রেণীর নয়, তারা কারোর শোষকও নয় সমাজের কর্ত্তাও নয় তবে তারা কেন উচ্চবর্ণের কাছে শাসকের কাছে অধঃপতিত হয়ে আছে ?

এ ধারার পিছনে আনতে হবে নতুন বিদ্রোহ শক্তি সে শক্তির জাগরূক ব্যক্তির স্পর্শ না পেলে আদর্শ-সৃষ্টি করা যাবে না এর জন্য চাই শক্তির একাগ্রতা, ঐকান্তিকতা, আর চরিত্রের দৃঢ়তা এবং আদর্শ সৃষ্টির জন্য সব কিছু ত্যাগ করার পণ। এ সব সম্পদের সবই আছে নিত্যানন্দের মধ্যে, তিনিই চেতনার সম্পদ, অসাধারণ ক্ষমতার উৎস, অপূর্ব্ব বিপ্লব আনার দক্ষতার অধিকারী।

শ্রীগৌরাঙ্গের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো' তাই তিনি নিভৃতে ডেকে এনে শ্রীনিত্যানন্দকে ব'ল্লেন—নিতাই ! তুমিও ভুলে থাক্‌লে আমার বাংলার মানুষকে ? যারা তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে, যারা তথা কথিত উচ্চ বর্ণের স্বার্থ-সংঘাত পোষণ ক'রে আমার বাংলার মানুষকে ক'রেছে মূর্খ, যারা শাসক গোষ্টীর সঙ্গে যোগসাজস ক'রে মানুষকে ক'রেছে দরিদ্র, যারা নিজেরাই বর্ণসঙ্কর হ'য়ে জন্ম গ্রহণ ক'রে, অপরকে ক'রেছে নীচ, তাদেরই অবহেলায় আমার গৌড়ের আজ অধঃপতন ঘ'টেছে।

নিতাই যাও তুমি সেখানে, তাদের মুখের পানে চেয়ে আমার জীবনের স্বপ্নকে সফল কর। আমার আর তো কিছু সাধ নাই নিতাই ! আজ এখানে তোমার এই মুনি ধর্ম্মের আচরণ কি শোভা পায় নিতাই ? তুমি তো সবই জান, কেন আমাদের আসা এ ধরায় ? ঈশ্বর ভক্তিই তো সব মানুষের মধ্যে ঐক্য আনে, কিন্তু সে ঐক্য সাধনে যারা জাতি বর্ণের ধনবত্তার আর শিক্ষার গণ্ডী বেঁধে দিয়ে দিয়ে—বাদ সাধছে, তাদের মধ্যেও তোমায় আনতে হবে চেতনা, শেখাতে হবে আর বোঝাতে হবে তোমায়, ও পথ কুৎসিত পথ, ওটা ঈশ্বর আরাধনার পথ নয়—

একদিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি, মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার॥
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥
মূর্খ, নীচ, দরিদ্র দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥

শ্রীনিত্যানন্দ অপেক্ষাই ক'রছিলেন এমনি একটি আদেশের,' স্বাধীন ভাবে কিছু করা আর সংঘ শক্তির নেতার আদেশকে নিজের অভিমতের সঙ্গে যাচাই ক'রে তাকে রূপ দেওয়া তো এক নয়।

তাই শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের এই আদেশকে সার্থক রূপ দান ক'রতে ত্বরান্বিত হ'লেন।

শ্রীনিত্যানন্দের সেই প্রচেষ্টাকে আরও বলবতী ক'রতে তাঁর সহকর্মী চাই, তেমনি কর্মির দলও শ্রীগৌরাঙ্গ নির্বাচন ক'রে দিলেন—যাঁরা নীলাচলে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে এবং যাঁরা নিত্যানন্দের মত প্রাণ শক্তির প্রচুর্য্যে ভরপুর, তাঁদিকেই জানালেন তাঁদের এবার কর্ত্তব্য; তাঁরাও শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে সত্বরই গৌড় অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন—

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড় দেশে লইয়া নিজ গণে॥

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে যাত্রা ক'রলেন ছয় জন, রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাশ ও পুরন্দর পণ্ডিত এ'রা শ্রীনিত্যানন্দের মতই উদার স্বভাব এবং দৃঢ় চরিত্র।

দৃঢ় মনোবল এই পুরুষবৃন্দই একদিন পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে উপস্থিত থেকে নিতাই গৌরাঙ্গের আরব্ধ কাজ কি, তা জানতে পেরেছিলেন।

পুনরায় তাঁরা সেই পানিহাটি গ্রামেই ফিরে এলেন; এখান থেকে শুরু হবে পতিত উন্নয়নের কাজ—

হেন মতে নিত্যানন্দ অনন্ত গুণধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম॥
পরিপূর্ণ প্রেম রসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তরিতে করিলেন শুভারম্ভ॥

এই পানিহাটিতে তাঁরা তিনটি মাস অবস্থান ক'রে পতিত উন্নয়নের যে ধারাটি শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, সেই সংকীর্ত্তনের মাধ্যমেই সকলকে একত্র ক'রে, কারও প্রতি বিদ্বেষ না জানিয়ে, শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের দ্বারা সকল জাতির মানুষকে ঐক্য বদ্ধ ক'রতে লাগলেন। শ্রীনিত্যান্দের সহকর্মি-বৃন্দও সমান উদ্যমে সেই কাজটির আরও অগ্রগতি সাধন ক'রতে লাগলেন।

এই মত পানিহাটি গ্রামে তিনমাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম্মে তিলার্দ্ধেকো কাহারো না স্ফুরে॥

প্রত্যেকেই শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে তাঁর আচরণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পতিত উন্নয়নে কার্যে আত্মনিয়োগ ক'রলেন।

আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥

শ্রীনিত্যানন্দের এই কাজটির দ্বারা আর্যদের পূর্বের ব্যক্তিদের মালিন্য মোচন ইতিহাসের কথা স্মরণে আসে। অর্থাৎ—ভারতে বৈদিক সংস্কৃতি প্রসারের সময় যেমন "ব্রাত্য উন্নয়নের" একটি রীতির প্রচলন হয়, ঠিক সেই কাজেরই নবরূপে শুরু করলেন শ্রীনিত্যানন্দ। ব্রাত্য অর্থ প্রাক আর্যের মালিন্য বা মলিন সংস্কার মোক্ষণ।

তারপর তাঁদের সেই পতিত উন্নয়নের কাজটি এমন ভাবে ক'রতে লাগলেন, যাতে প্রতিটি মানুষ শ্রীনিত্যানন্দের ও তাঁর গণের নিকট সান্নিধ্যে এসে শিক্ষা লাভ করেন।

প্রতিটি গ্রামের প্রতি ঘরে, প্রতি জনের কাছে গিয়ে, তাঁদিকে আলিঙ্গন উপদেশ, তাঁদের সঙ্গে ব'সে আহার, তাঁদিকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের কীর্ত্তন মণ্ডলী স্থাপন, আবার তাঁদিকে দিয়েই অন্যত্র ঐভাবে পতিত উন্নয়নের ব্যবস্থাও ক'রলেন।

জাহ্নবীর দুই কুলে আছে যত গ্রাম।
সর্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥

এ এক অভিনব পদ্ধতি। যাতে পুরুষ রমণী শিশু বৃদ্ধ সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর গণের সঙ্গে যোগ দেয়। যাতে সকলেই তাঁর প্রচার ধারায় আকৃষ্ট হয়, তারই জন্য শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর গণ—সকলেই সেই কীর্ত্তনটিতে নাম গানের সঙ্গে, অপরূপ ভঙ্গিমায় নৃত্য, এই দুটিই হ'য়েছিল জনমনের প্রকৃষ্ট আকর্ষণ—

যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন॥

এ যে কি আকর্ষণের, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব'লেছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন॥
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুজন।

এই রীতিটি প্রবর্ত্তনের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের অপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি হ'য়েছে—বিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায়, ভারতের শিশুরা যেমন খেলার ছলে "বন্দেমাতরম্।" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" চলবে না, মানতে হবে" ইত্যাদি ধ্বনিগুলি আধআধো ভাষায় অস্ফুট ভাষায় বলে আর তেমনি উল্লাসধ্বনিও করে।

শিশুরাই জনজীবনে শক্তি গঠনের প্রধান উৎস। তাই শিশু জীবনের প্রধান আকর্ষণ গান ও নৃত্য। তারই মাধ্যমে, তিনি তাদের পিতা মাতারও মন জয় ক'রে, তাঁদিকে ঐক্যবদ্ধ করার নূতন পথ গ্রহণ ক'রলেন।

শুধু নৃত্য কীর্ত্তন ক'রেই তাদের মন জয় ক'রতেন না, নিজহাতে তাদিকে জড়িয়ে ধ'রে, তাদের মুখে আহার্য তুলে দিতে দিতে নিজেও খেতেন। এরই দ্বারা প্রত্যেককে আপন ক'রে নিয়ে তাদিকে বুকে চেপে ধ'রে, নিজের উদার প্রাণ শক্তিরও সঞ্চার ক'রতেন—

পুত্র প্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া॥

এই ভাবেই সপারিষদ্ শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ের গ্রামে গ্রামে পতিত উন্নয়নের কাজ ক'রতে ক'রতে এলেন এঁড়েদহে। তারপর নবদ্বীপ। তারপর খড়দহ। তারপর সপ্তগ্রামে।

এই সপ্তগ্রামেতে ছিল সুবর্ণ বণিক জাতিরই প্রধান অধিবাস। এঁরা ছিলেন উচ্চ-শ্রেণীর জাতিগোষ্ঠীর কাছে অস্পৃশ্য। অথচ, এই সপ্তগ্রামই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। বহু বর্ণের মানুষকে বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে আসতে হ'তো, কিন্তু বর্ণগত সংস্কারের জন্য, একটি শ্রেষ্ঠ বণিক সম্প্রদায় ছিলেন সর্বাপেক্ষা অবনত। এঁদের জল স্পর্শ করা দূরে থাক্ এঁদের অঙ্গ স্পর্শ ক'রলেও উচ্চবর্ণের মানুষের দেহে অপবিত্রতার স্পর্শ লাগতো। সুবর্ণ বণিকের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দির, দেব বিগ্রহ, তাঁরাও উচ্চবর্ণের কাছে বন্দনীয় হোতেন না। এই সপ্তগ্রামেই এলেন শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর পতিত উন্নয়নের প্রচার কার্য্যে। যাঁরা সমাজে অস্পৃশ্য জাতি, সেই সুবর্ণ বণিকজাতির বাড়িতেই অবস্থান, আহার ও নাম কীর্ত্তনের মণ্ডলী স্থাপন ক'রলেন—

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ, খড়দহ।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সহ।
সপ্তগ্রামে সুবর্ণ বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম, মূর্খ, যে কৈল উদ্ধার॥

এই সব অস্পৃশ্য জাতির উন্নয়ন সংস্কার স্থাপন করার জন্যই, বাংলার উচ্চ বর্ণের লোক, ক্রমেই" এক নূতন' আশঙ্কায়. গ্রস্ত হ'তে লাগলেন। কিন্তু যাঁরা এত-দিন উচ্চ বর্ণের কাছে, অর্থাৎ উচ্চ জাতির কাছে বিশেষ' উদ্দেশ্যে তাঁরা পতিত ও মূর্খ ব'লে চিহ্নিত হ'য়ে ছিলেন, তাঁদের কাছে আজ শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর গণ হ'য়ে উঠলেন পতিত পাবন। তাঁর সেই পতিত পাবন গণের এই বিজয় অভিযানকে তাঁরা তনু মন ধন দিয়ে আরও জাগিয়ে তুলতে লাগলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারণটি হ'য়ে উঠ্‌লো দুর্বার। পানিহাটি থেকে অম্বিকা কালনা, এই সীমিত ভূখণ্ডটি হ'য়ে উঠলো শ্রীনিত্যানন্দের পতিত উন্নয়ন কার্য্যের ও বিজয় অভি-যানের কেন্দ্রভূমি। এই ভূমিকে ঐজন্য বলা হয় ঐতিহাসিক সমাজ ও সমাজ-বিপ্লবের আদি ভূমি।

শ্রীনিত্যানন্দের ও তাঁর গণের এই অভিযানটি আরও কতখানি ভূমিতে প্রসারিত হ'য়েছিল, সেটি বর্ণনা ক'রেছেন জয়ানন্দ।

যদিও তাঁর গ্রন্থটির বহুলাংশই পণ্ডিত সমাজের কাছে ঠিক ঠিক ইতিহাস এবং শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের চরিত্র বর্ণনার নিখুঁত তথ্যচিত্রের আধার নয়, তবুও এবিষয়ে অনেকেই তাঁরা একমত যে, শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তনবিজয় ও পতিত উন্নয়নের কাজটি যে, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত গ্রামগুলিতে ঘটেছিল, তা নিঃসন্দেহ। কারণ, ঐসব গ্রামে তখন উচ্চ শ্রেণীর লোকের যত বাস ছিল—নিম্ন বর্ণের লোকের বাস আরও বেশী-ছিল, অথচ অধিকাংশ জমি জায়গাই ছিল উচ্চ বর্ণের দখলে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর পার্ষদ বৃন্দের দ্বারা পতিত উন্নয়নের কাজ ঘটেছিল এইসব গ্রাম থেকে—

আগে পানিহাটি. আর আকনা মহেশ।
পুণ্যভূমি সপ্ত গ্রাম, ধন্য রাঢ় দেশ ॥
খড়দা, কাঠাল পাড়া, তাম্বলী, পাথর ঘাটা ॥
হাথিয়া গড়, ছত্র ভোগ, বরাহনগর।
কোঠ রঙ্গ, রাণীদীঘি, চাতরা, মনোহর ॥
হাথিয়া কান্দা, পাঁচ পাড়া, বেতড় বুঢ়ণ।
অম্বুয়া, বড়গাছি, কাঁচপাড়া (কাঁচড়া পাড়া) সুপত্তন ॥
কাশী আই, পঞ্চ অঙ্গরিয়া, দহ কালিয়া।
থানা চৌড়া, ফুলিয়া, দো গাছিয়া ॥
নিমদা, চৌরিগাছা, উদ্ধরণপুর, নৈহাটি।
বসই বেনড়া খণ্ড, হাটাই চডথি ॥

এই সব গ্রাম ও তাদের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলিই ছিল শ্রীনিত্যানন্দের ও তাঁর প্রধান ৩৬জন পার্ষদের পতিত উন্নয়নের কেন্দ্র। সেই ছত্রিশ জন অন্তরঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ জন ছিলেন সর্বাধিক মরমী সহায়।

এঁরা তাঁদের শ্রীগুরু শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে ও আদর্শে সর্বদা অনুপ্রাণিত হ'য়েই, পতিত উন্নয়নের কাজটি সফল ক'রে তুলেছিলেন।

এস্থলে তাঁদের আর একটি তালিকাও পাওয়া যায় জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে। জয়ানন্দ লিখেছেন ৪১ জন, আর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখিত হয়েছে ৭৫ জন। এই প'চাত্তর জনের সকলেই যে শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, তেমন ইঙ্গিত শ্রীচরিতামৃতে পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখেছেন ৩৬ জনের মধ্যে ১২ জন ছিলেন অধিকতর মরমী।

১। অভিরাম ঠাকুর	৫। গৌরীদাস পণ্ডিত	৯। পরমেশ্বর দাস
২। সুন্দরানন্দ ঠাকুর	৬। কমলাকর পিপ্‌লাই	১০। কালা কৃষ্ণ দাস
৩। পুরুষোত্তম নাগর	৭। উদ্ধারণ দত্ত	১১। শ্রীধর পণ্ডিত
৪। ধনঞ্জয় পণ্ডিত	৮। মহেশ পণ্ডিত	১২। পুরুষোত্তম পণ্ডিত

যে সময় শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা ক'রেছেন, সেটি শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পর। কিন্তু তখনও তিনি দেখেন নাই, সেই ৩৬ জনের মধ্যে বা ১২ জনের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দের আত্মজ ব'লে চিহ্নিত করা কোন ব্যক্তির নামকেও স্মরণীয় করার প্রয়োজন আছে। অবশ্যই তা আসে নাই। আর শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানেন্দের বিবাহও দেখেন নাই এবং শোনেনও নি। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য দেহটিও তখন প্রকটিতই ছিল না। তাছাড়া শ্রীনিত্যানন্দ যে তাঁর আদেশে বঙ্গভূমিতে ঐভাবে পতিত উন্নয়নের কাজটি অবিশ্রান্ত মনে ক'রে চলেছেন, সে সংবাদ তিনি নিয়তই পাচ্ছিলেন। তখনতো শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনাই হয় নাই। তাই শ্রীবৃন্দাবন দাস বেদনার সঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন—

"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর চন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।
তথাপিও, এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্ত বৃত্তি রয়॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি, ষষ্ঠ অধ্যায়।

তারপর—মধ্যলীলার ২২ অধ্যায়ে লিখেছেন—

নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার।
হেন দিন হইব কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ্ সহ একঠাঁই॥

এ গ্রন্থটি রচিত হ'য়েছিল কবি কর্ণপূরের প্রখ্যাত নাটক "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়' গ্রন্থের পর। কারণ, শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ে সার্বভৌমের সঙ্গে, শ্রীচৈতন্যের-মিলনপ্রসঙ্গে ঐ নাটকের ষষ্ঠাঙ্কের ২টি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রেছেন—একটি "কালান্নষ্টং ভক্তি যোগং নিজ যঃ" আর একটি "বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি যোগঃ…"

কর্ণপূরের অন্যতম গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য। এর অন্তিম শ্লোক ধ'রে হিসাব ক'রলে দেখা যায় ও গ্রন্থটি ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হ'য়েছে, তাতেও সন্ধানে ক'রে পাওয়া যায় না—শ্রীনিত্যানন্দের কোন সন্তান বা আত্মজের একটুও ঈসারা আছে, আর তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গেরও কোন উল্লেখ নাই। ওঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক এটিরও শেষের শ্লোকের অঙ্ক থেকে পাওয়া যায় নাটকটি সমাপ্ত হ'য়েছে—১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ এ নাটকেও শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের কোন প্রসঙ্গই নাই।

অথচ—শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ ব'লে যাঁদের নাম উল্লেখিত হ'য়েছে, এমনকি বাংলা ভাষার প্রখ্যাত গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,তার আদি লীলার ১দশ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দের যে অন্যতম পার্ষদ ছিলেন "বীর ভদ্র' নামে আরও এক জন, তারই উল্লেখ।

কিন্তু তিনি যে শ্রীনিত্যান্দের সন্তান; তেমন কথা একটু ঈসারাতেও বলা নেই। অথচ এই বিখ্যাত গ্রন্থটি ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।

ওখানে এইটুকু মাত্র বলা আছে—

বীরভদ্র গোঁসাই মূল স্কন্ধ শাখ।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥

আবার, ঐ শ্রীচরিতামৃতে বীর-ভদ্রের শাখাটিকেই বলা হ'য়েছে—

সর্ব শাখা শ্রেষ্ঠ বীর ভদ্র গোঁসাই।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই॥

এখানে গোঁসাই শব্দটি গোস্বামী শব্দের অপভ্রংশে নয়। নিরঞ্জন উপাসক সম্প্রদায়ের ভাষা।

যে সন্ধান ষোড়শ শতাব্দীর পর পাওয়া গেল, সে সন্ধান ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় পাওয়া গেল না কেন? অথচ চরিতামৃতে স্পষ্ট বলা হোলো বীরভদ্রের শাখা শ্রেষ্ঠ শাখা। তখন বীরভদ্র নিশ্চয় শিশু নন।

অতএব প্রশ্ন ওঠে বৈকি কে সেই বীরভদ্র?

এদিকে দেখা যায়, বাংলার বৈষ্ণব সমাজে এমন অনেক গ্রন্থের প্রচলন র'য়েছে, যাঁদের বক্তব্যে পাওয়া যায় বীরভদ্র ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের এক মাত্র পুত্র।

(১) প্রথম উল্লেখিত

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে

কিন্তু এ গ্রন্থটির অনেক বক্তব্যই তো বাংলার বৈষ্ণব সমাজে অদ্যাবধি প্রামণ্য নয়, আর অনেক ক্ষেত্রে মাননীয়ও নয়। তাছাড়া, ঐতিহাসিকবৃন্দও এর উক্তিকে তেমন আমলই দেন নাই।

কেন জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের অনেক কথা প্রামাণ্য নয়?

(১-ক) এ গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারকে প্রামাণ্য করার জন্য জৈমিনী সংহিতার যে শ্লোকটি উদ্ধৃত ব'লে গণ্য করা হ'য়েছে, সেটি প্রকৃতই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, এবং নবীন রচনা। (১-খ) চৈতন্য মঙ্গলে দেখান হ'য়েছে, শ্রীচৈতন্যের পিতা ছিলেন প্রচুর ধনের মালিক। কিন্তু চৈতন্যের অন্যান্য জীবনীকার মুরারি, কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস এঁদের কেউ বলেন নাই তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ধনী ছিলেন।

(১-গ) জয়ানন্দ ব'লেছেন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পিতার অন্তর্ধানের পরই প্রথমে গয়া যান; তারপর বিবাহ করেন। তারপর বঙ্গদেশে ভ্রমণ করেন। এটাও ঠিক নয়।

(১-ঘ) চৈতন্য মঙ্গলে বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেব ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ২৮ বৎসর বয়সে নীলাচলে বাস করেন। এও অনৈতিহাসিক।

(১-ঙ) ও গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান কাহিনীর অবতারণার সঙ্গে আছে কাহিনীর সমাবেশ—

(১-চ) তারপর আছে, শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধান বার্ত্তা, সেই বার্ত্তাতেই দেখা যায়—বীরভদ্র নামক কোন ব্যক্তি সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তবে জয়ানন্দ ওখানে বলেন নাই, সেই বীরভদ্র ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র, ওখানে এই পর্যন্ত ব'লেছেন—

আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি।
নিত্যানন্দ বিজয় শুনিল সে মহান্ত।
বীরভদ্র দেখি, সভে দাঁড়াইল একান্ত॥

(১-ছ) এই জয়ানন্দই আবার অন্যত্র ব'লেছেন শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন বিবাহিত পুরুষ। তাঁর এক পুত্র বীরভদ্র। অপর পুত্র রামভদ্র—

কথোদিনে নিত্যানন্দ শিখা সূত্র ধরি।
মহামল্ল বেশ, ক্ষিতি পর্য্যটন করি।
সূর্যদাস নন্দিনী শ্রীবসু, জাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিলেন স্বচ্ছন্দ কৌতুকী।

বসুগর্ভে প্রকাশ গোঁসাই বীরভদ্র।
জাহ্নবী নন্দন রামভদ্র মহামদ'॥

জাহ্নবীরও যে পুত্র সন্তান ছিল এ সংবাদ জয়ানন্দই জানতেন। কিন্তু তীর্থ পর্যটন ক'রে আসার পরই তো শ্রীগৌরাঙ্গের সান্নিধ্য লাভ করেন, সে সময়কার অবস্থায় কৈ কেউই তো জানতেন না তারপরই শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ ক'রেছিলেন?

জয়ানন্দের এই উদ্ভট বিচিত্র সংবাদটি কিন্তু মুরারি, কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস এমন কি পরের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজও জানতেন না।

আরও উদ্ভট কথা ও কাহিনী জয়ানন্দের গ্রন্থে দেখা যায় এবং জয়ানন্দের চৈতন্য গ্রন্থটির যে অনেকাংশ কোন মতলব বাজের লেখা, এমন বিশ্বাস অবশ্যই করতে হয়। অর্থাৎ এ সব অংশ জয়ানন্দের লেখাই নয়।

(১-জ) জয়ানন্দের গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে যোগ তত্ত্বের প্রামাণ্যও খুব।

(১-ঝ) চৈতন্যমঙ্গলের জড়ভরত উপাখ্যানে রয়েছে মুক্তি লাভের খাঁটি উপায় হোলো যোগ ভক্তি।

(১-ঞ) যোগে ধ্যেয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের দ্বারাই নির্বাণ লাভ।

(১-ট) জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে সেই যোগ তত্ত্বটি সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্ব প্রসঙ্গের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করা হ'য়েছে, যেটি গৌড়ের বৈষ্ণব সমাজে একেবারে অচল, নমুনা দিই—

আউট হাত ঘরখানি, তাতে দশ দ্বার।
তার মধ্যে আছে, ছয় রসের ভাণ্ডার।
একাদশ চোর তাহে, দস্যু পাঁচ জন।
গঙ্গা যমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ॥
হংস ক্রীড়া করে তাহে, চরে দশাঙ্গুলে।
সহস্রদল পদ্মমধ্যে শত দল পদ্ম।
তার মধ্যে রত্ন সিংহাসনে দেব সদ্ম॥
প্রধান পুরুষ তাহে প্রকৃতির পর।
তার মধ্যে পরমাত্মা পুরুষ ঈশ্বর॥

(১-ঠ) জয়ানন্দের নামে চালু এই চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থটি বাউল সম্প্রদায়ের খুব প্রিয় গ্রন্থ। যোগাচার সম্পন্ন বাউল সম্প্রদায় বলেন, জয়ানন্দ ছিলেন বীরভদ্রের শিষ্য, এবং আমরা সেই তাঁরই সম্প্রদায়ের। তাঁরা আরও বলেন, অভিরাম ও বীরভদ্রের কাছে যোগ শিক্ষা ক'রেছিলেন জয়ানন্দ। সেই যোগের বিভূতি লাভ ক'রেছিলেন আরও যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মুরারি চৈতন্য, সুন্দরানন্দ, কমলাকর পিপ্‌লাই এবং গদাধর দাস। এই জন্যই সবার গুরু জয়ানন্দ সব মহাত্মার যোগের বিভূতি প্রকাশ জানাতে তাঁর চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখেছেন (৫১ পৃষ্ঠায়)—

মুরারি চৈতন্য দাস ব্যাঘ্র ধরি আনে।
নাগ শয্যায় নিদ্রা যায়, সর্বলোকে জানে॥
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, পানির ভিতরে।

কুম্ভীর ধরিয়া আনে সবার গোচরে ॥
প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপ্‌লাই।
নিজ অঙ্গ কাটি তমু বাহ্য জ্ঞান নাই ॥
কাজি সনে বাদ করি গদাধর দাস
অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ্‌ দেয় দেখে লোকে ত্রাস ॥

(১-ড) জয়ানন্দ ব'লেছেন শ্রীনিত্যানন্দের পিতার নাম পরমানন্দ। এটি লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলেও আছে। ওদিকে প্রেমবিলাস নামক আর এক গ্রন্থে এবং জাল গৌর গণোদ্দেশে বলা হ'য়েছে; শ্রীনিত্যানন্দের পিতার নাম ছিল হারু ওঝা এবং তাঁর অন্য নাম মুকুন্দ।

(১—ঢ) জয়ানন্দ ব'লেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করার পর, খড়দহে বসবাস ক'রেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে ব'হে ॥

(১—ণ) এত কিছু আবোল তাবোল ব'ললেও, জয়ানন্দ কোথাও স্বীকার করেন নাই যে, তিনি শ্রীনিত্যানন্দের সান্নিধ্য লাভ ক'রেছিলেন। কিন্তু সেই নিত্যানন্দ যে ঋষি, পরমহংস এবং প্রেমসাগরের কর্ণধার ছিলেন, এ সব লিখতে ভোলেন নাই। আর কয়েকটি কথাও বেশ আগ্রহের সঙ্গে লিখেছেন, কথাগুলি হোলো শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে যান, তখন জয়ানন্দের মায়ের হাতের রান্না তিনি খেয়ে গিয়েছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল প্যাটরাটি খোলার উদ্দেশ্য এই যে—

১। শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহিত জীবন হ'য়েছিল একথা ব'ল্লে অনেক রকমেই তাঁকে কলঙ্কিত করা হয়। কারণ বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির মন্তব্যকে অস্বীকার করা হয় এবং অনৈতিহাসিক দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্র, আদর্শ অবধূত পরমহংস, ঈশ্বর পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দকে মিথ্যাবাদী কলঙ্কিত ও চরিত্রহীন করা হয়।

যে যে কারণে ঐ সব দোষের আরোপ হয়

১। তাঁর স্বরূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে যাঁরা তাঁর জীবনী রচনা ক'রেছেন তাঁদের লেখায় শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ হয় নাই।

২। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন পরমহংস অবধূত' সম্প্রদায়ের। ও সম্প্রদায়ে বিবাহ নিষেধ। তন্ত্রে ৪টি অবধুত সম্প্রদায় কুলাবধুত, গৃহাবধূত, শ্মশান অবধূত ও পরমহংস অবধূত।

শেষেরটিতেই ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ২।২৪ অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের কথা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—

আরে বুড়া বামনা! তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
"পরম হংসের" পথে আমি অধিকারী।

(৩) জয়ানন্দের আগের কোন লেখকই বলেন নাই শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন।

(৪) তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের কথায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়- কারোর মতে, নিত্যানন্দের আবির্ভাব—১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কারোর মতে নিত্যানন্দের আবির্ভাব—১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে

" " শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধান ১৫৪২ "

" " " " " ১৫৪৫ "

এই সঙ্গে সর্ববাদী সম্মত ইতিহাস, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান ১৫৩৩। এই শতক পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দের জীবন যাঁরা দর্শন ক'রেছিলেন, তাঁরা কেউ লেখেন নাই তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল।

তারপর, কবি কর্ণপুরের একটি প্রখ্যাত কাব্যেও যেটি ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের তিনিও বলেন নাই শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ হ'য়েছিল অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধানের সময়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈঃ চঃ নাটক (এটি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা) তাতেও ওঁর বিবাহ প্রসঙ্গ নাই।

এই নাটকটির পরে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা। তাতে কিন্তু ওঁর ওই প্রসঙ্গটি লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে। ও গ্রন্থটি নাকি কবি কর্ণপুরের রচিত ?

না, ওটি কর্ণপুরের রচনাই নয় (ওটি কোন মতলব বাজদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য লেখা।)

ওটি যে জাল তার যুক্তি এই—

১। গৌরগণোদ্দেশ বলা হ'য়েছে—

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রীব্রহ্ম, রুদ্র, সনকাহ্বা পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ।

অর্থাৎ পদ্ম পুরাণের উক্তিমত বৈষ্ণবের চারটি সম্প্রদায় কলিযুগে। শ্রীঃ ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। তাদের মধ্যে মাধ্ব মতবাদের প্রবর্ত্তক মাধ্বাচার্য্যও একটি।

এই মাধ্ব সম্প্রদায়ের কথাই প্রসঙ্গক্রমে লিখছি।
"তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে"

কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গের এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি মাধ্ব অনুগামী।

বাঃ, কর্ণপুর তো তা'হলে এই সম্প্রদায়টিকে ঠাট্টাই ক'রলেন। কারণ, শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরামানুজ হ'লেন ১১দশ শতাব্দীর পুরুষ। আর মাধ্বাচার্য্য হ'লেন ১৩ দশ শতাব্দীর পুরুষ। তাহ'লে পদ্মপুরাণ কত খ্রীষ্টাব্দের রচনা ?

তারপর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি কি ১৭ দশ শতাব্দীর আগে মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্ত ব'লে কেউ ঘোষণা ক'রেছিলেন ? মাধ্ব মত আর শ্রীজীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ মত কি এক ?

কর্ণপুর তো ষোড়শ শতাব্দীর শেষেই লোকান্তরিত হ'লেন, আবার তাঁরই রচনায় কে বসালে ও কথা ? ও গ্রন্থ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের রচনা নয় কি ?

২। গণোদ্দেশে খোলা বেচা শ্রীধরকে বলা হ'য়েছে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ?

খোলাবেচা তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।

অত্যদ্ভুট কথা। নবদ্বীপের তাঁতি পাড়ায় তন্তুবায় কুলজাত ছিলেন তিনি।

৩। শ্রীজীব গোস্বামীকে তিনি পূর্বলীলায় ইন্দিরা ব'লেছেন। (১৬৯) আবার সুশীল পণ্ডিতও বলেছেন (২০৩) শ্রীজীবের লোকান্তর হয়েছে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। আর, তার অল্প কিছু দিন মাত্র আগে বা পরে কর্ণপুরের লোকান্তর হ'য়েছে। তারই মধ্যে এই কাণ্ড?

৪। গণোদ্দেশে আছে সঙ্কর্ষণের ব্যূহই আবার বীরচন্দ্র হ'য়ে এসেছেন, (৬৩)। কিন্তু কৈ বল্লেননা তো তাঁর বাবার নাম কি? তাঁর মায়ের নাম কি?

৫। আবার ব'ল্লেন, শ্রীনিত্যানন্দের এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম গঙ্গা। তিনি নাকি পূর্বজন্মে প্রখ্যাত নদী গঙ্গা ছিলেন। এবারে নিত্যানন্দের কন্যা হ'য়েছেন। তা হ'লে উনি কার মেয়ে? মায়ের নাম কি? আর নদীও তাহলে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে?

এই সব পাগলামী ধরণের কথা বার্ত্তাও প্রামাণ্য? অতএব পরিষ্কার ধারণা করা যায়, ওই গ্রন্থটি কোনও জালিয়াতের লেখা। একটা রহস্য সৃষ্টি ক'রে, বীরভদ্রকে শ্রীনিত্যানন্দ সুন্দরের পুত্র ও গঙ্গাকে কন্যা ব'লে চালিয়ে দিতে তখনকার কোন প্রামাণ্য ব্যক্তিই ছিলেন না। কর্ণপুরের জীবিত কালেও এমন মিথ্যা উক্তি তাঁর নামে কেউ চালাতে পারতো না।

তবে, এক্ষেত্রে একটা পথ পাওয়া যায়, সেটা হোলো এই যে, বিভক্ত স্বাধীন ভারত গঠিত হওয়ার সময়, অনেক উদ্বাস্তু ব্যক্তি নিজেদের পূর্ব জাতি পূর্বনাম গোপন ক'রে, নূতন নাম সংজ্ঞায় পরিচিত হ'য়েছেন; ওখানে নম নামের জাতি এখন এ বঙ্গে কায়স্থ এমনি এক অঘটন ঘটনা ঘটা খুব স্বাভাবিক, এমনি হয় তো হ'য়েছিল; বীরভদ্রী থাক্, আর গঙ্গা বংশীয় থাক্। নইলে পরমহংস অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের নির্মল চরিত্রকে, বিবাহিত জীবনে চিহ্নিত করার সার্থকতা থাকে না। (তাতে নিত্যানন্দ কলঙ্কিত হোন, এতে আপত্তি করার কি আছে কিন্তু তাঁর বংশধরগণ যেন গোস্বামী হোন, পবিত্র ব্রাহ্মণ হোন)।

আরও যে কয়টি গ্রন্থ ওমনি উদ্ভট কাহিনীর প্রচারক—

অদ্বৈত প্রকাশ—এর লেখক ঈশান নাগর। ইনি ও এঁর মা শ্রীঅদ্বৈত প'রিবারে আশ্রয় লাভ ক'রেছিলেন। ঈশানের সমবয়সের ছিলেন শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র শ্রীঅচ্যুত। ঈশানের গ্রন্থে, শ্রীঅদ্বৈতের জীবনই মুখ্য। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন ওখানে গৌণ। খুব স্বাভাবিক।

এ গ্রন্থের বহু স্থানে যে সব তত্ত্ব নির্দে'শ, সেগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরই অনুসরণে। অতএব এ গ্রন্থটিও ঐ দিক থেকে বিশেষ মতলব প্রকাশ করার জন্য।

(১-ক). শ্রীঅচ্যুত কহে, রাধা কৃষ্ণ দুয়ে মিলি। কিবা বাঞ্ছা লাগি এবে এ অঙ্গহেলি
(১৬ অধ্যায়)

(১-খ) রসরাজ মহাভাব দুই সম্মিলন। ১৮ অঃ

(১-গ) রাধা অঙ্গ কান্ত্যে কৈলা অঙ্গ আচ্ছাদন। রাধা ভাবে কর স্বমাধুর্য্য আস্বাদন। ১৪ অঃ

অদ্বৈত প্রকাশের রচনা ১৪৯০ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন শ্রীচরিতামৃতের

প্রচার হ'য়ে গিয়েছে।

ঈশান নাগর জানতেন না, শ্রীঅদ্বৈত কোন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের পরকীয়া রতির আস্বাদক ছিলেন না আর রাধাকৃষ্ণের অভিন্নমূর্তিও তিনি ভাবতেন না।

২। ঈশানের দ্বিতীয় বক্তব্য শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে, তিনি ব'লেছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রথমে এলেন অবধূত বেশে, তারপর কপালে তিলক আর কণ্ঠে তুলসীর মালা ধারণ ক'রলেন—

অলৌকিক রূপ তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
কোটি সূর্য-সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর॥
ললাটে তিলক শোভে যৈছে চন্দ্র প্রভা॥
তুলসী কাষ্ঠের মালায় কণ্ঠ করে শোভা॥ (১৪ দশ অধ্যায়)

এই রূপটি কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন দাস দেখেন নাই।

৩। ঈশান ব'লেছেন, সূর্যদাস সরখেল নামে এক ব্যক্তির একটি কন্যা ছিল, নাম সুধা। সর্পের দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের চেষ্টায় তাঁর জীবন ফিরে আসে। পরে তাঁকেই বিবাহ করেন (১০ম অঃ)।

এই কাহিনীটি আর একটি জাল পুস্তক নিত্যানন্দ "বংশ বিস্তারে" অবিকল উদ্ধৃত হ'য়েছে।"

৪। ঈশানের একটি পঙ্ক্তিকা শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধানের পর তাঁর বিরহে শ্রীনিত্যানন্দ হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ ব'লে বিলাপ ক'রতেন। শ্রীঅদ্বৈতও। এমনি ভাবে আট বৎসর কাটিয়ে (২২ অধ্যায়) ১৪৬৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ অন্তর্ধান ক'রলেন।

ঈশানের লেখায় শ্রীনিত্যানন্দের গৌরাঙ্গ বিরহ এবং "আবার বিবাহ" এ দুইয়ের মধ্যে কোন অবস্থার প্রাধান্য? ত'হলে কি গৌরবিরহ অপেক্ষা তাঁর দেহবিলাসই বড় হয় না?

৫। ঈশানের আরও উদ্ভট কাহিনী সংগ্রহ—শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবনে ভ্রমণ ক'রেছেন, হঠাৎ শ্রীঅদ্বৈত পুত্র শ্রীঅচ্যুতের স্মরণ হোলো। অমনি পুষ্পক রথ পাঠিয়ে শ্রীঅচ্যুতকে আনালেন শ্রীবৃন্দাবনে—

আয় আয় বুলি গোরা কৈল আকর্ষণ।
যোগী সম তাহা আইলা সীতার নন্দন॥
শান্তিপুর হৈতে ব্রজ বহুদিনের পথ।
অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞায় পুষ্পরথে॥
(১৩ অঃ)

৬। আরও উদ্‌ভট কাহিনী—

শ্রীগৌরাঙ্গ কাশীতে শ্রীরূপকে ভক্তি শিক্ষা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সেখানে, আর সেই সঙ্গে হঠাৎ শ্রীঅচ্যুতেরও আবির্ভাব; লাগলো তর্ক, পরাজিত হ'লেন সন্ন্যাসী, প্রতিষ্ঠিত হোলো শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা (১৭ দশ অধ্যায়।

৭। আরও বিচিত্র কাহিনী।

ওঁর গ্রন্থের ১৫ অধ্যায়ে ব'লেছেন আমি শ্রীনিত্যানন্দের মুখ থেকে অনেক কাহিনী শুনেছি —

৮। ঈশানের মতে শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। শ্রীবৃন্দাবন দাস এবং বৈষ্ণব সমাজের উক্তি, শ্রীনিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য।

— ০ —

শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র লিখতে "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থও কম নয়। এর লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী অপর নাম ঘনশ্যাম। শ্রীবিশ্বনাথের, শিষ্য ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীভাগবতের টীকা লেখেন। অতএব ঘনশ্যাম সপ্তদশ শতাব্দীর পুরুষ।

নরহরি ব'লেছেন, আমার গ্রন্থের কাহিনী সংগ্রহ হ'য়েছে অজ্ঞাত কুল শীল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে। ঐ সব কাহিনী শুনেই (১১ দশ তরঙ্গে নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখেছেন—

এক সময় শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য (পানিহাটির) রঘুপতি উপাধ্যায় ও কয়েকজনের সঙ্গে, জাহ্নবী দেবী এবং তাঁর কাকা কৃষ্ণদাস সরখেল, বীরভূমের এক—চাকা গ্রামে গিয়েছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের জন্মভূমি দেখতে; তখন ওখানেই সাক্ষাৎ হয় শতবর্ষ বয়সের এক বৃদ্ধের। তাঁর মুখে শ্রীনিত্যানন্দের বাল্য জীবনের কাহিনী তাঁরা শোনেন। তিনি শুধু স্মরণ ক'রতে পেরেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের পিতার নামটি "হাড়ো পণ্ডিত"। আর তাঁর পূর্ব পুরুষের কোন নাম জানতেন না। তবে শ্রীনিতাইর মার নাম শ্রীপদ্মাবতী, এটাও স্মরণে এসেছিল। আর শুনেছেন শ্রীনিতাই বিবাহ ক'রেছেন। তবে কোথাকার মেয়ে, কি নাম কিছুই জানেন না।

এই ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের এই ধরণের উক্তিগুলি, কেন যে অপ্রামাণ্য, তার বিস্তৃত উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগে বিশদ ক'রে লিখেছি।

তাছাড়া এই ভক্তি রত্নাকরের লেখক ব'লেছেন, শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় ভুক্ত লক্ষ্মীপতির শিষ্য—

নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে শ্রীমৎলক্ষ্মীপতিপ্রিয়ম।
শ্রীমাধ্ব সম্প্রদানন্দবর্দ্ধনং ভক্ত বৎসলম্॥

ভক্তি রত্নাকরের লেখক আরও ব'লেছেন শ্রীনিত্যানন্দের কণ্ঠে সোনা দিয়ে বাঁধান গোবর্দ্ধন গিরির শিলা খণ্ড থাকতো। এটি তিনি পেয়েছিলেন তীর্থ ভ্রমণের সময় মথুরায় কোন ব্রাহ্মণের কাছে।

শ্রীনিত্যানন্দ কাহিনীর আরও একটি গ্রন্থ, নাম প্রেমবিলাস'। লেখক নিত্যানন্দ দাস। পূর্ব নাম বলরাম দাস তাঁর দীক্ষা গুরু শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী, আর শিক্ষাগুরু বীরভদ্র।

এঁদের আদেশেই প্রেমবিলাসের রচনা, মুখ্য বক্তব্য—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনী। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈতের জীবনকথা। আর, অন্যান্য ভক্তদের বংশ ও কুল পরিচয়। সবই কিন্তু তাঁর স্বপ্নভিত্তিক; অর্থাৎ যে সব স্বপ্ন দর্শন হোতো, সেই সব স্বপ্নের ঘটনাকেই অবলম্বন ক'রে বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ লিখেছেন। এ গ্রন্থ সমাপ্ত ক'রেছেন—

পনর শত বাইশ যখন, শকাব্দ আসিল।
ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল।
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস।
পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেম বিলাস॥

এ গ্রন্থটি ১৫২২ শকাব্দের। অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের লেখা, তা'হলে পরিষ্কার জানা গেল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আগেই এটি শেষ ক'রেছেন। কারণ, শ্রীচরিতামৃতটি ১৬১২ থেকে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হ'য়েছে। তা'হলে প্রেম বিলাসের বক্তব্যগুলি হয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ জানতেন না, কিংবা তিনি ইচ্ছা ক'রেই চেপে গিয়েছেন। তা'হলে প্রেমবিলাসকার কি ক'রে জানলেন শ্রীচরিতামৃত চুরি যাওয়ার সংবাদ পেয়ে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা ক'রলেন? এও কি ভবিষ্যতের স্বপ্নসম্ভূত কাহিনা থেকে আগত?

এক্ষেত্রে, গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ দাস অদ্ভুত রকমের একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন বুড়ো হ'য়েছি, কিভাবে কি বলি, তা সব সময় মাথায় আসে না। কোনটা আগের কোনটা পরের ঘটনা, তা ঠিক ঠিক মনে থাকে না।

বৃদ্ধ বয়সে লিখি ভুল অনুক্ষণ।
যে সময়ে যা মনে আসে, কৈনু লিখন॥
আগের কথা পাছে লিখি, পাছের কথা আগে।
ভাবিয়া লিখিনু গ্রন্থ, যাহা মনে জাগে।
এক কথাও বার বার, ক'রেছি লিখন
সব ঘটনা সব সময় না ছিল স্মরণ॥

(২) প্রেমবিলাসকার আরও ব'লেছেন—এ গ্রন্থটি লিখেছি শ্রীখণ্ডে (বর্ধমান জেলা) ১৮ বিলাস পর্যন্ত। খড়দহে ১৯-২০। আর ২১ থেকে ২৪ বিলাস লিখেছি কাটোয়ায় ব'সে।

(৩) শ্রীনিত্যানন্দ দাসই ব'লেছেন শ্রীনিত্যানন্দ ২৪ বৎসর বয়সে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রেছিলেন। এ সময়ের সমর্থক জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল কি?

(৪ প্রেমবিলাসের ৭ম অধ্যায়ে আছে 'শ্রীনিত্যানন্দের গৃহস্থ আশ্রমে দুটি নাম ছিল, অবধূত আর চিদানন্দ। শ্রীঅদ্বৈতই তাঁর নাম রাখেন "হাড়ো ওঝা"।

এসব কথা লেখকের বৃদ্ধ বয়সের স্বপ্নেরই কথা বলতে হবে তো?

(৫) প্রেমবিলাস কারের প্রদত্ত আর একটি সংবাদ "জাহ্নবী দেবীর আটটি পুত্র ছিল, অভিরাম গোস্বামী যাঁকেই প্রণাম ক'রতেন তিনিই মারা যেতেন, শেষে

একটি মাত্র পুত্র টিকে গেল, তাঁরই নাম বীরভদ্র ; আর একটি কন্যা ছিল, নাম গঙ্গা।
[১৯ বিলাস]

বর্তমান, গোস্বামী উপাধির দ্বারা চিহ্নিত এক পরিচয়ে রাঢ়ী ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট কুলের অভিমত হোলো, জাহ্নবী ছিলেন নিঃসন্তান, বসুধারই ওই দুই ছেলে মেয়ে। তাদেরই বংশে এই গোস্বামী।

অতএব এইসব গোলমেলে ব্যাপারটিকে, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাকার এমন ভাবে ব'লেছেন যে, বীরভদ্রের মা কে এবং তাঁর বাবা কে, সে পরিচয় জানা যায় নি, তখন ও পরিচয় না দেওয়াই ভাল। তাই দেন নাই। তবে এর লেখক কিন্তু কর্ণপুর নন।

এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৪৩২ নম্বরের পুঁথিতে বলা হ'য়েছে রামভদ্র আর বীরভদ্র ছিলেন বসুধার পুত্র।

তা'হলে বেশ স্পষ্ট যে, উজ্জ্বল নির্মল চরিত্র অবধূত পরমহংস শ্রীনিত্যানন্দের জীবনকে অদ্ভুত কাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে ঢাকতে বিবাহিত পুরুষে পরিবর্তিত করা হ'য়েছে বা হচ্ছে কাদের স্বার্থে ?

সমাজে অবশ্য জালিয়াত থাকবেই, কিন্তু জালিয়াতি ধরার ভারও তো সমাজকেই নিতে হয়।

(৬) প্রেম বিলাসের ১৯ বিলাসে আর একটি সংবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপ্রকটের (১৫৩৩) দুই বৎসর পরে, শ্রীনিত্যানন্দ এবং তার দুই বৎসর পরে শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর্ধান ঘটে।

বাঃ, শ্রীনিত্যানন্দের পিতৃত্ব বরণ তা হ'লে প্রতি বৎসরে চারটি বা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে ? বসুধা বা জাহ্নবী দেবীও তাহ'লে যমজ সন্তানের মা নন, একেবারে ত্রিজ, চতুর্জ বা পঞ্চজ সন্তানের মা ?

এসব আবোল তাবোল উক্তিরও কি সম্মান দিতে হবে ?

আর একখানি গ্রন্থ, নাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার, লেখক শ্রীবৃন্দাবন দাস ?

এ গ্রন্থের অন্যতম বক্তব্য, শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ ক'রেছিলেন। তাঁর সেই আদেশ শুনেই শ্রীনিত্যানন্দ ব'ল্লেন—

মোরে কহিতেছে পুনঃ সংসার করিতে ?
o o o o o
আপনাতে যতি ধর্ম করিলে স্বীকার ?
o o o o o
আজ্ঞাকারী দাস, আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
যখন যে আজ্ঞা হয়, তাহা শিরে ধরি॥

অবশেষে শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহই করলেন। তাঁর শিষ্য গৌরীদাস। তাঁর ভাই সূর্য্যদাস সরখেল। তাঁরই কন্যার সঙ্গে বিবাহ। কিন্তু অত বয়সে ? তাও আবার সন্ন্যাসী কয়ে ? তাই সূর্য্যদাস ইতস্তত ক'রলেন, এদিকে রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সরখেল

কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম ব'লছেন, শ্রীনিত্যানন্দ ও আমি বলরাম, উভয়ে অভিন্ন। তারপর স্বপ্ন দেখেই সরখেল কন্যা বসুধা, মূর্ছিতা। প্রাণ যায় যায়। গঙ্গাতীরে আনা হলো তাঁকে মৃতপ্রায় ভেবে। শ্রীনিত্যানন্দ এসে প্রাণ সঞ্চার করলেন তাঁর। এর পরই সূর্যদাস রাজী হ'লেন। কিন্তু নিতাই যে সন্ন্যাসী? শেষ পরামর্শ নিতাইর আবার উপনয়ন সংস্কার হোক, উনি ব্রাহ্মণ হয়ে যান। তাই হোলো। আর একটি কন্যা ছিল সরখেলের, নাম জাহ্নবা। তাঁকেও অর্পণ ক'রলেন সরখেল মশাই শ্রীনিতাইর হাতে। তারপর, যথা কালে এক মেয়ের গর্ভে বীরভদ্র আর এক মেয়ের গর্ভে গঙ্গার জন্ম হোলো। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখতে ভুলে গেলেন, না লিখলেন না কার গর্ভে কে?

এইসব বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি কি শ্রীবৃন্দাবন দাসের? তিনি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত লেখার সময় তো, শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রকে পরমহংস অবধূত ও অবিবাহিত বলেই চিহ্নিত ক'রেছেন।

অতএব মুক্ত কণ্ঠেই ব'লতে হয়—যে ভারতে এমন গ্রন্থের কাহিনীও যখন প্রামাণ্য হ'য়ে আছে যে, শ্রীবিষ্ণুর বুকে পদাঘাত ক'রে একটি বিশেষ জাতির অন্যতম মুখ্য পুরুষ ভৃগু তাঁর পরবর্ত্তি কালের বংশধরগণকে ভূসুর, ভূদেব ব'লে সমাজ পূজ্য করে গিয়েছেন, হৃদয় কাঁপেনি তা লিখতে, সেই ভারতের একটি প্রদেশ বাংলায়, অমন পরমহংস অবধূত যুগনেতা পতিত উদ্ধারে দয়ালু ঈশ্বরপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রে বিবাহ ঘটিত কলঙ্ক আরোপ করার কাহিনী লিখবে এতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গই ওঠে—শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের পরেও তাঁর জন্ম-ভূমিতে (বীরভূম একচাকা) কোনও বংশধর বাস ক'রলেন না! সামাজিক ব্যক্তি কি জন্মভূমির সমাজ ছাড়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈতের বেলায় তো এমন প্রশ্ন কেউ করে না? তাঁর বংশধরগণ তো শান্তিপুর পরিত্যাগ করেন নাই?

ওই জন্যই কি বীরভদ্রী থাকের বংশধরগণ—তৎকালের কুলীন সমাজে মাননীয় হন নাই?

তারপর, সেই বীরভদ্রী থাকের (বটব্যাল উপাধি অখ্যাত?) গোষ্ঠির বংশ-ধরগণ, খড়দহ, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, ঢাকা বুতনাউদ্ধরণপুর, সপ্তগ্রাম, মালদহ গয়েশপুর সোদপুর, কানাইডাঙ্গা, গোরাবাজার, মাড়ো, লতাদহ, নুপুর, বল্লভপুর, কোদলা মোক্তারপুর, আগরতলা ও যশোরেই বাস করেছিলেন বীরভূমে বীরভদ্র থাকের কেউ বাস করেন নাই। (এই বংশেরই পরে গোস্বামী উপাধি)

তারপর, অমন নড়বড়ে গ্রন্থ "প্রেম বিলাস" তার লেখকও বলতে পারেন নাই—শ্রীনিত্যানন্দ খড়দহে বাস ক'রে, ওখানে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ওঁকে স্পষ্টই ব'লতে হ'য়েছে, খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর প্রতিষ্ঠা করেছেন বীরভদ্র ওখানে ওঁর সেবকগণ শ্রীবীরভদ্রেরই বংশধর। এই বীরভদ্র শ্রীনিত্যানন্দের পতিত উন্নয়নের কাজে পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, কিন্তু কোন প্রমাণ বলেই পাওয়া যায় না। তিনি শ্রীনিত্যানন্দের আত্মজ, আর গঙ্গা নামে কোন কন্যাও ছিল না তাঁর। যেহেতু সুষ্ঠু প্রামাণ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা জানা যায় শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহই হয়নি। হ'লে

পারে না। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মনোজ্ঞ পুরুষ, পরম দয়ালু, এবং যুগবিবর্ত্তিত সমাজের দূরদ্রষ্টা, পরমহংস অবধূত।

এই যুগাদর্শ অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের পতিত উন্নয়নের কাজটি তৎকালে কোন উচ্চবর্ণের মানুষই সুনজরে দেখেন নাই। তাঁদেরই একটি গোষ্ঠিচক্র শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি কলঙ্ক আরোপ সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিকল্পনা মাফিক ক'রেছেন। তাঁরা যে তা ক'রতে পারেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করার পথ ধ'রেছিলেন, সে ইঙ্গিত শ্রীবৃন্দাবন দাস বহু আগেই পেয়েছিলেন।

যেদিন, শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচল থেকে, ফিরে এলেন বাংলায়, তারপর থেকেই তিনি ব্যাপকভাবে সমাজের অবহেলিত ব্যক্তিদিগকে উন্নীত করার কাজে সদলে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং সর্বত্র সফল প্রয়াস হ'তে লাগলেন—সেই কাজই হোলো তাঁর অনাচার।

সেই অনাচার দেখেই উচ্চ বর্ণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হোলো। এটি রোধ করার জন্য তাঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

তাঁরা পরামর্শ ক'রতে লাগলেন, আগে জানা দরকার শ্রীনিত্যানন্দের এই কাজের পিছনে শ্রীগৌরাঙ্গের সমর্থন আছে কি না। অর্থাৎ ছোট জাতকে মাথায় তোলার কাজই তাদের কাছে অনাচার।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই অনাচার-আচারের বিরুদ্ধে শ্রীনিত্যানন্দের অভিযান স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হ'চ্ছে তিনি তো সবদাই শূদ্রদের বাড়িতে অবস্থান ক'রছেন শূদ্ররা ক্রমেই উচ্চ বর্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে। শ্রীনিত্যানন্দ নিজেও শূদ্রের আচার গ্রহণ ক'রছেন, কখনও দেখি হাতে লৌহ দণ্ড, কখনও দেখি গৃহীর বেশ ধারণ ক'রে প্রতিটি শূদ্রকে শেখাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আমাদের প্রভু ঈশ্বর।

উচ্চ বর্ণের মধ্যে এমনি আলোচনা গভীর হওয়ার জন্যই, কোনো ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে ঐ অভিযোগ তুলে শ্রীগৌরাঙ্গের কি অভিমত তা জানতে চাইলেন। এমন ব্যক্তিটি গেলেন যিনি বহু পূর্ব্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের—

হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র।
সর্ব্ব দাস সঙ্গে করেন কীর্ত্তন আনন্দ॥
অকৈতব রূপে সর্ব্ব জগতের প্রতি।
লওয়ান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥
সঙ্গে পারিষদগণ পরম উদ্দাম।
সব নবদ্বীপে ভ্রমি মহা জ্যোতির্ধাম॥
o o o
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তার পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
o o o

চৈতন্য চন্দ্রেতে তান বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী সেই ব্রাহ্মণ নীলাচলে গিয়েও শ্রীগৌরাঙ্গকে তেমন নিরিবিলি পেলেন না। কয়েক দিনই যাতায়াত ক'রতে ক'রতে একদিন সুযোগ পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার। সেই দিনই তিনি অভিযোগটি তুললেন তার কাছে—

দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বোলে, প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥

ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হ'য়েই গিয়েছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির ফিরিস্তি নিয়ে। উনি বল্লেন—শুনেছি নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী এবং অবধূত; কিন্তু তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমের আচার তো দেখতে পাচ্ছি না। আপনার কাছ থেকে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে গিয়েই ও'র ধরণ ধারণ বদলে গিয়েছে।

নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু তো না বুঝোঁ মুই করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তাঁর বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥

শুনেছি, সন্ন্যাসী কখনও ধাতু দ্রব্যের স্পর্শ করেন না, কিন্তু নিত্যানন্দের আচরণে দেখছি, তিনি এখন অনেক অলংকার ব্যবহার ক'রছেন, উৎকৃষ্ট বেশও ধারণ ক'রছেন, সন্ন্যাসীর বংশদণ্ড ছেড়ে লৌহদণ্ড ব্যবহার ক'রছেন, তা ছাড়া দেখছি, তিনি সর্ব্বদাই শূদ্রদের সঙ্গে মেলামেশা এবং তাদের বাড়িতে অবস্থান এবং আহার সবই ক'রছেন—

দণ্ড ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে কেন থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥

এসব দেখে শুনেও, আমরা প্রতিবাদ করতে পারি নাই। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে, শাস্ত্র সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্মণ্য আচার ও সন্ন্যাসীর আচার ব্যবহারের মিল দেখি না; এক্ষেত্রে আপনিই ব'লতে পারেন এসবের উদ্দেশ্য কি?

কি মর্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে?

শ্রীগৌরাঙ্গ সহজেই বুঝলেন এঁর আসল বক্তব্য কি? যে কারণে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে এসেছেন সেটি আবার প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে অন্য ভাবে দেখা দিয়েছে শ্রীনিত্যানন্দের আচরণে। কিন্তু তাঁকে তো এঁদের প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি পরমহংস অবধূত। তাঁর পার্ষদ ও সমর্থকের দলও এখন সংখ্যায় গরিষ্ঠ। অতএব নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু ক'রতে গেলেই, অবহেলিতের দল যদি তখন উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তবে উচ্চ বর্ণের পক্ষে তো তাই হবে গুরুতর সমস্যা, তাই তাঁদের কাছেও শ্রীনিত্যানন্দকেই যদি নবদ্বীপের মানুষের কাছে হেয় চরিত্রের লোক বলে প্রতিপন্ন করা যায়—তা হ'লে সেই হবে সুগম পথ।

শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার বুঝলেন অভিযোগের ব্যাপারটি। তাই সেই ব্রাহ্মণের কথা শুনেই হেসে ফেললেন। পরে ব'ল্লেন—দেখুন! শ্রীনিত্যানন্দ অবুঝ ব্যক্তি নন। বিশেষ কোন কারণেই ওঁর এই ধরণের আচরণ। উনি মহান দয়ালু পুরুষ, ওঁর দোষ গুণের বিচার করা যায় না—

শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
হাসিয়া, বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর।
শুন বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান্ গুণ দোষ কিছু না জন্মায়॥

তাছাড়া, নিত্যানন্দের চরিত্র এত নির্ম্মল যে তাঁতে কোনরূপ দোষ কালুষ্যের স্পর্শই ঘটে না, আমি তাঁকে ভাল ক'রেই জানি। পদ্মপত্রে কি জল দাঁড়ায়?

পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল॥

আপনি আমার কাছে পরিষ্কার শুনলেন, শ্রীনিত্যানন্দের সবকিছুই অলৌকিক। লোক বুদ্ধির দ্বারা তাঁর চরিত্র ব্যাখ্যা ক'রতে যাবেন না, পারবেন না। তাঁর জীবনই হ'লো পতিত অবহেলিতদের প্রতি ঔদার্য প্রকাশ। তাদিকে আপন ক'রে নিতে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কি ভাবে আপন করতে হয়, তা তিনি জানেন, আপনি নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে, এসব কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন—

চল বিপ্র তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা গিয়া তুমি সবারে বুঝাও॥

হ্যাঁ, আরও কথা, নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাবে, তাঁতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জানানো মানেই, সেটি আমাকেই জানান।

তাঁহারে যে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য বিপ্র! এই কহিল তোমারে॥

এর পরই, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রের এমন এক নিদর্শন তুলে ধ'রলেন এবং এমন আদর্শ সঞ্চারের বাণী ঘোষণা ক'রলেন, যা একদিন তাঁর অতি প্রিয়পার্ষদ শ্রীবাসকেও ঠিক এমনি প্রশ্ন ক'রে, শাসন বাণীর সঙ্গে ব'লেছিলেন এই নীলাচলে বসেই, সেদিন, বাংলা থেকে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীবাসকে প্রশ্ন ক'রেছিলেন, "ওহে শ্রীবাস! বলতো? তোমার মনে আমার অদ্বৈতকে কেমন লাগে? প্রশ্ন শুনেই শ্রীবাসতো উল্লাসের সঙ্গেই ব'লেছিলেন—শ্রীঅদ্বৈত আর প্রহ্লাদ যেন অভিন্ন। এবার সেই প্রহ্লাদই আবার অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত—

মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়।

শ্রীবাসের মুখে এইভাবে শ্রীপ্রহ্লাদের সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈতের একই উপমা শুনেই হঠাৎ ক্রুদ্ধ হ'য়েই যেন শ্রীবাসের গালে একটি চড় ক'সে দিয়ে ব'ল্লেন, "ছিঃ শ্রীবাস শ্রীঅদ্বৈতকে তুমি এইভাবে একজন কোন প্রসিদ্ধ ভক্তের সঙ্গে মাত্র তুলনা ক'রলে?"

অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ শুক যেন ?
শুনি কভু ক্রোধে শ্রীবাসে মারিলেন ॥

এ যেন পুত্রের ত্রুটিতে পিতার শাসন।

পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
সেই মত এক চড় দিলেন শ্রীবাসেরে ॥

এই আচরণের দ্বারা সেদিন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বুঝিয়েছিলেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্য স্থাপনের মধ্যে, শ্রীঅদ্বৈতের দান যে কতখানি, সেটি অনুধাবন না করে, শুধুমাত্র প্রসিদ্ধ কোন ভক্তের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা খুবই অসমীচীন, যিনি আমার সমস্ত কাজেরই প্রথম উদ্‌ঘোষক সে তো ওই সীতানাথ।

এই অর্থ উপলব্ধি ক'রেই সেদিন শ্রীবাস নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এই ভুলের জন্য নীরবে অনুতপ্ত হ'য়েছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে পরিষ্কার করে বলেছিলেন শোন শ্রীবাস, শোন ভক্তবৃন্দ! যদি চোখেও দেখি কিংবা কানেও শুনি সীতানাথ কখনও মদিরা পান ক'রছেন, অথবা অসামাজিক ভাবে রমণীতে আসক্ত হ'য়েছেন, তবুও জানি অদ্বৈতের চরিত্র পবিত্র এবং নিঃসন্দিগ্ধ—

মদিরা যবনী যদি ধরয়ে অদ্বৈতে।
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিনু তোমারে আমি সত্য করি অতি।

চৈঃ ভা। অন্ত ১০ অঃ

এমনি ভাবেই আবার তেমনি পরিস্থিতির উদ্ভব দেখে, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই নবদ্বীপ-বাসী সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে শুনিয়ে ব'ল্লেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় সান্নিধ্যের প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণের মন বহু আগেই পরিবর্তিত হয়েছিল, তবুও তিনি ভাল ক'রেই বুঝে নিলেন যে শ্রীনিত্যানন্দের আরব্ধ কাজটি শ্রীগৌরাঙ্গেরই অভিপ্রেত।

— o —

এই সন্দর্ভটির সমাপনের সঙ্গে এইটুকু স্পষ্ট প্রতীয়মান করা যায় যে, শ্রীনিত্যানন্দের প্রবর্তিত পতিত উন্নয়নের যে ধারাটি বাংলার গ্রামে, নগরে গৃহে প্রান্তরে আরব্ধ হয়েছিল সেইটিই বাংলায় অভিনব বৈষ্ণবতা বাদের মাধ্যমে মানবতাবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্বেই পরমাচার্য শ্রীরামানুজ, আর তার পরে মধ্বতীর্থ প্রভৃতির বৈষ্ণব মতবাদের পুনরুত্থান ঘ'টলেও, তাঁদের কাজে অহিন্দু শাসকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল না অথবা হিন্দুর নিজস্ব জাতীয়তা বাদে কোন অহিন্দু তার নিজ মতের আগ্রাসী চিন্তাধারাকে জোর ক'রে প্রবেশ করান নাই, এবং গুপ্ত বৌদ্ধ সহজিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হিন্দুদের সমাজকে রক্ষা করারও প্রয়োজন ঘটেনি।

শ্রীরামানুজ ও মধ্বতীর্থ উভয়েই ভারতীয় হিন্দু সমাজে সর্বাগ্রণ্য নমস্য আচার্য, উভয়েই ভারতের সনাতন ধর্মের সর্বজয়ী সংরক্ষক, কিন্তু তাঁদের মতে সেই সুপ্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের জয়গানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের এবং নানা জাতির ও নারী দ্বারা বেদাভ্যাস ও প্রতিমা পূজায় অনধিকারই স্বীকৃত হয়েছিল, অর্থাৎ পূর্বানুসৃত রীতিকেই তাঁরা পুনঃস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

তারপর, সেই সম্প্রদায়েরই অন্যতম মহান আচার্য শ্রীরামানন্দ ভারতের পূর্বপ্রচলিত হিন্দু সমাজের ক্রম পরিণতির অবস্থা লক্ষ্য ক'রে তাঁর গুরু বর্গের পরিচিন্তাকে আরও উদার আরও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের দ্বারা ভারতের হিন্দুসমাজের নূতন মূল্যায়ন ক'রে, মানবতাবাদেরই আদিরূপ যে বৈষ্ণবতাবাদ বা সাত্বত ভাগবতবাদ এইটিকেই উত্তর ভারতে প্রচার করেন।

এক কথায়, শ্রীরামানন্দের বৈষ্ণবতাবাদের প্রচার, ভারতে ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কারের আন্দোলন।

এদিকে পূর্বভারতের বাংলাতেও, হিন্দুসমাজের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা নদীর মোহনার মুখে ভূমি ক্ষয়ের মতই, সেটিকে প্রবল সাহসের সঙ্গে রোধ করার কাজে, শ্রীনিত্যানন্দের দানও ঐতিহাসিক। তাঁর আরব্ধ কাজের মূল রহস্যই ছিল অবহেলিত মানুষের দলকে সমাজে উন্নীত করা। তেমনি উন্নয়নের সরল পথই তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন। এ কাজের সূচনা শ্রীঅদ্বৈতের, এ কাজের উদ্বোধন শ্রীগৌরাঙ্গের, আর এ কাজের পূর্ণ রূপদান শ্রীনিত্যানন্দের।

এই ত্রিমূর্তির কাজের বৈশিষ্ট্য—১। যে কোন জাতির পুরুষ বা রমণী যে কোনও ভগবৎ বিগ্রহের পূজা অর্চনা অবশ্যই ক'রতে পারে

২। যে কোন জাতির মানুষ তার জীবিকার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত জাতির জীবিকা-বৃত্তিই গ্রহণ ক'রতে পারে।

৩। আর যে হেতু সর্বত্র সকলের সমান অধিকার, সেই হেতু সকলেই সর্বত্র বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'রতে পারে।

অতএব মনে করা যায় সেই যে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর প্রাণপ্রিয় শ্রীনিত্যানন্দকে উদ্দীপনা জাগিয়ে ব'লেছিলেন—

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে।
দরিদ্র, পতিত, মূর্খ ভাসাব প্রেম সুখে॥

সে বাণীর অন্তঃশক্তি আজও ভারতের তথা বাংলার প্রতিটি মানব মানবীর হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে র'য়েছে এবং সেই বাণীই আজও সবাইকে উদ্দীপিত ক'রে চ'লেছে—।

তেমনি উদ্দীপনার স্বরই ভারতবাসী প্রতিটির কণ্ঠে আজও বেজে চ'লেছে—
কোথাও ব্যক্তি কেন্দ্রিক হ'য়ে, আর কোথাও বা সংঘকেন্দ্রিক হ'য়ে।

এই বিংশ শতাব্দীতে তেমনি এক মহান পুরুষের আক্ষিপ্ত বেদনার্ত কণ্ঠেও শুনতে পাই তো—

আরে আমার নিতাইরে—

ও পতিতের বন্ধু।
হা নিতাই ! কোথায় তুমি !
এই তো তোমার বিহার ভূমি,
আমরা, দুঃখের কথা কারে বা জানাব—
তখন জনম দাওনাই মোদের
যখন প্রকট লীলায় বিহরিলে, দেখিতে তো পাইনাই
মোরা।
আজ, আশা পথ চেয়ে ব'সে আছি—
শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়েছেন তোমাকেই ভার
গৌর প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্ণ ক'রবে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে।
দরিদ্র, পতিত, মূর্খ, ভাসাব প্রেমসুখে।
হা নিতাই প্রভু নিতাই। সেদিনের আর ক'দিন বাকী ?
তোমার কাজ তো পূর্ণ হয় নাই—
আজও পতিত কাঁদে ঘরে ঘরে, তোমাকেই তো দিয়েছেন
ভার
এস আমার প্রভু নিতাই—
অভিরাম গৌরীদাস সঙ্গে ক'রে তেমনি ক'রে আবার এস।
গৌর নাম প্রেমে জগৎ মাতাও—পতিতেরে বুকে জড়ায়ে—
তেমনি ক'রে আবার এস,
তেমনি ক'রে আবার বল—
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ॥

বিংশ শতাব্দীর ভারতের বরেণ্য পুরুষ, নাম সংকীর্ত্তনের নবউদ্গাতা বৈষ্ণব গুরু শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন থেকে—

—০—

শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ ও চরিত্রের সম্পুট

ঔদার্য্যেণ সুকাম ধেনুদিবিষদ্ বৃক্ষেন্দু চিন্তামণি—
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্প বৃন্দং প্রভুম্।
বাৎসল্যেন সুমাতৃ ধেনুনিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনাংনন্দিনং
নিত্যানন্দগুরুং নমামি সততং প্রেমাব্ধি সংবর্দ্ধনম্।
(প্রাচীন উদ্ধৃতি)

এ সন্দর্ভের ভূমি পরীক্ষায় যাঁরা অগ্রণী

সুখ্যাত সাহিত্যিক, সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, যুগান্তর পত্রিকার প্রবাণ প্রধান—
সংবাদ সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

[৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৮, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২]

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—রচয়িতা : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর।

বাঙলায় পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সময়টি অতিক্রান্ত হ'য়েছে, সে সময়টিতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও তাঁদের পরিকর বৃন্দের অবদান শুধু বাঙলায় তথা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে তা নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের সংস্কৃতি সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় প্রাচীন এবং নবীন সংস্কৃতির সাযুজ্যে বিকশিত বৈষ্ণব সংস্কৃতি। এই অনন্যসাধারণ সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের কৃতিত্ব বাঙালী জাতির।

পরম ভাগবত দার্শনিক ও মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের অমূল্য অবদান শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য। আলোচ্যগ্রন্থে বৃন্দাবনে ষড়্‌গোস্বামীর অনুভূত ও আহৃত তথ্যের সমন্বয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দের জীবনচর্যার সঙ্গে তত্ত্ববাদের সমন্বয় দেখানো হয়েছে। তত্ত্ববাদের একটি স্বতন্ত্র দিকও এখানে প্রতিভাত। এটি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সহচর শ্রীস্বরূপ দামোদরের একখানি কড়চা থেকে গৃহীত। কিন্তু সেই কড়চাটি অদ্যাবধি কেউ দেখেন নি এবং সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোন গোস্বামী এবং কোন গ্রন্থকারের বক্তব্যের সংগেও মিল নেই। যার সঙ্গে একমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেটি বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীদের। কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেই বলেছেন— "স্বরূপ গোস্বামীর মত, রূপ রঘুনাথ জানে তত্ত্ব—তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।" সেই জন্যই সন্দেহ প্রখর হয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালিয়ে ওই তত্ত্ববাদ সমন্বিত মতবাদটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

গ্রন্থকার সহজ সরল ভাষায় কবিরাজ গোস্বামী ও চৈতন্য চরিতামৃতকে একালের পাঠকদের সামনে তুলে ধ'রেছেন। পরিশেষে ব'লতে হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি বিদ্বৎ সমাজের উৎসাহী গোষ্ঠীর বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির গবেষণার উপাদান দান ক'রেছে প্রচুর।'

—দক্ষিণারঞ্জন বসু

Prof BASANTI CHOWDHURI, Masterpara
M. A. B. T, D. Phil (Gita Bharati), D. Litt, P.o Konnagar
Vice Principal, Girls' College, Howrah, Dist : Hooghly
[B. T, Dept,]

Lecturer :
Rabindra Bharati University, (Post Graduate Dept,)
Institute of Education for Women, Hastings House, (Alipore)

মান্যবরেষু—

আপনার রচিত "শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থটি যত্ন করিয়া আদ্যন্ত পড়িয়াছি। ক্রমশঃ আগ্রহী হইয়া একদিনেই বই শেষ করিয়াছি। "যার যেই ভাব তার সেই সর্বোত্তম" আপনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া যাহা দেখিতে ও দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন যে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় আপনাকে এ গ্রন্থ লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি আমারও শিক্ষাগুরুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মধ্যেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ও কৃষ্ণপ্রেমী বৈষ্ণবজনোচিত দৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। আপনি বাবাজী মহাশয়ের কৃপাধন্য। ইতিহাসের দ্বারা আপনার সেই বৈষ্ণব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে, ইহাই প্রার্থনা করি।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—
বাসন্তী চৌধুরী

— o —

The University of Burdwan
Gopalbag, Burdwan
Dated—28-2-72

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাতে বিদ্বান লেখক যে রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব। বৌদ্ধ রীতিনীতি ও আচারের সহিত বৈষ্ণব সপ্রদায়ের রীতিনীতি আচারের তুলনামূলক অধ্যয়নের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে লেখক উপনীত হইয়াছেন তাহাতে মনে হয়, শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি সৌত্রান্তিক যোগাচারের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। ইহা তিনি প্রকারান্তরে স্বীকারও করিয়াছেন। নিজে আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্মশিক্ষা দান, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণাবলীকে ধর্মরূপে স্বীকার করা বৌদ্ধদেরেই অনুকৃতি মাত্র। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ও গদাধর এই পাঁচটি তত্ত্বই বুদ্ধের পাঁচটি অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রণয়-লীলাও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত।

এমন কি শ্রীমদ্‌ভাগবৎ—যাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রমাণ শিরোমণি

সেই গ্রন্থটিও বুদ্ধ মৌর্য্য প্রভৃতির ঢের পরবর্তী, সুতরাং ব্যাসদেব প্রণীত না হওয়ায় প্রমাণরূপেই স্বীকৃত হইতে পারে না।

যদ্যপি সরল বিশ্বাসী বৈষ্ণবগণ উপরিউক্ত মতবাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তথাপি লেখক যে নিরপেক্ষ ভাবে স্বীয় মতবাদ প্রদর্শন করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অশেষ ধন্যবাদ যোগ্য। আমি লেখকের নিরপেক্ষ বিচারে মুগ্ধ হইয়াছি। কারণ আমি স্বীকার করি যে, কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ লইয়া কখনও তাত্ত্বিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না।

শ্রীঅযোধ্যানাথ শাস্ত্রী।

G, C, Chatterjee,
M, A, (Econ, --Psycho), L, L, B
F, R, E, S (London)
Advocate, West Bengal
Tax Consultant
Director—Professor
Mind-Cure Institute.

Chamber:
18, Bindu Palit Lane,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রীর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সমালোচনা গ্রন্থখানি অতুলনীয়। যে সমাজে একদেশদর্শিতা, দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতাই সাধারণ রীতি, সেই একম পরিবেশে এই রকম নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ও সংস্কারমুক্ত সমালোচনার বৈজ্ঞানিক মূল্য অপরিসীম।

ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যে বহুবিধ সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন নানাবিধ মানবগোষ্ঠির সংমিশ্রণ, সংস্কৃতির মধ্যেও ঠিক তাই। বৈদিক যুগের পর জৈন বৌদ্ধযুগ। স্বয়ং বুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতির কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞ অস্বীকার করিলেও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্য হইতে অনেক কিছুই আহরণ করিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের শেষে শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত সমাজের মধ্যে যে বর্ণবিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল তিনি তাহার বিরুদ্ধে এক নতুন সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার দেহত্যাগের পর, ক্রমশঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে বৌদ্ধদের মধ্যেও নানাবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। হীনযানী, মহাযানী বা বজ্রযানী আবার মাধ্যমিক, বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক ও যোগাচারী। বলা বাহুল্য ভগবান বুদ্ধের মূলপথ হইতে বিভিন্ন মার্গাভিমুখী হইয়া সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এইসকল সম্প্রদায়েরর উৎপত্তি। আজকের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিও মূলতঃ বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি হইতে বহুযুগের বহুবিধ সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। বল্লালীযুগের বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম ও সংস্কৃতিটি আবার লক্ষ্মণ সেনের সংস্কারের মাধ্যমে অংশিকভাবে বিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃ কৌলীন্যতার ও উচ্চনীচ ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া সমাজের মধ্যে ভয়াবহ অবক্ষয় আনয়ন করিয়াছিল। আর মূর্তিবাদ, গুরুবাদ, রহস্যবাদ, মন্ত্রবাদ ইত্যাদি বাদ বিসম্বাদ হিন্দুসমাজে চিরন্তন সংস্কার

হিসাবে পরিগণিত হইল। বৈদিক হিন্দুসংস্কৃতিও নবরূপে রূপায়িত হইল। কোন বৈদিক ঋষি এযুগে আবির্ভূত হইলে এই সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি বলিয়া চিনিতেই পারিবেন না।

এইরূপ ভেদাভেদে আচ্ছন্ন সমাজে পুরাতন ভাগবত ধর্মের প্রলেপ পড়িল শ্রীচৈতন্য-দেবেরবিরাট ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী বল্লালীযুগের এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহাই স্বাভাবিক, তাই তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবধারার ছড়াছড়ি। প্রতিভাবান ও বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবে বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে বৈষ্ণব বা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ বা সম্মিলন ঘটিয়াছিল তাহা নিখুঁতভাবে ও অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন, তবে আর একটা দিকও আছে, সেটি হিন্দুধর্মের ও সংস্কৃতির যে পরকীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করার এই যে ক্ষমতা তাহা হিন্দুধর্মের গতিশীলতা ও জীবনীশক্তির প্রমাণ। তাই আজ হিন্দু সংস্কৃতি বৈদিক সংস্কৃতির গঙ্গোত্রী হইতে বিরাট ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া বহু সংস্কৃতির সমন্বয়রূপে বিরাট গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়া মানব সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—শ্রীগৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়

SATENDRANATH GHOSE, (M. L. A.)
M. A. (Double) B. T.
Head Master

Baxarah High School
(Multi purpose)

Address
Vill—Jigacha
P. O. Santragachi
Howrah.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' পুস্তকটি পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় একজন সুপণ্ডিত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ।

কবিরাজ গোস্বামী মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন বিস্ময়কর স্রষ্টা এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তাঁর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থের মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব সাধনার ধারা এবং বাংলার তৎকালীন জনমানস বিধৃত। এই সুবিখ্যাত পুস্তকটির আলোচনা করিতে হইলে কিরূপ পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার প্রয়োজন তাহা সাহিত্য রসিক মাত্রই অবগত আছেন। ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষেই এইরূপ আলোচনা ও নির্ভীক মতামত দেওয়া সম্ভব। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তব্য ও অভিমত ইতিহাস দর্শন কাব্য প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সিদ্ধান্তের সত্যতা ঐতিহাসিক ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশারদ পণ্ডিতেরা বিচার করিবেন। সে বিচার

আমাদের নহে। আমার বক্তব্য এই পুস্তক নূতন চিন্তার এক সুদূর প্রসারী যবনিকা উন্মোচন করিয়াছে। পুস্তকটি পণ্ডিত সমাজ ও গবেষক ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং বৈষ্ণব সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বিনীত—

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

University Teacher's Quarter's
Terabag A/S
P. O. & Dist. Burdwan

SIDDHESWAR CHATTOPADHAYA
M. A. D. Phil, Kavyatirtha, Ishan Scholar
Reader in Sanskrit, The University of Burdwan.
Secretary (Hony.), Sanskrit Sahitya Parishad, Calcutta.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বিলম্বের জন্য ত্রুটি স্বীকার ক'রে প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম অভিমত যা হয় দু একদিনেই দিতে পারব। আরও ভেবেছিলাম পান সে ভক্তিরসে জ্যাব-জেবে একটা কিছু হবে, অর্থাৎ এ ধরণের গ্রন্থে যা হ'য়ে থাকে আর কি! তারপর এক পৃষ্ঠা প'ড়েই নিজের ভুল ধারণার জন্য লজ্জিত হ'য়ে পড়ি। শেষ ক'রতে সময় লাগলো। হাতে তখন নানা কাজ। একটানা না প'ড়লে মর্মোদ্ধার করা যাবে না। নিজের ভুলধারণার অকপট স্বীকৃতি অপরাধ ক্ষালণের জন্য।

প্রথমেই ব'লব—কোন বৈষ্ণব গ্রন্থের উপর এ ধরণের ইতিহাস নির্ভর আলোচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল, পৃথিবীতে যে কোন কিছুই হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না, সে ধর্মমতই হোক বা কবি-কৃতিই হোক, এ কথাটা সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী যঁারা তাঁরা মেনে চলেন না বড় একটা। আপনার গ্রন্থ তার প্রতিবাদ, এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন মহাপণ্ডিত, সাধক ও কবি, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও কেবলমাত্র আখ্যান গ্রন্থ নয়, তত্ত্বগ্রন্থ এটি এবং উদ্ধৃতি বিচার বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। এই পণ্ডিত সাধকের কবিমানস গঠনের উপাদানগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করা হ'য়েছে আপনার গ্রন্থে। যে ধ্রুব বিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি চৈতন্য চরিতামৃতের মত গ্রন্থের প্রেরণা জাগিয়েছিল তার মূল অতীতের কত গভীরে নিহিত তাও আপনি উদঘাটিত ক'রেছেন; এবং সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও ক'রেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক কালের সমাজ পরিবেশকেও দ্বিধাহীনভাবে ব'লতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নিকট ঐতিহাসিক বিচার-বুদ্ধি অপ্রত্যাশিত এবং অনেক কিছুই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ ক'রেছিলেন। আপনার গ্রন্থে কোথাও সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস যুক্তির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি, এইটাই আমাকে মুগ্ধ

ক'রেছে। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা কবি কর্ণপূরের রচনাই নয় এবং ১৫-১৬ শতকের বৈষ্ণব সন্তগণের চিন্তা ধারায় বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া মতের প্রভাব আছে, এই ধরণের বিতর্কিত তথ্যগুলি যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে আপনিই উপস্থাপিত ক'রতে পেরেছেন। ইতঃ পূর্বে এ-ধরনের কোন আলোচনা হ'য়েছে বলে আমি জানি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বহু তথ্য সমৃদ্ধ বিপুলায়তন দু' চারখানা গবেষণা গ্রন্থ রচিত হবার উপাদান এবং পথ নির্দেশ এ গ্রন্থে র'য়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রতিপাদ্যের আরও বিস্তৃত আলোচনা হ'তে পারে, প্রাক্-আর্য মাতৃতান্ত্রিক ভাবনা ভারতে নবাগত বৈদিক ভাবনাকে এমনিভাবেই প্রভাবিত করেছিল, যেটি কাল-ক্রমে তার বিশিষ্ট রূপটিই চাপা পড়ে যায় এবং দেখা দেয় পৌরাণিক-তান্ত্রিক বিশ্বাস। এরও মূলে র'য়েছে অনগ্রসর কৃষি নির্ভর সমাজের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। ফলে বৈদিকোত্তর কালে উদ্ভূত বৌদ্ধমতাদর্শও সে প্রভাব অতিক্রম ক'রতে পারে নাই এবং কালে সেও স্বরূপ-ভ্রষ্ট হ'য়েছে। মধ্য যুগে, পূর্বভারতে বিশেষ্ ক'রে বিশুদ্ধ বৈদিক বা বৌদ্ধমতের কোন অস্তিত্বই ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্থবির, বৌদ্ধধর্ম স্বরূপভ্রষ্ট, মুসল-মান আক্রমণের যুগে এই ছিল দুটি প্রধান ধর্মমতের অবস্থা। সমাজে চারিত্রিক দৃঢ়তার কোন বালাই ছিল না। অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ বখত ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ ক'রেছেন, আর আপনিই দেখিয়েছেন সেন রাজারাও তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার অনুসরণ ক'রতেন, বখতিয়ারের গুপ্তচর শ্রমণরাও প্রায় সেই আচারই মানতেন। হলায়ুধকে আপনি যে শ্রদ্ধাটুকু দেখিয়ে-ছেন শেখ শুভোদয়ার ব্যক্তবাকে সাক্ষ্য মানতে হ'লে তিনি তারও উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। জালাল-উদ্দীন তাব্রিজের বিশেষ পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছিলেন এই হলায়ুধ মিশ্রই। মেলবন্ধনে কৌলিন্য হয়ত টিকেছিল। কিন্তু দেবীবর বা পঞ্চাননই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে বিশুদ্ধ রাখার সামগ্রিক প্রচেষ্টা করেন নি, করা হয়তো তাঁর সম্ভবও ছিল না। দেশ তান্ত্রিক আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছিল, জাতিকুল মান নিয়ে সমাজে যেটা ছিল, সেটার নাম অন্তবিরোধ ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় দেখা যায় না।

একটা অদ্ভুত তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ মতের জগাখিচুড়ি গোটা সমাজদেহকে শক্তিহীন ক'রে ফেলে ছিল। আপনার গ্রন্থে উত্থাপিত এই জাতীয় বহু সমস্যারই বিস্তৃত আলো-চনার অবকাশ র'য়ে গিয়েছে। কোন তরুণ গবেষক যদি এই সূত্রধ'রে অগ্রসর হন, তবে মধ্যযুগের বাংলা ইতিহাসের এই একটা দিক আলোকিত হ'তে পারে।

আপনার গ্রন্থে সেই সম্ভাবনার প্রচুর বীজ নিহিত আছে। ব্যক্তিগত ভাবে গ্রন্থ-খানা পড়ে আমি বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি। আপনি অপূর্ব রচনা ভংগীতে, অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে বাংলায় প্রকাশ করার দক্ষতা দেখিয়েছেন, পরিশেষে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি নিবেদন ইতি—

বিনীত—

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা সাহিত্যিক নির্ভীক সমালোচক ও 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রিকার
প্রবীণ সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

৬১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লেখক—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের জীবন কেন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ। উভয় পুরুষই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার দুর্যোগ-ঝটিকা ক্ষুব্ধ সমাজ জীবনে মহা জ্যোতিষ্কের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন। উভয়ের জীবন ধারাকে আদর্শ ক'রে তৎকালের বাংলার মাননীয় সামাজিক ব্যক্তিরা যে মহনীয় ধর্মের আদর্শ প্রস্তুত ক'রেছিলেন, সেই আদর্শ-বাদের তথ্য সম্ভার নিয়েই সমগ্র ভারতের প্রাচীন ধর্ম থেকে একটি স্বতন্ত্র ধরণের উদার মানবতা পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম গঠন করেছিলেন। সেই বৈষ্ণব ধর্মটিকে দার্শনিকতায় শ্রীজীব গোস্বামী, ভক্তি সাহিত্যে শ্রীরূপ গোস্বামী, বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্রে এবং উপাসনায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি তীক্ষ্ম মেধাবী সিদ্ধ সাধকের দল এক অপরূপ ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ক'রে ভারতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন।

এঁদের সম্মুখে ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রথম, মধ্যম ও চরম জীবনের দ্রষ্টা ও বক্তা শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকর্ণপূর, শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভৃতির রচনা। সকলেই ছিলেন সেই পুরুষ যুগলের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সকলেই প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের আচার্যবৃন্দের প্রচারিত ত্যাগ ও মহিমাময় জীবনকে অনুধ্যান ক'রে সামাজিক মানব জীবনে তা রূপায়িত ক'রে-ছেন। এঁদের অব্যবহিত পরবর্তি কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তিনি তাঁর অমর লেখনী দ্বারা শ্রীচৈতন্যের জীবন ধারাকে আরও এক অত্যু-জ্জ্বল লাবণ্যধারায় মণ্ডিত ক'রে নূতন একটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যকে অঙ্কিত ক'রে গিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তটি তত্ত্ববাদ ও লীলাবাদের সমন্বয়।

কবিরাজ গোস্বামীর এই সমন্বয়বাদের সিদ্ধান্তটির পটভূমিকায় তিনি ব'লেছেন এটি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসহচর শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর একটি কড়চা থেকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেই কড়চাটি অদ্যাবধি কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি এবং ঐ কড়চায় সিদ্ধান্তবাদটি কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ববর্তি ষড়্গোস্বামীর সিদ্ধান্তের সঙ্গেও মিল হয় না। এই বিসদৃশ ও গরমিল মতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়া বাদের প্রবর্তিত ধর্ম এবং তাঁদের পঞ্চ তাত্ত্বিক উপাসনা ব'লে যেটি প্রতিষ্ঠিত, যা তাঁদের লীলাবাদ, সেইটির সঙ্গেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর প্রবর্তিত রচনায় হুবহু মিল দেখা যায়, তাছাড়া তাঁর সেই তত্ত্ব ও লীলার সমন্বয় বাদের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায় যে যে ক্ষেত্রে, সেই গুলিই নিপুণ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপিত ক'রেছেন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয়। অপর পক্ষে বলা যায় বাংলায় প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের পঞ্চতাত্ত্বিক উপাসনা প্রস্থানের উপর তীক্ষ্ম মন্তব্য ও বিপুল তথ্যের সমাহার ক'রেছেন। পুস্তকটির লেখা খুব সাবলীল। যাঁরা বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে এই বইটি খুবই মূল্যবান ব'লে বিবেচিত হবে ব'লে মনে করি। —শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

GOPAL SARKAR
prof-in-Charge
Dept;of Bengali
suri vidyasagar college, suri, Birdhum

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় !

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার লেখা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বইখানি পড়ার পর, এর যুক্তিসিদ্ধ ও বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তে বিস্মিত হই। বহু বিতর্কিত এই গ্রন্থখানির সম্পর্কে অনেক আগেই কিছু কিছু সংবাদ শুনলেও বইখানির প্রতি তখন কোন আকর্ষণ অনুভব করিনি এই ভেবে যে. বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এর পূর্বেও মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চমকদার মত সম্বলিত বই বাজার মাত ক'রে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছিল ; পরে সে মতগুলি উপেক্ষিত হ'য়েছে ; কিন্তু আপনার লেখা গ্রন্থ পাওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল মতামত দিতে। আশা করি মার্জনা ক'রবেন।

শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন সম্পর্কে জীবনী রচয়িতারা মত বিভিন্নতা ও মত বিরোধিতা পোষণ করায় তথ্যাবলীতে ইতর বিশেষ আছে। এই কারণে যে, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নানান সংশয় যুক্তিবাদী পাঠকের মনে দেখা দেয়।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর, বাংলা দেশ ত্যাগ করে যাওয়ার পরেও যিনি বাংলার বৈষ্ণব সমাজে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছিলেন, তাতে হঠাৎ তাঁর মধ্যে রাধাতত্ত্বের আমদানি করলে কে ? ঘটলোই বা কেমন করে ? ভাগবত ও গীতাকে কেন্দ্র ক'রে যিনি জ্ঞানমার্গের বদলে ভক্তিমার্গের প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন, এবং সংসার ত্যাগ ক'রে যিনি সন্ন্যাসী সাজলেন, হঠাৎ তাঁর জীবনভাবনা গোপীপ্রেমের পরকীয়া রতিরসে নিমজ্জিত হয়ে গেল? তাঁর বৈদগ্ধ্য ও বিচার শক্তি সমকালীন যে কোনো জ্ঞানানন্দী সাধকের চেয়ে তীক্ষ্ম ছিল একথা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

তিনি যে শুধুমাত্র ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে ছিলেন, আবার ভাবালুতার দ্বারাই পরকীয়া রতিরসের মূর্ত্ত বিগ্রহে পরিণত হলেন, একথা যুক্তির পথে বিশ্বাস করা কঠিন। যিনি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও প্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা রাজশক্তির বিরোধিতা করার মত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ও পতিত উদ্ধারের পূণ্যব্রত গ্রহণ করার সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ, তার সঙ্গে অন্তত: তাঁর পরবর্তী জীবনের যে ত্রিবাঞ্ছা পূর্ত্তির ছবি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মাধ্যমে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ ক'রেছে, তার কোনো যুক্তি সঙ্গত পরিণতিক্রমই লক্ষ্য করা যায় না।

আপনার গ্রন্থ প'ড়ে মনে হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসপূর্ব ও সন্যাসোত্তর জীবনের একটি ধারাবাহিক, যুক্তি সম্মত, বাস্তব রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব। দীর্ঘদিনের প্রচলিত সহজিয়া সাধনার যে ধারা স্বরূপ দামোদরের অনুদ্দিষ্ট পুঁথির নামে শ্রীচৈতন্যের জীবনের উপর আরোপিত হ'য়ে, তাঁর মহাজীবনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, বৈষ্ণব সমাজ তাকেই

চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এটা যে একটা সংস্কার মাত্র এবং তা যে শ্রীচৈতন্য দেবের মূল স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে, আপনি অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠা ও গভীর বিশ্লেষণের দ্বারা তা প্রমাণ করে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছেন। এটা দুঃসাহসিকতার কর্ম; আপনার মত একজন পরম নিষ্ঠাবান ভক্তের লেখনী থেকে এ সত্য উদঘাটিত হল ভেবে আমি আনন্দিত।

যাঁরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নিয়ে বিশেষতঃ বাংলা দেশও সমাজ সংস্কৃতিও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যাবদান নিয়ে যুক্তির পথে বিচার ক'রতে চান, আপনার এই গ্রন্থ তাঁকে সঠিক পথ দেখাতে পারবে ব'লে আমার বিশ্বাস। আমি অতন্তঃ মনে করি এর পরস্পুর বিরোধী মত ও তথ্যাবলীর জটিল জাল ভেদ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বাস্তব সম্মত জীবনী গ্রন্থ রচিত হ'তে পারবে, এবং আপনার গ্রন্থ হবে তার পথ প্রদর্শক।

পরিশেষে আমাকে গ্রন্থ পাঠিয়ে এবং আমার মতামত চেয়ে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি। যুগ প্রচলিত দুর্মর সংস্কারের বেড়া ভাঙ্গার জন্য এবং একজন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসণের সৎসাহস দেখানোর জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি। আপনার সর্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

নিবেদন ইতি
গোপাল সরকার
বাংলা বিভাগের প্রধান
সিউড়ি, বিদ্যাসাগর কলেজ।
বীরভুম

বাংলার প্রখ্যাত প্রবীণ স্মার্ত, দার্শনিক ও আলংকারিক
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ

অধ্যাপক, চন্দ্রকিশোর চতুস্পাঠী
ধাড়সা : সাঁত্রাগাছি : হাওড়া-৪

বিদ্বদ্‌বর্ষ্য আয়ুর্বেদাচার্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর পঞ্চতীর্থ, শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থখানি দেখিলাম, লেখক মহাশয় বহুগ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার নিপুণ হস্তে লিখিত গ্রন্থখানি লিপিচাতুর্য্যে ও ভাব ভাষার মাধুর্য্যে সর্বজন সমাদৃত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক মহাশয়ের লিপি নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদনেও গ্রন্থকারের কোন ত্রুটি নাই।

গ্রন্থকার তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ইতিহাস এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত সংহিতা ও পুরাণাদি গ্রন্থে স্বীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাঁহার এই অভিজ্ঞতার প্রশংসা করি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় সংস্কার নির্মুক্ত ছিলেন

না, আমিও সংস্কার নির্মুক্ত নহি, তবে আমি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি বা কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করি না। আমি সমন্বয়বাদী, মতামতে আমার কোন বাদানুবাদ নাই। যেহেতু

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ মদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপতমত, বৈষ্ণবমত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে সকলেই বলেন যে, আমার মতই পরম ও চরম মত, এবং হিতকর। এইঅবস্থায় রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল বা কুটিল যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, গম্যস্থান সকলের এক পরমেশ্বর। যেমন নদীসকল সরল বা কুটিল যে পথেই প্রবাহিত হউক না কেন, তাহাদের সকলের গন্তব্যস্থল এক সমুদ্র।

লেখক বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ নিষ্ণাত, তাছাড়া নানা দর্শনে সু-পণ্ডিত। এই সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখিত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়া বর্ণিত "স্বরূপ দামোদরের" কড়চার অস্তিত্ব সে তথ্যের নিরসণে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল প্রমাণ দৃঢ়যুক্তি ও ইতিহাসের প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থকার বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বরূপ দামোদরের কড়চার কোন অস্তিত্বই নাই। তাঁহার লিপি নৈপুণ্য ও অনুসন্ধিৎসা দর্শনে আমি মুগ্ধ; প্রশংসা করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইনা।

অপর কথা, শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মে নারী সাহচর্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি সে বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত।

শ্রীমন মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত পবিত্র বৈষ্ণবধর্মে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মানুপ্রবেশে বৈষ্ণব ধর্ম ভূষিত হয় নাই। বরং দূষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সম্পন্ন বিরক্ত সন্ন্যাসী; যিনি নারী মুখ দর্শনাপরাধে হরিদাসকে বর্জন করিয়া ছিলেন সেই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্মে নারী সাহচর্য্য কদাপি সমর্থিত হইতে পারে না।

চরিতামৃতে আছে যে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মুখে রামানন্দের বিবরণ শুনিয়া—

"শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিল।
আমিও সন্ন্যাসী আপনি বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে থাক প্রকৃতি নাম যদি শুনি।
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন?"

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উক্তি বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নয় আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তান সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নান আদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্‌গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য! তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥

এই কয়টি পদ্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু অপেক্ষা রামানন্দ রায়কে জিতেন্দ্রিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থকার যে সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন "সহজিয়াদের এই মতবাদ কবিরাজ গোস্বামীর ঢের পরে সংযোজিত, এই সব অংশ বিদূরিত ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৌরাঙ্গের চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রয়োজন এসেছে—

আমি গ্রন্থকারের এই লিপির পূর্ণ সমর্থন করি।

সকল ধর্মেই নারীসংসর্গ বর্জন করিতে বলিয়াছে। অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জন ব্যতীত সাধনা হয়না।

কবির ভাষায় বলিব—

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতিঃ
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধি-বিধিঃ।

তবে কাহারও যদি "হরি রেব জগৎ, জগদেব হরিঃ।
হরিতো জগতো নহি ভিন্ন গতিঃ॥

এই জ্ঞান বা দর্শন হইয়া থাকে তবে সেকথা অন্যপ্রকার। এই যে "হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ" এই জ্ঞান শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হইল না, রায় রামানন্দের হইল, ইহা কেহ স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হয় না।

আমি গ্রন্থকারের নির্ভীক সমালোচনায় পরম প্রীত হইয়াছি ও তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—হরিরোম, শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

— ০ —

PARIMAL SEN M. A. B. T.
certificate in head master's work shop
Ex head master, Jagacha high School, Howrah-4
multipurpose co-Education
Head master, Gopalpur high School, Burdown

Sensadama
Mithapukur
Burdwan

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃতটি সঙ্কোচের সঙ্গে প'ড়লাম, নিজের জ্ঞানের গণ্ডীর কথা ভেবে।

গ্রন্থটি পণ্ডিত ও রসিকজনের জন্য, "বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়"।

আমিতো দ্বিতীয় দলের। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ে এইটুকু জানতাম—শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেই কৃষ্ণ গৌর হ'য়েছেন,

রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।
রাধা কৃষ্ণ ঐ'ছে সদা একই স্বরূপ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
একই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান॥
রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তি রস্মাৎ
একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।

কবিরাজ গোস্বামীর উপর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে আপনার অতি বিশদ আলোচনায় অভিভূত হইয়াছি। পক্ষপাত শূন্য মননশীলতা ও বিষয় বস্তুর বিদগ্ধ উপস্থাপনা অনন্যকরণীয়। বৌদ্ধদের ভাবনার ছায়া শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিবারদের মধ্যে, এবং স্বয়ং আচারণ ক'রে জীবকে শিক্ষাদান এই ঔদার্য্যের পথিকৃৎ স্বয়ং বুদ্ধ। এ ধরণের উক্তি ও যুক্তির মধ্যে সংকোচশূন্য যে বলিষ্ঠতা তা আপনার পাণ্ডিত্যের প্রত্যয়। বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচলিত গ্রন্থগুলি বাদে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, গণোদ্দেশ দীপিকা, বিন্দুপ্রকাশ, রতি চিন্তামণি, কালিদাস, বাণভট্ট, বিষ্ণুপুরাণ, সাধনমালা, মহানির্বাণ তন্ত্র, হরিমিশ্রকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতি ও উল্লেখ দেখে আপনার পাণ্ডিত্যকে বার বার প্রণাম জানাই। তবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তুর আলোচনা করলে আমাদের মত মূঢ় জনের সুবিধা ছিল।

রায় রামানন্দের প্রসঙ্গে চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাসের লেখার মধ্যে যে অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত তার প্রমাণ আপনিই প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। আরও বিস্তৃত ক'রে অভিমত জানাবো। তবে অহিংস বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে বারবার এভাবে কিছু লিখলে যদি বিংশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের উপর হিংসাত্মক কিছু ক'রে বসে সেই ভাবনা। অমূল্য সেনের "ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য" নামে একখানি বই প'ড়েছিলাম। তাঁকে লাঞ্ছনা

পেতে হ'য়েছিল ও বইটি সরকার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, তা আপনার অজানা নয়। এর পরবর্ত্তি ভাগ যখনই প্রকাশিত হবে দয়া ক'রে আমাকে একখানি পাঠাবেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।